প্রবাসী

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

সোমেন্দ্রনাথ ব

সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

প্রবাসী (১৩০৮-১৩৪৮ আষাঢ়)
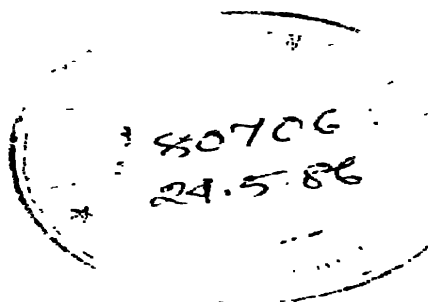
সোমেন্দ্রনাথ বসু

॥ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ॥

কলিকাতা

সমগ্র জীবন যিনি রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কবিও যে বন্ধুর সাহচর্য পরম ঐশ্বর্যের মত কামনা ও ভোগ করেছেন, প্রবাসীর সম্পাদক, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখক

পরম শ্রদ্ধেয়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের

স্মরণে

প্রবাসী সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম ; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্ত সম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণ আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার অল্প সংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি নামগুলি মনে রেখেও একথা অসংকোচে বলা যায়, বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনার জগতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম সবার উপরে। দীর্ঘদিন ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দিতে পত্রিকা প্রকাশ করে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতির বহুমুখী আলোচনার একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে, কোন অন্যায় ও দুর্নীতিকে পোষণ না করে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে রামানন্দ বাংলা সাংবাদিকতার এক বলিষ্ঠ ধারার প্রবর্তক।

'প্রবাসী' পত্রিকায় রামানন্দ নানা ধরনের 'ফীচার' সুরু করেন। শুধু প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সাহিত্যপত্র না হয়ে, নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমালোচনার তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ প্রবাসী সকল শ্রেণীর পাঠকের চাহিদা মিটিয়েছে। ভাল পত্রিকা শুধু চাহিদা মেটায় না, চাহিদা সৃষ্টিও করে—'প্রবাসী' বাঙ্গালী পাঠকের মনে ভাল ছবি, ভাল সাহিত্য, ভাল রাজনৈতিক রচনার, উন্নততর বিদ্যাচর্চার নানা ধরনের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। রামানন্দের চেষ্টায় 'প্রবাসীতে' বাঙ্গালী শিক্ষিত পাঠকের মনের দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত হয়েছে।

ঐ নতুন নতুন 'ফীচারের' অন্যতম হল 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। দেশ জুড়ে নানা ঘটনা ঘটছে কত রাজনৈতিক আন্দোলন, কত অর্থনৈতিক সমস্যা, কত জাতি ও সমাজগত ভাবনা, কত অত্যাচার, নিপীড়ন ও অবিচারের কাহিনী আমাদের চারদিকে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে চলেছে কিন্তু আমাদের অলস মন নিজের সমস্যাটুকু ছাড়া অন্য কোন কিছুই ভাবে না, বোঝেনা, বুঝতে চায় না। দক্ষ সম্পাদকের সাফল্য সেইখানেই যেখানে তিনি ঘটনার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার সঠিক গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করে দেন। বিবিধ প্রসঙ্গে রামানন্দ তাই করেছেন। প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে ঐ শিরোনামায় পাতার পর পাতা লিখেছেন—উচিত অনুচিতের বোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন, সমকালীনতার উত্তেজনার মধ্যে ঘটনার সত্য মূল্য উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন স্থির মস্তিষ্কে, যুক্তি বিচারের আপাতঃ নীরস পদ্ধতি অনুসরণ করে সত্য সন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন।

'বিবিধ প্রসঙ্গের' নানা ধরণের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিষয় বার বার ফিরে এসেছে, সেটি হল রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। জানিনা পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এমন কোনো পত্রিকা আছে কিনা যার পাতায় কোনো একজন কবির চিন্তা ভাবনা, কর্ম ও সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পাদক দিনের পর দিন এমন অক্লান্তভাবে প্রচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রামানন্দের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই রচনাগুলির মূল্যও অল্প নয়। তাঁর মৃত্যুর পর 'পিতৃ তর্পণ' নামে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছে—"তিনি বলিতেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ'।" মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে বলিয়াছিলেন 'Rabindranath for ever এই আমার motto'. কথাসাহিত্য পত্রিকায় ১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে পাই, "রামানন্দবাবু সাধাসিদা মন খোলা লোক, কোনরকম prejudice নাই, খালি রবিঠাকুরের কোন নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না।" কিন্তু লোকমুখের কথা নয় শুধু, দিনের পর দিন নানা বিষয়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন রামানন্দ। সে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের প্রচার, রবীন্দ্রবক্তব্যের ব্যাখ্যা, রবীন্দ্রকাব্যের আস্বাদন, কখনো প্রতিপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন, কখনো বা রবীন্দ্রজীবনীর তথ্যমূলক আলোচনা। যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতে মেলেনি সেখানে মতানৈক্যের সংক্ষেপ উল্লেখ আছে—যেন সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন।

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথও পরম বন্ধুকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। রামানন্দ তো শুধু সম্পাদক নন, ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। রবীন্দ্রসাহিত্যের বেশিটাই নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। রামানন্দের পত্রিকার উন্নত মানও রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, শুধু বন্ধুত্বের আকর্ষণই নয়।

রামানন্দের জীবনকথা এখানে বিস্তৃত করে বলার সুযোগ নেই। সেটা প্রাসঙ্গিকও হবে না। কিন্তু সম্পাদক রামানন্দের পরিচয় এখানে সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে। সাংবাদিকতা তাঁর সখ বা খেয়ালের বস্তু ছিলনা, দীর্ঘ দিনের সাধনায় ক্রমাগত চেষ্টা করে, অনেক মূল্য দিয়ে তিনি বাংলা সাংবাদিকতার প্রধান পুরুষ হয়েছিলেন।

যোগ্য লোকের কাছেই রামানন্দ সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ নিলেন। সিটি কলেজ থেকে ১৮৮৮ সনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন ইংরাজী অনার্সে।

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তখন ইংরাজীর অধ্যাপক। ব্রাহ্মসমাজের ইংরাজী মুখপত্র Indian Messenger-এর সম্পাদকও বটে। তিনি রামানন্দকে সহকারী সম্পাদকের পদে আহ্বান করায় সে পদ রামানন্দ সানন্দে গ্রহণ করলেন। প্রবন্ধ লেখা, সংশোধন করা, প্রবন্ধ রচনায় সম্পাদককে সাহায্য করা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি ঐ পদে থেকেই কাজ শিখে পাকা হয়ে উঠলেন। বি. এ, পরীক্ষার ফল বেরুনোর সংগে সংগেই রামানন্দ সিটি কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিলেন। এখানেও হেরম্বচন্দ্রের নির্দেশে কাজ করার সৌভাগ্য হোলো।

১৮৮৯ সালের ডিসেম্বরে রামানন্দ 'ধর্মবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক হলেন। ইতিপূর্বে Indian Mirror পত্রেও সম্পাদকীয় লেখেন কিছু কিছু।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ব্রাহ্মসমাজের কিছু সভ্যের চেষ্টায় 'দাসাশ্রম' সুরু হয় ২৭ শে জুন ১৮৯১ সালে। রুগ্ন, মরণাপন্ন, সমাজ পরিত্যক্ত অসহায় মানুষদের আশ্রয় দেবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা। ছোটোখাটো চাঁদায় কাজ সুরু হোলো, তারপর একদিন একটি চিকিৎসালয় হোলো। তারপর এল দাসাশ্রমের পত্রিকা 'দাসী'। ১৮৯১ সালে রামানন্দের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হল ঐ পত্রিকা। "ইহার সমস্ত আয় সম্পাদক দাসাশ্রমে দিতেন। দাসীতে অনেক সময় গল্প কবিতা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদককে একহাতে লিখিতে হইত। এই সময় তিনিই প্রথম বাংলা দেশে অন্ধদের জন্য বাংলা ব্রেল অক্ষর তৈয়ারী করেন।" (পিতৃতর্পণ)

'দাসী'র প্রথম প্রকাশকালে রামানন্দ লিখেছিলেন, "বঙ্গসাহিত্য সংসারে মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। এতগুলি মাসিক পত্রিকা থাকিতে আমরা কেন আর একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি, এই প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রাজনীতি সাহিত্য ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।"

কিছু সৌখীন ব্যাপার নয়, প্রথম থেকেই রামানন্দ স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারে নেমেছেন, নিরন্তর চেষ্টা করেছেন মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে। জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশচন্দ্র রায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, জলধর সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রভাতকুমার প্রভৃতি লেখকদের রচনা 'দাসীর' পাতায় প্রকাশিত হত। 'দাসী'তে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' শিরোনাম দিয়ে রামানন্দ নিজেও

লিখতেন প্রচুর। ১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

১৮৯৬ সালে 'প্রদীপ' প্রকাশিত হলো। স্বত্বাধিকারী রামানন্দকেই সম্পাদক করলেন। 'প্রবাসী'র দীর্ঘ দিনের গৌরবময় জীবনের পূর্বসূচনা দেখা গেল এই পত্রিকায়। 'প্রদীপে'র পাতায় সাহিত্যের রসচর্চা ও ইতিহাস দর্শন-বিজ্ঞানের জ্ঞানচর্চা একযোগে চলতে লাগলো। দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও জ্ঞানী মনীষীদের রচনার অপূর্ব সম্ভার নিয়ে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো। শুধু কাঠ খোদাই নয়, হাফটোন ব্লক দিয়ে সুরু হলো ছবি ছাপা।

'প্রদীপে' রামানন্দ লিখলেন,—"একখানি আদর্শ কাগজ চালাইতে হইলে যদি আয়ের অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যয় হয় তাহা নির্বাহ করিবার উপায় করা উচিত। বস্তুতঃ লোকশিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। যেমন স্কুল কলেজ চালাইবার জন্য বড়লোকেরা টাকা দেন তেমনি ভাল কাগজ চালাইবার জন্যও দান করা উচিত। ...আমি সম্পাদকের কার্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না।"

তারপর এলো 'প্রবাসী'। প্রবাসে তার জন্ম, প্রবাসী মানুষ তার জন্মদাতা। তাই ১৩০৮ সালে ঐ নাম নিয়ে পত্রিকার সুরু হলো। প্রথমে বাংলার বাইরে বাঙালী যে প্রবাসী এই ইঙ্গিতটাই ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দেখা গেল 'প্রবাসী' বাংলাদেশেরই প্রধান পত্রিকা তখন অর্থ বদল হল। আমরা যে স্বাধীনতা হারিয়ে নিজের ঘরে পরাশ্রিতের মতো বাস করে প্রবাসী হয়ে আছি এই অর্থটাই প্রধান হল। প্রবাসীর শিরোভূষণ হল এই বাণী—'নিজবাসভূমে পরবাসী হলে।'

১৯০৮ সালে প্রকাশিত হল 'মডার্ণ রিভিয়ু'। রামানন্দ কতটা স্বেচ্ছায় এই ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন জানিনা কিন্তু এটা অনুভব করতে পারি যে প্রবাসীর উন্নত মান তাঁকে উৎসাহিত করেছিল সর্বভারতীয় একটি যোগসূত্র স্থাপন করার কাজে। পাঠকেরাও কি এই চাপ সৃষ্টি করেন নি যে প্রবাসীর সুস্থ নির্ভীক রাজনৈতিক মতামত ইংরাজীতেও প্রচারিত হোক! রামানন্দের মত কর্মীপুরুষ যে নিজের কর্মক্ষেত্রকে ক্রমেই বিস্তৃত করতে চেষ্টা করবেন তাও খুব স্বাভাবিক। একথা বুঝেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। ক্ষিতি-

মোহন সেন মহাশয়কে তিনি বলেছিলেন, "ঐ যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখদুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মণীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন আরও প্রশস্ত সাধনার ক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।"

'প্রবাসী'র আবির্ভাব আকস্মিক নয়। তরুণ রামানন্দ নিজেকে শক্ত করে গড়েছিলেন ছোট ছোট পত্রিকার দায়িত্বভার নিয়ে। তারপর একদিন জীবনের মহত্তম কর্মে রামানন্দ উদ্যোগী হলেন। ১৩০৮ সালের বৈশাখে প্রবাসীর যাত্রা সুরু। রঙে, রসে, ভাবনায়, মননে, প্রবাসী তার পূর্বসূরীদের ম্লান করে দিল। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, সাহিত্য—পত্রিকা হিসাবে ইতিমধ্যেই জাতীয় ইতিহাসে আসন করে নিয়েছে, জ্ঞানসমৃদ্ধ বিবিধার্থসংগ্রহ তখনও শিক্ষিতদের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি, সমাজ ও ধর্ম সমস্যা নিয়ে তত্ত্ববোধিনী চলেছে তখনও অপ্রতিহত গৌরবে। কিন্তু সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন এবং সমকালীন সংবাদ বিতরণের এমন বিপুল প্রয়াস ইতিপূর্বে একত্রে দেখা যায় নি। এর সংগে অতিরিক্ত হলো সুমুদ্রিত চিত্রসম্ভার।

সম্পাদকের প্রধান গুণ সম্পাদকীয় কল্পনা। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে সুষ্ঠু গ্রন্থসমালোচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন ধারা খুলে দিলেন—সম্পাদক হিসাবে তাঁর কল্পনাশক্তি তাঁকে এই নতুন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সাধনা ও বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের রচনাই ছিল আকর্ষণ, সম্পাদক হিসাবে তাঁর নূতন কৃতিত্ব বিশেষ ছিল না। সম্পাদকের ইম্যাজিনেশন ছিল রামানন্দের। তাই প্রবাসীতে বহু বিষয় ও বিভাগের অবতারণা করে—মাসিক পত্রিকার কাছ থেকে পাঠকরা কি আশা করতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি যেন তাদের সচেতন করে তুললেন।

প্রথম সংখ্যা প্রবাসী প্রকাশিত হয়ে অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল; রামানন্দ তার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করলেন। এ ঘটনা একবার নয়, পরেও বহুবার ঘটেছে। ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসীর মলাটের উপরেই বিজ্ঞাপনের আকারে আছে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত প্রবাসী আবার ছাপা হচ্ছে, নতুন গ্রাহকরা পুরো বছরের পত্রিকা পাবেন, সে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রবাসীর অনেক লেখকই ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। অবাঙালী, অভারতীয় লেখকের সংখ্যাও কোনদিনই কম ছিল না। কিন্তু যে বিষয়ে 'প্রবাসী' সত্যি সত্যিই অদ্বিতীয় তা হলো নব্যভারতীয় চিত্রকলার পুনর্জাগরণে তার অক্লান্ত সহযোগিতা। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যসমাজকে ক্রমাগত প্রচার করেছেন রামানন্দ—ছবির পর ছবি ছেপেছেন। ওরিয়েণ্টাল আর্ট তখন ব্যঙ্গের উপলক্ষ্য, "চিত্রিত মানুষদের লম্বা হাত, পা, ক্ষীণ কটি, লতানো আঙুল ইত্যাদি তখন অত্যন্ত হাসির জিনিস ছিল। প্রবাসীতে বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী, বিরহী যক্ষ, দীপান্বিতা, সুজাতা ও বুদ্ধ ইত্যাদি দেখিয়া নানা জায়গায় মজলিসে হাসি-তামাসা হইত, কাগজেও বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিত।" (পিতৃস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) অননুশীলিত মনের এই প্রাথমিক বিরূপতাকে অবহেলায় জয় করলেন রামানন্দ। ওরিয়েণ্টাল আর্ট রামানন্দের কল্যাণে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। দেখতে দেখতে এই শিল্পরূপ সম্বন্ধে বাঙালীর চেতনা জেগে উঠলো। ওরিয়েণ্টাল আর্ট যত ছাপা হলো তার একটা প্রধান অংশ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব অবলম্বনে এবং রবীন্দ্রকাব্যাংশের দ্বারা নামাঙ্কিত। 'প্রবাসী'তে ছবি ছাপা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন,—"রামানন্দবাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলেম, কাগজটা চালাতে গিয়ে শেষে না বিপদে পড়েন! সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমানভাবে চলে এল, নতুন নতুন আর্টিস্ট এল ছবি দিতে 'প্রবাসী'তে। এযে হল তার জন্য দায়ী আমি নয়, রামানন্দবাবু। নতুন বাংলার আর্টিস্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আলবমে, তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে; আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চন-মূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপ্‌তো ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দ-বাবু।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৩)

সম্পাদক হিসাবে রামানন্দ লেখক রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন বললে যেন কিছুই বলা হয় না। তাঁর লেখা যে তিনি ক্রমাগত ছাপতেন, এ সব কথা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হবে। পার-

স্পরিক গুণের দ্বারা আকৃষ্ট এই দুটি মানুষ যখন প্রথম পরস্পরকে চিনলেন তখন দুজনেই চল্লিশের কোঠায়। অনেক সংঘাত, অনেক দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়েই দুজনে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিজের নিজের ক্ষেত্রে। এই পরিণত বয়স্ক দুটি মানুষের যে বন্ধুত্ব সুরু হলো তা প্রতিদিন দৃঢ় হতে লাগলো এবং রামানন্দের ক্ষেত্রে তা গভীর ভালবাসায় পরিণত হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির শীর্ষে পেঁাছেও যাঁদের মতামত ও উপদেশের জন্য অপেক্ষা করতেন রামানন্দ তাঁদের একজন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের আনুগত্যও ছিল অপরিসীম। কবির মৃত্যুর পর রামানন্দ লিখলেন,—"আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্র-বিহীন জগত দেখতে হবে।"

প্রবাসী পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ' রামানন্দ নিজে লিখতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছরের বাঙালীর জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অজস্র উপকরণের সঞ্চয় পাওয়া যাবে বিবিধ প্রসঙ্গের মন্তব্যগুলিতে। ১৩১৮ পর্যন্ত বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকথা বেশি নেই। ঐ বছরের রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে সম্বর্ধনার আয়োজন হল তারই সংবাদ ও মন্তব্য নিয়ে বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকথার সূত্রপাত। তারপর রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে যত লেখা রামানন্দ লিখেছেন তারই সংকলন এই গ্রন্থে করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে রবীন্দ্র-রামানন্দ সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও কিছু কথা থাকে।

১৯১৮ সালে রামানন্দ কলকাতায় এসে বসবাস সুরু করলেন—এলাহাবাদের পাট সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়ে এলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে একটি ছোট গৃহে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর অফিসও সেইখানে। দেশের বড় বড় মনীষীরা সেখানেই আসেন—রবীন্দ্রনাথও আসেন। কখনো ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে, কখনো পদব্রজে। সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র ছিলেন বটে, কিন্তু বড়মানুষী তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্রও ছিল না। সাধারণ ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে অনেক সময় চলিয়া আসিতেন, এমন কি দু-একবার জোড়াসাঁকো হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্যন্ত হাঁটিয়া চলিয়া আসিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমাদের সমাজ পাড়ার সেই বাড়িটি অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ ছিল, কিন্তু কতবার তাঁহার চরণরেণু স্পর্শে তাহা ধন্য হইয়াছে। প্রবাসী-অফিসের সাজ সরঞ্জাম তখন

এতই দীন ছিল যে তাহার বর্ণনা করিলে এখনকার দিনে মানরক্ষা হয় না। সেই স্বল্পালোক ছোট ঘরটিতে সাধারণ কাঠের টুলে বসিয়া কতদিন তাঁহাকে বাবার সঙ্গে ও চারুবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে দেখিয়াছি।"

রামানন্দ পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক দিনে দিনে ঘনিষ্ট হতে থাকে। সে ঘনিষ্ঠতার কাহিনী এই ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক নয়। তবু 'মুলু'র উল্লেখ করতে হয়। রামানন্দবাবুর এই পুত্রটি নিজের স্বভাবের গুণে ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান করে নেয়। আশ-পাশের গ্রামের দরিদ্র বালকদের জন্য সে রাত্রিবেলায় একটি স্কুল পরিচালনা করতো। ঘরে ঘরে ঘুরে সংগ্রহ করতো পুরানো খবরের কাগজ, বোলপুরে সেই কাগজ বিক্রী করে স্কুলের খরচ চালাতো। আচার্য ক্ষিতিমোহন লিখছেন, "তাহার এই সব উৎসবের কাজে গুরুদেব ও রামানন্দবাবু অর্থ সাহায্য করিতেন। মাঝে মাঝে মুলু নৈশ বিদ্যালয়ের গরীব ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া বাড়িতে খাওয়াইত। তাহাতে রামানন্দবাবুর বিশেষ উৎসাহ ছিল। খুব অল্প দিন মুলু বাঁচিয়া ছিল। ১৯১১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মুলু কলিকাতায় সামান্য কয়েকদিনের রোগে মারা যায়। রামানন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রী তাহাতে খুব মর্মাহত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে এই শোকের সময় প্রায়ই সান্ত্বনা দিয়া চিঠি লিখিতেন। পরদুঃখকাতরতায় ও লোকসেবাতেও মুলু রামানন্দ-বাবুরই যোগ্য পুত্র ছিল।"

রামানন্দবাবু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সৃষ্টির মতো শান্তিনিকেতন আশ্রমেরও একজন উৎসাহী ভক্ত। যে মনোভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম করেছিলেন তা সমাজের সমর্থন পায়নি বলে তাঁর দুঃখ ছিল। একদিন বললেন রামানন্দকে, "প্রাচীনকালে তপোবনে বসিয়া ভারতের যে সরল উন্নত ও মহান আদর্শ ছিল তাহাই স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম এই শান্তিনিকেতনে। আমার তখনকার দিনের সীমাবদ্ধ আয় লইয়াও আমি আমার দিক হইতে কম চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তবু পারিলাম না। সমাজের সেই সহযোগিতা পাইলাম না। তাই পরিশেষে আপন আপন ছেলেদের ব্যয়ের জন্য অভিভাবকদের শরণাপন্ন হইতে হইল।" রামানন্দ সেদিন কবির এই খেদোক্তির উত্তরে বলেছিলেন, "আজ ভারতের সর্বত্র অজ্ঞান ও অন্ধকার। আপনি সেই অন্ধকারকে মনে মনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে এত সহজে ছাড়িয়া দিবেন না। নিষ্ফল হইলেও

আবার চেষ্টা করুন।" পরম সুহৃদের এই উৎসাহবাক্যকে রবীন্দ্রনাথ অবজ্ঞা করেন নি, বলেছিলেন, "যদি ভুলিয়া যাই মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিবেন।" এই প্রসংগে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখলেন, "তাহার পর প্রায়ই দেখিয়াছি রামানন্দবাবুর সংগে গুরুদেবের দেখা হইলেই রামানন্দবাবু তাঁহার সেই আদর্শ স্থাপনার কতদূর কি হইল তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন। যখন শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রের কল্পনা গুরুদেবের মনে স্থির হইল তখন তিনি রামানন্দবাবুকে একদিন বলিলেন, "দেখুন এখন আমি আমার সেই সংকল্পকে যে আবার প্রাণবান করিতে পারিব সেই সম্ভাবনা আসিয়াছে।"

১৯২৬ সালে বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবন স্থাপিত হয়েছিল। এই শিক্ষায়তন ছিল কলেজ বিভাগ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দিন সে পদে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে বিশ্বভারতীর যোগ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে মতানৈক্য থাকায় তিনি অল্পকাল পরে অধ্যক্ষ পদ ছেড়ে দেন।

রামানন্দ ও তাঁর পরিবারের সকলেই মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যেতেন। ১৯১৭ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি পুত্র কন্যাদের নিয়ে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হন দুবছরের জন্য। বিশ্বভারতীর কোন শিক্ষকের নির্মিত একটি মাটির বাড়ি ছিল। তিনি ছেড়ে চলে গেলে রামানন্দবাবু ঐ বাড়িটি কিনে নেন। কন্যা সীতা, শান্তা ও পুত্র প্রসাদকে নিয়ে রামানন্দ সেখানে থাকতেন। এইখানে দুই বছরের বাস সম্পর্কে সীতা দেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি'তে লিখেছিলেন "বাড়িটির চারিধারে বারান্দা, মাঝে তিনখানি ঘর। রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি ঐ বারান্দা ঘিরিয়াই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তৈয়ারী হইয়াছিল। বাড়িখানির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল এই যে সেটি রবীন্দ্রনাথের বাড়ির অতি নিকটে।...ওখানের আশ্রমের গণ্ডি ছোট ছিল, মানুষও অল্প ছিল, এই দুই বৎসরের নৈকট্যের ফলে অনেকে যেন আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।" মুলুর মৃত্যুর আগেই রামানন্দবাবু ও তাঁর পরিবারের অন্যেরা শান্তিনিকেতনের বাস তুলে কলকাতায় চলে আসেন।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের অজস্র খুঁটিনাটি নিয়ে মহাভারত রচনা করা যায়,

এখানে দীর্ঘতর আলোচনা অবান্তর হয়ে যাবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির যে বন্ধন রচিত হয়েছিল তা কোন মতান্তরেও শিথিল হয়নি।

একথা বারংবার পুনরুক্ত হলেও বোধ হয় যথেষ্ট বলা হবে না যে রামানন্দের মত সক্রিয় সহৃদয় বন্ধু ও প্রচারক লাভ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও বহুভাগ্য বলে জানতে হবে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এবং মডার্ণ রিভিয়ুর 'নোট্স্' পর্যায়ে রামানন্দ শুধু রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করেন নি, রবীন্দ্রবিরোধিতার সমস্ত চেষ্টাকেই কঠিন আঘাতে বানচাল করেছেন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের কোন বক্তব্য তাঁর পছন্দ হয়নি সেখানে হয় চুপ করে থেকেছেন নয় স্বল্পতম ভাষায় মতানৈক্য জানিয়ে প্রসঙ্গ সেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন যে ঠাকুর বাড়িতে জন্মানো তাঁর শেষ পরিচয় নয়। তাঁর সেই বৃহত্তর পরিচয় আছে তাঁর নিজের লেখায় আর রামানন্দের 'বিবিধ প্রসঙ্গে'।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর সম্বর্ধনা উপলক্ষে রামানন্দ বিবিধ প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তাতেই প্রমাণ যে রবীন্দ্রনাথের মহত্বের মূল শক্তির উৎস যে কোথায় তা বুঝতে তাঁর ভুল হয়নি। রবীন্দ্রপ্রতিভা যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাগরণের মহত্তম ফলশ্রুতি, তা যে পূর্ব পশ্চিমের মিলনের বাণী থেকেই শক্তি সঞ্চয় করছে এ কথা ১৯১১ সালেই রামানন্দ স্পষ্ট বলেছেন। (পৃষ্ঠা ৬) রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতার চেতনাও অন্যান্য বাঙ্গালীর চিন্তা থেকে পৃথক ছিল। ইংরেজের অধীনতার চেয়ে প্রবৃত্তির, স্বার্থের, ভয়ের, অজ্ঞানতার কুপ্রথার অধীনতা যে অনেক বেশী মারাত্মক রবীন্দ্রচিন্তার এই মূল সত্যটিকে বুঝতে রামানন্দের বিলম্ব হয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রক্ষণশীলতা বাড়ে, এবং যা নতুন তাকে সাদরে স্বীকার করার শক্তি ও সাহস চলে যায়। রামানন্দ লিখলেন, "অনেকে বয়োবৃদ্ধি সহকারে সামাজিক কুপ্রথাদি-বিষয়ে রক্ষণশীল হয়েন ; রবীন্দ্রনাথ মতে ও আচরণে যাহা কিছু ভাল তদ্বিষয়ে রক্ষণশীল কিন্তু যাহা অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে সংস্কারপ্রয়াসী। এই ভাব বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বাড়িয়া চলিয়াছে।"

প্রথম প্রথম রামানন্দ রবীন্দ্রসমর্থনে পরোক্ষ রীতি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তাই ঠিক—এ কথা না বলে বিরুদ্ধবাদীরা ভুল, এই কথা বলেছেন বিনম্র ভাবে। যেমন 'ছিন্নপত্র' থেকে একটি অংশ তুলে দিয়ে বলা হয়েছিল—Rewrite the following in chaste and elegant

Bengali—রামানন্দ মন্তব্য করেছিলেন "কিন্তু কথিত বাংলা chaste এবং elegent হইতে পারে না, কেতাবী বাংলা হইলেই chaste ও elegant হয়, ইহা মনে করা ভুল।" (পৃ: ৯)

রবীন্দ্রনাথের রচনা শুধু সাহিত্য মূল্যের জন্যই নয়, দেশবিদেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত সংস্কার অপনোদনের জন্যও মূল্যবান একথা রামানন্দ আশ্বিন ১৩২১-এ 'জাতিতে জাতিতে মৈত্রীসাধক রবীন্দ্রনাথ' এই শিরোনামে লিখেছেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় এক মহিলা এই কথাই বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের গান ও প্রবন্ধগুলি "ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার বিনষ্ট করিয়া ভারতের জীবন ও চিন্তার মর্মের মধ্যে মানুষকে প্রবেশ করিতে সমর্থ করিতেছে।" এগুরুজের কথা মনে রেখেই সম্ভবতঃ রামানন্দ আরও মন্তব্য করেছেন "দক্ষিণ আফ্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর এই গুণ লক্ষিত হইয়াছে।" বাঙালী পাঠকেরা রামানন্দের লেখা থেকেই বারে বারে জানতে পেরেছেন রবীন্দ্ররচনার দূরপ্রসারী প্রভাব।

ক্রমে ক্রমে রামানন্দের রবীন্দ্রসমর্থন জোরালো হতে লাগলো, আভাস ইংগিত স্পষ্ট প্রতিবাদের রূপ নিতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধ তখন অনেকেরই পছন্দ ছিল না। ১৩২৪ সালে বংগীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তীক্ষ্ণ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেন—"সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী, আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংগলার মাটি বাংগলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় ঐ মতটি খুব জোরের সংগে জাহির করিয়াছেন।" এর উত্তরে রামানন্দ যথেষ্ট তীক্ষ্ণ হয়েছেন এবং চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা থেকে পংক্তির পর পংক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে চিত্তরঞ্জন কি পরিমাণ গ্রহণ করেছেন। রামানন্দের স্পষ্ট প্রতিপাদ্য এই যে সূর্য রবীন্দ্রনাথ, বালি চিত্তরঞ্জন। তখনকার জাতীয় জীবনে চিত্তরঞ্জনের দাপট রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু রামানন্দ সত্যসন্ধী—কঠিন যুক্তির খড়্গাঘাতে তিনি চিত্তরঞ্জনের ফাঁকি ও দুর্বলতা ধরে দিতে দ্বিধা করেন নি।

ঐ বছরেই স্টেটসম্যান পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের একটি কথা উদ্ধৃত করে বলছে যে সরকারের কাছ থেকে নাইটহুড খেতাব গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের উচিত হয়নি (পৃঃ ৩২)। দক্ষ তার্কিকের প্রখর বুদ্ধি নিয়ে রামানন্দ উত্তর দিচ্ছেন—"স্টেটস্‌ম্যানের তাহা হইলে কি ইহাই বলা অভিপ্রায় যে মানুষ যাহাতে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য কথা না বলে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট উপাধি ঘুষ দিয়া থাকেন?" এ কাজ রামানন্দের নিত্যকর্ম ছিল। কোথাও রবীন্দ্রনাথের কোন নিন্দা যদি তাঁর অন্যায় মনে হতো প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসংগে' রামানন্দ তার উত্তর দিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

১৯১৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশে এক বিরাট দলাদলির সৃষ্টি হয়। সে দলাদলিতে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েন। বিরুদ্ধ-বাদীরা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনা করেন। রামানন্দ সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সংগে একমত ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পলিটিক্সে নবীশ (novice) বলে উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের উত্তরে রামানন্দ লেখেন (পৃঃ ৩৪) "এই সেদিন যখন বংগের গভর্নর টাউনহলে শ্রীমতী বেসাণ্টের স্বাধীনতা লোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম-জারী করেন তখন বাক্যস্ফূর্তি "রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ" রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরীতে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পড়িয়া বংগের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভংগ করিয়াছিলেন, বংগের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় প্রশ্ন পত্রে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলা গদ্যরীতির বিকাশ, ১৮৮০ সালের পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রশ্ন আসায় রামানন্দ মন্তব্য করলেন, "তাঁহাকে বাদ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বাংলা পরীক্ষার অধীতব্য বিষয় বিবেচিত হইতে পারে না।" বাঙালীর জীবনের কোন ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অবজ্ঞাত থাকুবেন এটা রামানন্দের দৃষ্টিতে সহনীয় ছিল না। (পৃঃ ৪৭)

পুলিশের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের চিঠি খোলে, তার সতথ্য প্রতিবাদ করেন রামানন্দ। লর্ড লিটন শান্তিনিকেতনে গেলে যে বিরূপ সমালোচনা হয় তার উত্তরে রামানন্দ লেখেন, "সত্য কারণ থাকিলে আমরা যেমন তাঁহার মত ও কাজের সমালোচনা করিবার অধিকারী অন্যেরাও সেরূপ করিবার অধিকারী। শুধু অধিকারী নহেন, তাহা করাও কর্তব্য। কিন্তু যাহা সত্য নহে বা যাহা

আংশিক সত্য, তাহাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাকে বা অন্য কাহাকে আক্রমণ করা উচিত নহে। তাঁহার ন্যায় অন্য যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে বিদেশী লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করে তাঁহাদিগকে অমূলক সমালোচনা দ্বারা আমরা নিজেদেরই অসম্মান করি।" (পৃঃ ১৯) সম্পাদক রামানন্দ তাঁর সমালোচনার মূল নীতিটি এইখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ঐ প্রসঙ্গে প্রচারিত কয়েকটি তথ্যের প্রতিবাদ হলে তা সংবাদপত্রে ঠিকমত গুরুত্বে প্রকাশিত না হওয়ায় রামানন্দ আরও লিখলেন, "কোন কোন খবরের কাগজ পাঠকদের বিশেষ দর্শনীয় স্থানে ও বড় অক্ষরে প্রচার করে যে, রবিবাবু লিটনের অনুরোধে তাঁহাকে প্রথম চিঠি লেখেন। কিন্তু যখন ঐ কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ হয়, তখন প্রতিবাদ ছোটো অক্ষরে, সহজে চোখে পড়ে না এরূপ এককোণে ছাপা হইয়াছিল।"

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইতালী গিয়েছিলেন। কয়েকদিন ইতালীতে রাজকীয় সম্মান লাভ করার পর তিনি বুঝতে পারলেন বহু লোকের স্বাধীনতা হরণ করে, বহু মানুষের প্রাণনাশ করে ফ্যাসিজমের রথ চলতে সুরু করেছে। রোমাঁ রলাঁ এই সম্পর্কে কবিকে সচেতন করেন। কিন্তু ততদিনে কবি ইতালীর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করে ফেলেছেন। চতুর্দিকে সমালোচনা হলো যে কবির মতিস্থির নেই, তিনি ইতালীতে রাজকীয় আতিথ্যটুকু ভোগ-করেছেন এবং এখন তার নিন্দা করছেন। সাদা চোখে দেখলে ব্যাপারটা কবির পক্ষে সহজে উড়িয়ে দেবার নয়। এই সময়ে রামানন্দ কবির পক্ষে যে যুক্তি দিলেন তা বিরুদ্ধবাদীদের নিরস্ত করলো। প্রথমে বললেন, "কবি যদি বিদেশে কোন ধূর্ত রাষ্ট্ররথীর চক্রান্তে পড়িয়া ভুল বুঝিয়া কোন কথা বলেন এবং পরে যদি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভিন্নমত প্রচার করেন, তাহাতে দোষের কিছু নাই।" কিন্তু কবির দুর্বলতার উল্লেখ করে পরের পংক্তিতেই রামানন্দ বল্লেন মুসোলিনীর সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা সমর্থন করে কবি উন্নত ও উদার বিশ্বপ্রেমবাদীর যোগ্য কাজ করেন নি। রামানন্দ কবির ইতালী যাওয়ার ব্যাপারে এবং কবির ভুল বোঝার জন্য দায়ী করেছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে। তিনি লিখেছিলেন, "কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ কর্মসচিবদ্বয় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (যাঁহারা যুবক, বর্তমান জগতের সকল অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ,

ইউরোপ-আমেরিকার বহু মনীষীর সহিত পত্রালাপে তৎপর এবং সুচিন্তা ও সুব্যবস্থায় বিচক্ষণ তাঁহারা) কি বলিয়া কবিকে ইতালীর স্বেচ্ছাচারী নেতা ও মানব-স্বাধীনতার আদর্শের বিরুদ্ধাচারী মুসোলিনীর গৃহে অতিথিরূপে লইয়া গেলেন্ ?...কবিকে এই মুসোলিনীর অতিথি করিয়া লইয়া যাওয়া উপরোক্ত বুদ্ধিমান যুবকদ্বয়ের পক্ষে কখনো উচিত হয় নাই।" এই সমালোচনাকে আক্রমণের পর্যায় নিয়ে গিয়ে রামানন্দ লিখলেন, "ভগবান কবি ও বিশ্বভারতীকে "ফরেন পলিসি," "ডিপ্লোম্যাসি" ও "হাইফাইন্যান্সের" কবল হইতে রক্ষা করুন। তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে এ সকল দিকে আকাঙ্ক্ষা যাহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের স্থান "স্বরাজ পার্টি'তে," বিশ্বভারতীতে নহে।" (পৃঃ ১৩৩) পরে রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র রামানন্দকে মৌখিকভাবে জানান যে তাঁরা কবির ইতালী যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সে খবরও রামানন্দ বিবিধ প্রসঙ্গে প্রকাশ করেন। (পৃঃ ২৩৭)

রবীন্দ্রনাথের সম্মান রক্ষার্থ এই রকম বার বার রামানন্দ লেখনী ধারণ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে দীনেশচন্দ্রের চেয়ে অল্প বেতনে অধ্যাপকতা করতে ডাকলেন এটা রামানন্দের পছন্দ হয়নি। (পৃঃ ২১৮)

১৯৩৭ সালে 'বন্দেমাতরম' গান নিয়ে দেশে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম গানকে সর্বাংশে সর্বজনের গ্রাহ্য বলে মনে করেন নি। এ বিষয়ে রামানন্দের বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসের মিল ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধী যে সমস্ত আক্রমণাত্মক রচনা তখন চলছিল সেগুলিকে রামানন্দ রেহাই দেন নি। তিনি লিখলেন, "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দেমাতরম সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরোপ, স্থলবিশেষে তর্কবিতর্কের রীতি লঙ্ঘন এবং শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এরূপ আক্রমণে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়না। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস।"

এ সম্পর্কে তালিকা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে তাঁর মতের অমিল হয়নি এমন নয়। বিশেষতঃ নোবেল পুরস্কার পাবার পর শান্তিনিকেতনের সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ রামানন্দ পছন্দ করেন নি। রানী বাগীশ্বরী অধ্যাপক পদের নির্বাচকমণ্ডলীর একজন হয়ে

রবীন্দ্রনাথ একজন প্রার্থীর জন্য সুপারিশপত্র দিয়ে বসলেন, রামানন্দ সেই ত্রুটি প্রকাশ্যে উল্লেখ করলেন।

কিন্তু শুধু সমালোচনা—পক্ষে বা বিপক্ষে—এইটুকুই সব নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্য বিতরণেও অক্লান্ত ছিলেন রামানন্দ। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন প্রভৃতি রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মিত প্রচার রামানন্দ চালিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে মনে হত রামানন্দই যেন প্রচার সচিব। বিশ্বভারতীর রিপোর্ট আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—"ছাত্রীদের শিক্ষার ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যকর ও জনকোলাহল হইতে দূরবর্তী খোলা মাঠে ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারা অসংকোচে চলাফিরা করিতে পারে; এবং সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সংগীত চিত্রাংকন মূর্তিগঠন সূচীশিল্প নানাবিধ গৃহ-কর্ম প্রভৃতি শিখিতে পারে। তাহার জন্য অতিরিক্ত বেতন দিতে হয় না।" (পৃঃ ১৭৩) এই রচনা খবর নয়, সম্পাদকীয় নয়, একে বিজ্ঞাপন বলা যায় সহজেই। রবীন্দ্রজন্মোৎসব, রবীন্দ্রচর্চার নানা আয়োজন এই বিবিধ প্রসঙ্গের সংকলনের একটি বড় অংশ। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রাজনৈতিক মন্তব্য ও বিবৃতির কখনো অংশ কখনো সম্পূর্ণ উদ্ধার করে রামানন্দ তার লোকবোধ্য আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের আলোচনা রামানন্দ করেছেন—তাতেই প্রমাণ যে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কেবলমাত্র সৌখীন কাব্যচর্চা ছিল না। নানা প্রসঙ্গে ঐ সাহিত্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন তিনি।

একটি বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে ইংরাজী অনুবাদের ফলেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজোড়া খ্যাতি এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়া, সেই অনুবাদ কর্মের পিছনে রামানন্দের উৎসাহ অনেকটাই। তৃতীয়বার বিলাত যাবার আগেই রামানন্দ কবিকে ইংরাজীতে তাঁর কাব্যের অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষমতা প্রকাশ করলেও "তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না।" তিনি 'কণিকা' থেকে ছোট ছোট কবিতা অনুবাদ করে রামানন্দকে দেখালেন। বল্লেন, "দেখুন তো মশায়, এগুলো চলে কিনা—আপনি তো অনেক দিন ইস্কুলমাস্টারী করছেন।" রামানন্দই মডার্ণ রিভিয়ুতে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরাজী অনুবাদের রচনা প্রথম ছাপেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত কি এ নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক দীর্ঘকাল চলেছে। যাঁরা

সম্প্রদায়গতভাবে ব্রাহ্ম তাঁদের একটি বড় অংশ রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপ্রসন্ন কারণ তিনি যথেষ্ট ব্রাহ্ম নন। আবার সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মূর্তি-অবিশ্বাসী, ব্রহ্ম সঙ্গীতরচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম চিহ্নিত করেই খুসী হয়েছেন। এই ভূমিকা রচনার সময় একটি লেখা চোখে পড়লো যাতে বলা হয়েছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম প্রতিক্রিয়া: এই অভিযোগকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম। ভেবেছিলুম রামানন্দ তাঁর সমগ্র জীবন ধরে যা বলেছেন তার সমর্থন তাঁর লেখাতেই যদি না পেয়ে কেউ মনগড়া তত্ত্ব কল্পনা করে তাহলে সে নিজেই ঠকবে। পরে মনে হল যে এই গ্রন্থের পাঠকদের অনেকেরই হয়তো রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনা সম্বন্ধে রামানন্দের মতামত জানা না থাকতে পারে। তাঁরাও হয়তো লোকচলিত ধারণায় বিশ্বাস করতে পারেন না জেনে। তাই এই প্রসঙ্গে দুএকটি কথা বলতে হয়। রামানন্দ কোনদিনই রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতকে নামের চিহ্ন দিয়ে দাগী করেন নি। মনস্বী বিপিনচন্দ্রের চোখে তাঁর ধর্মমতের চেহারা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন হাওয়ায় চার পা তোলা ঘোড়ার ফোটোগ্রাফ যেমন ঘোড়ার স্বাভাবিক অবস্থা নয় তেমনি কিছু গান থেকে একটা মতামত খাড়া করলেই তা তাঁর ধর্মমত বলে চালানো যাবে না। রামানন্দ সে চেষ্টা করেন নি। তিনি বরং প্রথম থেকেই বোঝবার চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ কোন সম্প্রদায়ের নন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে রামানন্দ বলেছেন ;—

> মানব-আত্মাকে চিন্তায় ও ভাবে এবং তাহার বাহ্য প্রকাশ কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ স্বাধীন চিরউন্নতশীল করা ও রাখা ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ। এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও আছে, জগতের নানা দেশে আছে। যাঁহারা ব্রাহ্ম নামধারী না হইয়াও এই আদর্শের অনুরাগী এবং যাঁহাদের জীবন এই আদর্শের অনুসরণ করিবার অকপট চেষ্টার পরিচয় দেয়, তাঁহাদের কাহাকেও যেমন অব্রাহ্ম মনে করিনা তেমনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিও মনে করি না। জগতের সর্বত্র যাঁহারা এই আদর্শের অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ সেই সর্বজাতীয় সঙ্ঘভুক্ত। এই সঙ্ঘের কোন সাম্প্রদায়িক নাম নাই।"

(প্রবাসী মাঘ ১৩২৭। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ)

১৩২৪ সালে থীস্টিক কনফারেন্সের সংগে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলে রামানন্দ যা লিখেছিলেন তাও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ গোষ্ঠীর নন একথা রামানন্দ সগৌরবে চিঠিতে লিখেছেন এবং সেই সংগে একথাও বলেছেন যে ব্রাহ্মসমাজ অচলায়তনে পরিণত হয়েছে তাকে 'আগে' চালাতে গেলে রবীন্দ্রবাণীর প্রয়োজন। রামানন্দ লিখেছিলেন, "আপনি থীস্টিক কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবেন না বলিয়া খুব যে দুঃখিত হইলাম তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ বাস্তবিকই বিধাতা আপনাকে চৌকির মাপে গড়েন নাই। আমি আশা করিয়াছিলাম আপনি হইলে এমন কিছু বলিবেন যাহাতে ব্রাহ্মসমাজকেও নবীনতা ও 'আগে' চলিবার শক্তি দিতে পারে। আমরাও আচারে ও শাস্ত্রে বাঁধা পড়িতেছি। আমাদেরও অচলায়তন প্রায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে।"

রামানন্দ যেমন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিচিত্র গৌরবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন সকলের কাছে, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর এই অকৃত্রিম সুহৃদের পরম মূল্য দিয়েছেন শ্রদ্ধায়, সমাদরে। রবীন্দ্রনাথের লেখা পাবার ইচ্ছা যেমন স্বভাবতঃই রামানন্দের ছিল, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর অধিকাংশ লেখাই প্রবাসীতে পাঠাতেন। আর সব সময়েই বলতেন সম্পাদকীয় বিচারে যোগ্য মনে হলে তবেই যেন ছাপা হয়। জীবনের শেষ কয়েক বছরে যখন তাঁর টুকরো খণ্ড কাব্যাংশ পেলেও পত্রিকা সম্পাদকরা কৃতার্থ বোধ করতেন তখনও রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখেছেন 'যদি মনঃপূত হয় Modern Review-তে ছাপতে পারেন' কিংবা 'একটা কবিতা তর্জমা করে পাঠাচ্ছি আশাকরি এটা গ্রহণীয় হবে।' আবার অনেক আগে ১৯১৩ সালে যখন আমেরিকা পরিভ্রমণ করছেন তখন প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু আমেরিকার কাগজে প্রবন্ধ না দিয়ে পাঠিয়েছেন রামানন্দকে, লিখেছেন "পদার্থ কিছু নেই যদি ছাপাবার যোগ্য মনে করেন তো ছাপবেন।" আবার কখনো ইংরাজী লেখা পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন "আপনিও ইহার মধ্যে কিছু সূচীকর্ম করিয়া এটাকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া তুলিবেন।" (১৩৪৮ আশ্বিন, প্রবাসী) অরবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে রচনা, মুলুর শ্রাদ্ধবাসরের উপাসনার বক্তৃতা সবই নিজে থেকে পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'জীবনস্মৃতি' প্রবাসীতে ছাপতে চেয়েছেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, "তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার

পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন, অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিক পত্রের Black and white-এ আমার জীবনটার এক গালে চূণ ও এক গালে কালি লেপন করতে পারবো না।" (কার্তিক ১৩৪৮, প্রবাসী)

প্রবাসী ও রামানন্দবাবুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদার মন্তব্যের সুযোগ হয়েছিল ১৩৪৮ সালে যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরিচয় পত্রিকায় তাঁকে লিখতে আমন্ত্রণ করলেন। বাংলা ভাষায় প্রবাসীর কৃতিত্ব কি, তার ভূমিকা কি এবং রামানন্দের ব্যক্তিত্ব কোথায় এ পত্রিকাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগলো। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িকপত্রে সময় রক্ষা করে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ন বা সায়াহ্নে যাত্রা সুরু করতে লজ্জিত হত না মাসিকপত্র তেমনি ললাটে মলাটে বৈশাখমাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসংকোচে আসরে নামত সহিষ্ণু পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হোতো না। পাঠকদের ক্ষমাগুণের পরে নির্ভর করে এমনতর আটপৌরে ঢিলেমী করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেন নি—নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন হোতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন অভ্যাস জন্মে গেল যে আয়োজন কম পড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জনা করবে না যে, এতে সন্দেহ রইল না।...

"প্রবাসীজাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেছে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে।" (পরিচয় ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা)

১৯১৩ সালে ইংলণ্ড থেকে রামানন্দকে লিখলেন "প্রবাসীর যে শত্রুসংখ্যা

বাড়িতেছে ইহাতে আনন্দিত হইবেন। ইহাতে প্রবাসীর প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শত্রু সৃষ্টি করা শক্তিরই লক্ষণ—বিশ্ববিধাতারও শত্রুর অভাব নাই। আপনি বন্ধু যদি না পাইতেন তবে শত্রু দেখা দিত না।" (২৯শে বৈশাখ ১৩২০) এই চিঠির শেষ পংক্তির সুর থেকে বুঝতে পারি যে নিজের বন্ধুত্ব রবীন্দ্রনাথ আর একবার গভীর আন্তরিকতার সংগে ঘোষণা করলেন।

প্রবাসী সম্পাদক নানা কৌশলে লেখা আদায় করতেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, একথা শ্রদ্ধেয় নয়। কারণ "নানা কৌশল" কথাটার মধ্যে ন্যায়সংগত পদ্ধতির বহির্ভূত পন্থারও ইংগিত আছে। ১৯১৭ সালের কোন সময়ে রামানন্দের মনে এই অভিযোগ অভিমান ও যন্ত্রণার সূচনা করে থাকবে। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে পরমবন্ধুর মত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> আপনি আমার কাছ থেকে প্রবন্ধ আদায় করবার জন্যে নানা কৌশলে চেষ্টা করে থাকেন এ রকম জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয়নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না—ভয় মৈত্রী প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশি না পাই ত অল্প, অল্প না পাই ত স্বল্প আদায় করে নিতুম। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দোষ হচ্ছে এই যে খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনমতেই গোরা লেখা হত না। ...যাই হোক প্রবাসীর লেখার জন্য মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন তাতে বুঝতে পারব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন আমি লিখতে পারি।"

ভারতী পত্রিকার ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সেই পত্রিকায় রামানন্দ ও প্রবাসীর প্রতি কিছু অশালীন মন্তব্য প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ভেবেছিলেন যে তাঁর বক্তব্য তিনি ভারতীর সম্পাদিকাকে আড়ালে জানাবেন কিন্তু পরে মনে হল "কথাটা তেমন করে চাপা দিলে আত্মীয়তা করা হবে কর্তব্য করা হবে না। তিনি একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করলেন ১৩৩৩ আশ্বিনের 'সবুজপত্রে'। সেই পত্রটি এই গ্রন্থের তথ্য সংযোজনে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে কেবল রামানন্দসম্পর্কিত অংশটুকু উদ্ধার করি।

"প্রবাসী সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন

তবে তার কারণ এ নয় যে তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে ; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।" (৪৫৫ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাপিয়ে ব্যবসা করেছেন রামানন্দ একথা শুধু ভারতী নয় অন্য মহল থেকেও বলা হয়েছে। তখন রামানন্দের হয়ে কলম ধরার অন্য লোক নেই—কারণ ঘটনাটা কবির মৃত্যুর পরে। মহাজাতি সদনের কোন অংশ রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত করে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করে দেশনেতা শরৎচন্দ্র বসু জনসাধারণের কাছে অর্থসংগ্রহের আবেদন জানান। রামানন্দ সেই আবেদনের প্রতিবাদ করেন—তাঁর বক্তব্য ছিল যাঁরা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য টাকা দেবেন তাঁরা সর্বাগ্রে বিশ্বভারতীতে টাকা দিন এই নিবেদন করা ; বিশ্বভারতীতে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়ে গেলে তবে তাঁরা অন্য স্মারক প্রতিষ্ঠানে টাকা দিলেই ভাল হয়। তাঁর আরও বক্তব্য ছিল মহাজাতি সদন তখন ক্রোকবদ্ধ, "বিচারান্তে ক্রোকমুক্ত হয়ে জনসাধারণের প্রতিনিধি ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসমষ্টি-বিশেষের হাতে আসবার পর তবে রবীন্দ্রনাথের নাম তার সংগে যুক্ত করা প্রস্তাব সংগতভাবে উঠতে পারতো। এখন সে প্রস্তাব অ যথা-সাময়িক (premrature)।" (প্রবাসী, বিবিধ প্রসংগ আশ্বিন ১৩৪৮) কিন্তু যেটা নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সেটি হোলো আর একটি মন্তব্য :

Supposing the property in question can somehow come into non-official possession, why are not trustees representing the different nationalist parties in the country appointed to hold and administei it? Is it not an admitted fact that Rabindranath Tagore did not belong to any party? And therefore is it not quite plain that his name should not be exploited for party purposes ?"

শরৎচন্দ্র এই মন্তব্যে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "মডার্ণ রিভিয়ু পত্রের শ্রদ্ধেয় সম্পাদকের মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঁড়াইয়া দলগত স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ তেমন ভাল শোনায় না। রবীন্দ্রনাথের নামে

মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসী যে ব্যবসায়গত সুবিধা পাইয়াছে তাহা উক্ত মাসিক পত্রদ্বয়ের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই প্রমাণিত হয়।"

এর উত্তরে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের ঐ ভারতীসংক্রান্ত চিঠিটির উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। বরং মর্মাহত হয়ে বল্লেন যে শরৎবাবুর ব্যবসা নিয়ে তিনি তো কোন প্রশ্ন তোলেন নি শরৎচন্দ্রই বা কেন ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশ্ন তুললেন। আর রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় নিজের ব্যবসার সুবিধা সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানে, এই ভূমিকায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক :—

"আমি চল্লিশবছরের ধরে রবীন্দ্রনাথের নানারকম রচনা প্রকাশ করেছি পরে আরও করবো। তাঁরই রচিত জিনিস প্রকাশ করেছি এবং সেগুলি যে তাঁর তাও মুদ্রিত করেছি। এর মানে নাম ভাঙানো নয়। আমি যদি তাঁর নামে এমন কোন বাজে জিনিস চালাতাম বা চালাবার চেষ্টা করতাম যা তাঁর নয়, তা হলে তাকে নাম ভাঙানো বলা যেতে পারতো। আমি তা কোন কালে করিনি। অতএব আমার নামে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙানোর ইঙ্গিত সম্পূর্ণ মিথ্যা।

"বাঙালী যে যে সম্পাদক পেরেছেন তাঁরাই তাঁর লেখা পেয়ে ধন্য হয়েছেন ও হবেন। এঁদের কারো নামে রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙানোর অপবাদ কোন সুস্থ প্রকৃতির মানুষের কল্পনায় আসতে পারে না।"

(কার্তিক ১৩৪৮, প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ)

'বিবিধ প্রসঙ্গে' সেই রামানন্দ প্রকাশ পেয়েছেন যিনি প্রতিমাসে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তথ্যমূলক রচনা প্রকাশ করে, তাঁর পক্ষ নিয়ে নির্দ্বিধায় যে কোন লোকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর প্রচারকার্য ক্রমাগত চালিয়ে এ কথা বিশ্বাস করবার সুযোগ দিয়েছেন যে রবীন্দ্রঅনুরাগই তাঁর রবীন্দ্রসম্পর্কের প্রথম ও প্রধান কথা ছিল। যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই পরম বন্ধুর মহত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। একবার ১৯৪০ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রামানন্দের ভাষণটি ভাল লাগায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার উদ্দেশে আপনাদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বাণী আমার জীবনে বিধাতার প্রসন্নতাকে সার্থক করে।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ কোন রচনা 'বিবিধ প্রসঙ্গে' লিখলেন না। ১৩৪৮ ভাদ্র সংখ্যার 'রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচিহ্ন' ও 'মরিবার ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার

দরকার নাই'—নামে দুটি ছোট টীকা লিখলেন কিন্তু সেই সংগে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন ১৩৪৮ ভাদ্র সংখ্যাতেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং বহুমুখী চিত্তবৃত্তির বিচিত্র প্রকাশের উল্লেখ করে একটি পূর্ণ চিত্র রচনার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, "তাঁর সংগে খুব দীর্ঘকালের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁকে ভাল করে চিনেছি, বুঝেছি, এ অহংকার আমাদের নেই।...এই প্রবন্ধে তাঁর নানাবিধ কৃতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বটে; কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব কৃতি-গুলির সমষ্টি নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব যে সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি অখণ্ড সত্তা, এই কথা মনে রাখতে হবে।"

এই প্রসংগে জানাই যে 'বিবিধ প্রসংগে' রামানন্দ শুধু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চিন্তা ও সৃষ্টির কথাই বলেই নি—বৃহত্তর অর্থে যা রবীন্দ্রজগৎ তার পরিচয় তিনি তাঁর রচনাগুলির মধ্যে ধরে রেখেছেন। ঠাকুর পরিবারের নানা স্মৃতি-কথা তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সৌদামিনী দেবী, প্রফুল্লময়ী প্রভৃতিকে দিয়ে। তিনি যদি এ কাজ না করতেন তাহলে পুরানো দিনের বহু কথাই অজানা থেকে যেতো। পরিবারের তরুণতর প্রজন্মে মৃত্যু ঘটলে রামানন্দ সে সম্বন্ধে 'বিবিধ প্রসংগে' লিখতেন। এই সংগ্রহে সেগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য তিনি সাধ্যমতো সংগ্রহ করতেন। বিদেশী অনুরাগীদের মধ্যে এণ্ডরুজ, পিয়র্সন এলমহার্স্টের প্রসংগ বার বার তাঁর লেখনীকে আকর্ষণ করেছে। অনেক গ্রন্থের আলোচনাও তিনি নিজেই করেছেন। প্রাসংগিক সমস্ত খবর দিয়েছেন শান্তি-নিকেতন আশ্রম জীবনের।

এই সংকলনে তাই শুধু রবীন্দ্রনাথকেই পাইনা, রামানন্দকেও পাই—পাই সমসাময়িক কালকে, পাই তৎকালীন জীবনের হৃদয়োত্তাপ। কোন একজন স্রষ্টার বহুবিচিত্র প্রতিভাকে নানা দিক থেকে প্রতিফলিত করার এই চেষ্টা একান্ত দুর্লভ যেমন, তেমনই দুর্লভ মানুষ রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে রামানন্দের অন্তহীন প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ যে স্রষ্টা, তাঁর মধ্যে যে নিত্যপরিবর্তনের খেলা চলছে এ কথা রামানন্দ বুঝেছিলেন। তাই রামানন্দের এই মন্তব্যগুলি একত্র করলে যেমন মানুষ রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণ মূর্তি ভেসে ওঠে তেমনি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের নানা রূপপরিবর্তনের ইতিহাসের ধারাটিও স্পষ্ট হয়। এরই সংগে সংগে উৎসাহী পাঠক রামানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন

পত্রাবলী দেখতে পারেন। সেগুলি ১৩৪৮ এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধুর্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পরিচয় তার মধ্যে ধরা পড়বে।

প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী আজ রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠকদের তথ্য সন্ধানের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার। আরও বহু তথ্য রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে। এই তথ্যগুলি সংকলিত হলে তা রবীন্দ্রজীবনীর পরিপূরক হবে। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাই সাময়িক পত্রাদি থেকে রবীন্দ্রপ্রসংগ সংকলন করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করার একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক বছর আগে শ্রীমতী নন্দরাণী চৌধুরীর "সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রপ্রসংগ। সাহিত্য" প্রকাশিত হয়। সেই খণ্ডে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সাহিত্য পত্রিকায় যে রবীন্দ্রালোচনা করেছিলেন তাই সংকলি‿ হয়। এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রবাসী থেকে সংকলিত। তৃতীয় খণ্ড 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা থেকে সংকলিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা, দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের সন্নিবেশ বৃহৎ জগতের পটভূমিকায়, তৃতীয় খণ্ডে প্রধানতঃ আশ্রম কথা। এই বিপুল পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই এই খণ্ডের সার্থকতা।

এই কাজের বিস্তৃতির কথা ভেবে অনেকবার পেছিয়ে গেছি কিন্তু টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের অনেকের সক্রিয় সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত এগুলি ভাগে ভাগে গ্রথিত করে তোলা গেল। তাদের মধ্যে বিশেষ করে যাদের নাম মনে করতে হয় তাঁরা হলেন শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী জয়ন্তী রায়, শ্রীমতী সুলেখা সিংহ, শ্রীবাদল মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুপ্তি মিত্র। পিছনের তথ্যপঞ্জী রচনায় অধ্যাপিকা শ্রীমতী মঞ্জুলা বসুর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রসমালোচনার তালিকাটি করে দিয়েছেন শ্রীমতী চিত্রা দেব: শ্রীমতী আভা নাথও কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যে সমস্ত প্রবীন সদস্য অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে আমাদের সকল কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকে—অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীশৈবাল গুপ্ত ও শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু—তাঁদের সকলের শুভেচ্ছা

ও নির্দেশ আমাদের প্রেরণা দেয়। এই প্রসঙ্গে তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

দীর্ঘদিন ধরে ছাপার কাজ চলেছে। মুদ্রণ প্রমাদ থেকে চেষ্টা করেও নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। তার দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার—প্রেসের নয়। প্রেস যে যত্ন নিয়ে ছেপেছে তার জন্য তরুণ পরিচালক শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্রকে ও তার যোগ্য সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

রবীন্দ্র-অনুরাগী ও রবীন্দ্র সাহিত্যের নিয়মিত পাঠকেরা উপকৃত হবেন এই আশায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
কলকাতা

সোমেন্দ্রনাথ বসু

প্রচ্ছদপটের চিত্রটি শিল্পাচার্য নন্দলাল অংকিত বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের—আশ্বিন ১৩৩৫ সংখ্যা প্রবাসীতে (এই গ্রন্থের ১৫৩ পৃঃ) এ সম্পর্কে রামানন্দের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী

প্রবাসীতে একই নাম কখনো কখনো ভিন্ন ভিন্ন বানানে লেখা হয়েছে—এই গ্রন্থেও বানানের সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি অনেক ক্ষেত্রে।

বৈশাখ, ১৩১৮

কবি সম্বর্ধনা

আগামী ২৫ শে বৈশাখ রবিবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী; তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সম্বর্ধনা করা দেশবাসীর কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে, নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্বে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবিগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটী হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্ম-তিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটীর সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য করিবেন।

সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবি-বরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে কোনো স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সমিতির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদ পত্রে স্বীকৃত হইবে। সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৫৩ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।

সমিতির সদস্যগণ

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

" জগদীশচন্দ্র বসু

" ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

" সারদাচরণ মিত্র

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রায় " যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

" প্রফুল্লচন্দ্র রায়

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সমিতির সম্পাদক)

" ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সমিতির ধনরক্ষক)

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফাল্গুন, ১৩১৮

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

সাল্টননিবাসী ফ্লেচারের লেখায় এইরূপ একটি মত প্রকাশিত হইয়াছে যে কোন মানুষ যদি কোন জাতির সমুদয় কথা ও কাহিনী ও গান রচনা করিতে চান, তাহা হইলে উহার আইনগুলি কে প্রণয়ন করে, তাহার খোঁজ লইবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। সোজা কথায় ইহার মানে এই যে লোকপ্রিয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ভবিষ্যৎ যেমন করিয়া গঠিত ও নির্ধারিত করিতে পারে, আইনে তাহা পারে না। ফ্লেচারের মতটিতে কবি-মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় চরিত্রকে যে ভাবে গড়িয়াছে, কোন্ শাসনকর্তা নিজের প্রভাব সেই প্রকারে, তেমন স্থায়ী ভাবে, বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? সুতরাং কবির সম্মান স্বাভাবিক, তাঁহার সম্বর্ধনা করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক।...

বর্তমান বৎসর বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া একান্ন বৎসরে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে বোলপুরে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সবান্ধবে তাঁহার জন্মোৎসব করেন এবং তাঁহাকে প্রীতি ও

ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এমন আদানপ্রদান আমরা কখনও দেখি নাই। তৎপরে গত ১৪ই মাঘ কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বাঙ্গালী জাতির এক সভায় কবির সম্বর্ধনা হয়। টাউনহলে এই উপলক্ষে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী, যাঁহারা চিত্রে সঙ্গীতে বাণীর বরলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিবিতে দেন নাই, যাঁহারা ব্যবহারজীবীর কার্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলংকৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্পবাণিজ্যে বঙ্গের নবযুগের প্রবর্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্যে বঙ্গের অগ্রণী, তাঁহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহু কৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গমাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৃহধর্মে নারীর সহকারিতা ব্যতিরেকে আর্যের কোন ধর্মানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয় না। সমাজধর্মেও যে এই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে, ইহা অতি সুলক্ষণ। জাতীয় কবির সম্বর্ধনা ধর্মানুষ্ঠানেরই মত পবিত্র। অনুষ্ঠানে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন বঙ্গের যুবকগণ। তাঁহাদের উৎসাহদীপ্ত মুখশ্রী হলের সর্বত্রই দৃষ্ট হইতেছিল। শ্রেষ্ঠ কবিরা আমাদিগকে আশার বাণী শুনান, সেই স্বপ্নলোকের কথা বলেন, যাহা ক্রমাগত মানুষের অন্তরে ও বাহিরে বাস্তবে পরিণত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বাস্তব হইয়া যাইতেছে না। সুতরাং, আশা ও উৎসাহ যাঁহাদের প্রাণ, স্বপ্নলোকে বিচরণ যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ, সেই তরুণবয়স্কেরা যে হাজারে হাজারে বঙ্গের কবি-শিরোমণির সম্বর্ধনায় যোগ দিবেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

টাউনহলের সভা ভিন্ন আরও একদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ, এবং একদিন সম্বর্ধনা কমিটির সভ্যগণ সান্ধ্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে বংগের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, ইহা সর্ববাদিসম্মত ; তিনি যে জীবিত বাংগালী লেখকগণের মধ্যে প্রথমস্থানীয় ইহাও অধিকাংশ শিক্ষিত বাংগালীর, পক্ষপাতশূন্য সমুদয় শিক্ষিত বাংগালীর বিশ্বাস, যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের, এবং বহু-ভাষাভিজ্ঞ কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তির মত এই যে তিনি বংগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য। তিনি বাংগলা সাহিত্যের যে বিভাগে হাত দিয়াছেন, তাহাকেই অলংকৃত করিয়াছেন ও ও তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন,—তাহা তাঁহার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশ্বসংগীত শুনিয়াছেন, তাঁহার গদ্যরচনায় ও কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। নয়নগোচর রূপের জগৎ, সৌন্দর্যের জগৎ অনেক কবি, অনেক বাংগালী কবি, দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন —তিনি এ বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা কম শক্তিশালী নহেন ; কিন্তু ধ্বনির জগতের রূপ তাঁহার মত করিয়া অনুভব করিতে ও নিপুণতার সহিত অন্যকে অনুভব করাইতে অল্পলোকেই পারিয়াছে। শিক্ষা, সাধনা, শোক তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে সমর্থ করিয়াছে। রচনার মধ্য দিয়া তিনি পরব্রহ্মের প্রেরণায় আমাদিগকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত যোগস্থাপন করিতে আহ্বান করিতেছেন।

মানবপ্রাণের নিগূঢ় মর্মস্থলে পেঁীছিতে তাঁহার মত আর কোন্ বংগীয় লেখক পারিয়াছেন ? মানবের বাহ্য আচরণের আন্তরিক কারণ কে এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন ? তাঁহার হস্তে বংগসাহিত্য জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছে। যে সকল আদর্শ, ভাব ও চিন্তার স্পর্শ, প্রভাব ও শক্তি বিশ্বমানবকে উন্নতির জন্য, নব আলোকের জন্য, নব জীবনের জন্য, চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার রচনার মধ্যে অনুভব করিতেছে।

বাংগলা ভাষায় যদি কেবল তাঁহারই রচনা থাকিত, তাহা হইলেও উহা বিদেশীদের শিখিবার যোগ্য হইত। কিন্তু তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন তিনি ওস্তাদ না হইলেও, সংগীত বিদ্যাতেও তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভা লক্ষিত হয়। তিনি যে কেবল ভগবদ্‌ভক্তি ও অন্যান্য নানাবিষয়ক বহুসংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন, তাহা নয় ; তিনি যে কেবল সুকণ্ঠে হৃদয়বীণার

সহিত মিলাইয়া নানাভাবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন, তাহা নহে, তিনি নূতন নূতন গানে নূতন নূতন সুর দিয়া নিজ বিশুদ্ধ সংগীতদক্ষতা দ্বারা অনেক সময় ওস্তাদ্‌দিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কবিতা ও নাটক পাঠে ও আবৃত্তিতে এবং সভাস্থলে লিখিত বক্তৃতা পাঠে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা লক্ষিত হয়। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দেন, এবং না লিখিয়া মুখে মুখে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্বরচিত নাটকের তিনি যেরূপ অভিনয় করেন, তাহাতে তাঁহাকে অসাধারণ অভিনেতা বলিয়াই মনে হয়।

তাঁহার রচিত স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি বিষয়ক গানগুলি অতীব প্রাণস্পর্শী। তৎসমুদয় শ্রোতৃবর্গকে জন্মভূমিকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিক্ষা দেয়, মাতৃভূমিকে হৃদয়মন্দিরে আরাধ্যাদেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখায়। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস এরূপ যে আমাদের জাতীয় সংগীতে বীররসের সঞ্চার করিতে হইলেই ভারতবাসী কোন না কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে মনকে উত্তেজিত না করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক গান রচনা করা সহজ হয় না। কিন্তু এরূপ গান, সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রীতিকর বা উৎসাহবর্ধক হইতে পারে না। তদ্দ্বারা সম্প্রদায়বিশেষ ক্ষণিক উত্তেজনা, উৎসাহ ও তৃপ্তি লাভ করিলেও তাহা জাতিগঠনের উপায় হইতে পারে না। এই ভাবের বীররসাত্মক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নাই। তাহা না করিয়া তিনি ভালোই করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া বীরত্বসঞ্চারী কোন গানই যে তিনি রচনা করেন নাই, তাহা নহে। বীরত্বের প্রধান উপাদান কি কি? সাহস, নির্ভীকতা, অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ, স্বদেশবাসীর বা মানবের মহত্ত্বসম্ভাবনায় দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের পক্ষে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় বিশ্বাস সর্বদেশে মানব প্রকৃতির অদম্যতায় বিশ্বাস, সত্যন্যায়করুণার জয়ে বিশ্বাস, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল-বিধানে বিশ্বাস। এইসব উপাদান তাঁহার "স্বদেশী" গানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আছে, "কথা ও কাহিনী"তে আছে। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে" এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে; বাহিরের শৃংখল যত দৃঢ় করিবার চেষ্টা হয়, আভ্যন্তরীণ বন্ধন তত টুটিয়া যায়, এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? তাঁহার রচনাবলীর অসামান্য সুষমা ও সংযতভাব, তৎসমুদয়ে বাহ্য ডাক হাঁক আস্ফালনের বাক্যের বীরত্বোচ্ছ্বাসের

অভাব আমাদিগকে অনেক সময় ভুলাইয়া দেয় যে তন্মধ্যে কিরূপ শান্ত সংযত আত্মসংবৃত অটল বীরত্বের উপাদান আছে।

তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সংকীর্ণতা, অতীত গৌরবের অতিপূজা, কিম্বা বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্বে এবং বিধি-নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশেরও যে এইরূপ বিশেষত্ব, বিশেষকার্য এবং ভবিষ্যৎ আছে, তাহা তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, অনাবশ্যকও মনে করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ সকলের একটা নিকৃষ্ট নকল মাত্র হয়, কিংবা উৎকৃষ্ট নকলও হয়, ইহা তিনি চান না। পশ্চিমের নিকট হইতে আমরা লইব, পশ্চিমও আমাদের নিকট হইতে লইবে। ভিক্ষুকের মত, পৈত্রিকসম্পত্তিবিহীন অনাথ বালকের মত আমরা পশ্চিমের রাজপ্রাসাদের দ্বারস্থ হইব না। আমাদেরও প্রকৃতিতে সর্ববিধ মহত্ত্ব, সর্ববিধ সাফল্য, সর্ববিধ ঐশ্বর্যের বীজ নিহিত আছে; পশ্চিমের উত্তেজনায়, পশ্চিমের আলোড়নে, পশ্চিমের উত্তাপে, পশ্চিমের নবশিক্ষাবারিসেচনে, ঐ সব বীজকে অংকুরিত করিয়া তুলিতে হইবে। অসাড় আমরা প্রাণবান্ পশ্চিমের সংস্পর্শে চেতনা পাইব। অন্ধকার গৃহের বদ্ধ বাতাসে আমরা ছিলাম; পশ্চিম আমাদিগকে বাহিরের ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, বাহিরের জনতার সহিত ঠেলাঠেলির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এখন হাত পা ও মনটা একটু স্বাভাবিক ও সতেজ হউক। পশ্চিম উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। উহার আবির্ভাব আমাদেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাধির ফল ও বাহ্যলক্ষণ। জোর করিয়া পশ্চিমকে গলাধাক্কা দিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। আমরা মানুষ হইলে, সুস্থপ্রকৃতি হইলে, স্বদেশকে বাস্তবিক স্ব-দেশ করিতে পারিলে, ভাবে, চিন্তায়, জ্ঞানে, কার্যে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে স্বদেশী করিতে পারিলে, শৃংখলা, সৌন্দর্য স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্যে স্বদেশী চেষ্টায় স্বদেশকে বরেণ্য করিতে পারিলে আপনা আপনি পশ্চিমের প্রভুত্ব খসিয়া পড়িবে।

সুতরাং তাঁহার রাজনীতি আবেদন নিবেদন ততটা নহে, যতটা স্বদেশবাসী প্রত্যেকের ও স্বদেশী সমাজের আভ্যন্তরীণ সুস্থতাসম্পাদন ও শক্তিবর্ধন। ভিতরে যে প্রবৃত্তির, স্বার্থের, ভয়ের, অজ্ঞানতার, কুপ্রথার দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। অতএব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পথ আগে ভিতরেই

অন্বেষণ করা চাই। এইজন্য রাজনীতিক্ষেত্রের রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মাচার্য রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন।

তিনি শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন শিক্ষার আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে তিনি ইহার প্রাণ বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন। এই আধ্যাত্মিকতা কতকগুলি বাহ্য জীবনহীন অনুষ্ঠান, বা সমাজবিমুখ সন্ন্যাস নহে। ইহা দেহমনের পবিত্রতা ও সুস্থতা দ্বারা প্রাণে, সমাজে, প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সংস্পর্শলাভ। কৃচ্ছসাধন ব্রহ্মচর্য নহে। পবিত্রতা যেমন ব্রহ্মচর্যের প্রাণ, আনন্দ তেমনই ইহার হৃদয়। কঠোর শাসন চরিত্র গঠনের ব্রহ্মাস্ত্র নয়। আনন্দের সহিত শিক্ষা, মানব প্রকৃতির স্বভাবসুস্থতায় বিশ্বাস, চরিত্রগঠনের প্রকৃত উপায়। সুস্থ প্রকৃতি বিলাস চায় না, জঘন্য আমোদ চায় না। পৌরুষেই তাহার আনন্দ। প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর প্রাণ রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শরীরী হইয়াছে।

অনেকে বয়োবৃদ্ধিসহকারে সামাজিক কুপ্রথাদি বিষয়ে রক্ষণশীল হয়েন; রবীন্দ্রনাথ মতে ও আচরণে যাহা কিছু ভাল তদ্বিষয়ে রক্ষণশীল কিন্তু যাহা অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে সংস্কারপ্রয়াসী। এবং এই ভাব বয়োবৃদ্ধিসহকারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বৈচিত্র্যময় ও নানাজাতীয়; তিনি নিজেও বিচিত্র-কর্মা। তিনি নিজে তাঁহার রচনাবলী ও কার্য অপেক্ষা মহৎ। তাঁহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য বাঙ্গালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না। যাহা হইয়াছে, তাহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ।

চৈত্র, ১৩২০

আমরা অবগত হইলাম, বর্ধমান বিভাগের প্রতিনিধি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হার্বার্ট এ ষ্টার্ক বোলপুর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া রিপোর্টে উহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

'concreted in this school a scheme of studies which retained

the traditional ideals of India without rejecting the best features of English public schools...The Bidyalay, removed from the busy haunts of men, is picturesquely set amid groves of shady trees on the healthy uplands of Bolpur. It has 180 boarders—all the sons of Indian gentlemen. They wake in the early morning, get ready for the day, tidy their beds, say their private prayers ..and then assemble to recite together petitions from the Upanishads and other sacred books. The teachers meet for supplication before they enter upon and after they have completed the duties of the day. In addition to their general studies the boys are taught to be self-reliant, to be helpful to one another, to be courteous to all, to attend on visitors, to be dutiful, unselfish and God-fearing. The monitorial system has been introduced with marked success, and the senior boys are given an important share in maintaining discipline and enforcing good conduct, through their own courts of enquiry, from which their lies an appeal to the council of Masters... Studies proceed by a self-contained syllabus, which gives a sound and generous education,...Indeed, examinations of all sorts are tabooed, as also everything savouring of cram....

Remarkable as is the entire conception and organisation of the school, more striking for Bengal is the attitude of the pupils to agrarian studies. They tend the farm cattle, and take a pride in doing so. They were not ashamed to groom and milk the cows they exhibited at the Annual Exhibition this year at Suri.

And yet sad to tell, for some time this school was under a political cloud."...&c.

ষ্টার্ক সাহেব শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য কোন কোন ইংরেজকে আনিয়া আশ্রম দেখাইয়াছেন ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছেন।

তাঁহার নিজের অফিসের অন্যান্য বিদ্যালয়পরিদর্শকদিগকে এস্থান দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুকূল ভাব থাকায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইতে এ বৎসর গত বৎসরের মত ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ছেলেরা সহজেই অনুমতি পাইয়াছে।* আমরা শুনিয়াছি যে তিনি বীরভূম জেলার অন্যত্র স্কুলের অধ্যক্ষদিগকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদিগকে পাঠাইয়া তথাকার শিক্ষাপ্রণালী দেখাইয়া আনিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার বিভাগের স্কুলগুলির এবং ছাত্রদের মঙ্গলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে।

চৈত্র, ১৩২০

এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার প্রশ্নপত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছিন্নপত্র" হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে বলা হইয়াছে—"Rewrite the following in chaste and elegant Bengali", নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিকে মার্জিত শুদ্ধ সুন্দর বাংলায় লেখ।" হওয়া করা প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্যের আর সমুদয় অংশ যতই সংস্কৃতের মত হইবে, বাংলাটা ততই শুদ্ধ মার্জিত সুন্দর হইবে এই সংস্কার এখনও বদ্ধমূল হইয়া আছে। প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কথিত বাংলায় লিখিয়াছেন, তাহা কেতাবী বাংলায় পরিবর্তিত করিতে হইবে। কিন্তু কথিত বাংলা chaste এবং elegant হইতে পারে না, কেতাবী বাংলা হইলেই chaste ও elegant হয়, ইহা মনে করা ভুল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

নন্দলাল বসুর অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে ছুটি হইয়াছে। ছুটির পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন অধ্যাপক ও

*শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত নহে বলিয়া উহার ছাত্রদিগকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মত অনুমতি লইতে হয়।

ছাত্রকে লইয়া "অচলায়তন" নাটকের চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বিদ্যালয়ের অনেক বন্ধু বোলপুর গিয়াছিলেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তাঁহাদের মধ্যে একজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত গুণী ব্যক্তিকে আশ্রমে পাইয়া তাঁহার যথোচিত আদর করেন। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন কবিতার প্রতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিলাম।

ওঁ

শ্রীমান নন্দলাল বসু
পরম কল্যাণীয়েষু
তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী-চিত্ত।
বংগলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত।
ভাগ্যবিধাতা আশিষ মন্ত্র
দিয়েছে তোমার কর্ণে
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ!
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন ছন্দ।
চিরসুন্দর কর গো তোমার
রেখাবন্ধনে বন্দী!
শিবজটাসম হোক্ তব তুলি
চিররস-নিষ্যন্দী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতন
১২ই বৈশাখ
১৩২১

আষাঢ়, ১৩২১

"চিত্রা।"

রবিবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরেজী গদ্যানুবাদ 'চিত্রা'* নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতে ও আমেরিকায় ইহার খুব আদর হইয়াছে। নারীর নারীত্ব, নারীর প্রকৃত স্বরূপ দৈহিক সৌন্দর্যে নয় তাঁহার অন্তরে যে চিন্ময়ী সতী, তাঁহার যে "আপনাত্ব" আছে, তাহাই নারী। নারী যদি ভাবেন তিনি কেবলই পুরুষকে মুগ্ধ করিবার যন্ত্রের মত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে বুঝেন নাই। পুরুষ যদি ভাবেন নারী কেবল ভোগ্যা, তাহাতে তাঁহার হৃদয় অতৃপ্ত থাকে, নারীকেও পাওয়া হয় না। পুরুষ-নারীর সম্পর্কের এইরূপ অনেক নিগূঢ় কথা বহিখানি পড়িলে উপলব্ধি করা যায়। কবি শেষে চিত্রাঙ্গদাকে যে কথাগুলি বলাইয়াছেন তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি নানা অর্থসম্ভারে ঐশ্বর্যশালী।

"I brought from the garden of heaven flowers of incomparable beauty with which to worship you, god of my heart. If the rites are over, if the flowers have faded, let me throw them out of the temple [*unveiling in her original male attire.*] Now, look at your worshipper with gracious eyes.'

'I am not beautifully perfect as the flowerr with which I worshipped. I have many flaws and blemishes. I am a traveller in the great world-path, my graments are dirty, and my feet are bleeding with thorns. Where should I achieve flower-beauty, the unsullied loveliness of a moment's life? The gift that I proudly bring you is the heart of a woman. Here have all pains and joys gathered, the hopes and fears and shames of a daughter of the dust; here love springs up struggling toward immortal life. Herein lies an imperfection which yet is noble

---

* **Chitra by Rabindranath Tagore, Macmillan & Co. Limited, London, Bombay, Calcutta. 2s. 6d net.**

and grand. If the flower-service is finished, my master, accept this as your servant for the days to come!

"I am Chitra, the king's daughter. Perhaps you will remember the day when a woman came to you in the temple of Shiva, her body loaded with ornaments and finery. That shameless woman came to court you as though she were a man. You rejected her: you did well. My lord, I am that woman. She was my disguise. Then by the boon of gods I obtained for a year the most radiant form that a mortal ever wore and wearied my hero's heart with the burden of that deceit. Most surely I am not that woman.

I am Chitra. No goddess to be worshipped; nor yet the object of common pity to be brushed aside like a moth with indifference. If you deign to keep me by your side in the path of danger and daring, if you allow me to share the great duties of your life, then you will know my true self. If your babe whom I am nourishing in my womb, be born a son, I shall myself teach him to be a second Arjuna, and send him to you when the time comes, and then at last you will truly know me; To-day I can only offer you Chitra, the daughter of a king."

আষাঢ়, ১৩২১

কবিতার আদর

আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানীর সভাপতি জর্জ ব্রেট বলিয়াছেন যে বর্তমান সময়ে সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্যে কবিতারই বিক্রী বেশী। উপন্যাসের কাটতি খুব ছিল; কিন্তু এখন যে-কোন উপন্যাস বায়োস্কোপে দেখান যায়। কবিতা ত বায়োস্কোপে দেখাবার জিনিষ নয়।

ব্রেট বলেন, যাঁহার খাঁটি কবিপ্রতিভা আছে, তাঁহার এখন যত শ্রোতা

জুটিবে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও তত বেশী শ্রোতা কোন সাহিত্যিকের জুটে নাই। অন্যান্য গ্রন্থকারের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম করিয়া বলেন "যে-সব উপন্যাসের কাট্‌তি খুব বেশী, ইঁহার কাব্যগ্রন্থের বিক্রয় তার চেয়েও বেশী। তাঁহার "Gardener"-এর বিক্রী আমেরিকাতেই এক লক্ষের উপর হইয়াছে। লোস এঞ্জেলীস সহরের একজন পুস্তক বিক্রেতাই ঐ বহি ৫০০ খানা বিক্রী করিয়াছে। টেনিসনের খ্যাতি প্রতিপত্তি যখন চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল, তখন তাঁহার এক একখানি নূতন কাব্যগ্রন্থ বাহির হইবামাত্র ইউরোপ আমেরিকা উভয় মহাদেশে কথা-প্রসঙ্গের বিষয় হইয়া উঠিত। তাহার পর আর কাব্যগ্রন্থের বিক্রী কখনও বর্তমান সময়ের মত হয় নাই।" রবিবাবুর Gardener কয়েক মাস মাত্র বাহির হইয়াছে।

আমাদের দেশে সর্বসাধারণের পাঠ্য নানাবিধ পুস্তকের মধ্যে কাব্য গ্রন্থের বিক্রীই সর্বাপেক্ষা কম।

শ্রাবণ, ১৩২১

ইংরাজী গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি আট লক্ষের উপর বিক্রী হইয়াছে। ইহা ছোট গল্প নয়, উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কতকগুলি ভগবদ্বিষয়ক কবিতার গদ্যানুবাদ। ইহার এত বিক্রী দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা সকলেই বিষয়সুখে মত্ত বা বিষয়সুখের জন্য লালায়িত নহে। অনেকের ধর্মপিপাসা আছে, এবং ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দ তাঁহারা বুঝেন।

বাংগালা গীতাঞ্জলি আনুমানিক চারি হাজার বিক্রী হইয়াছে।

ভাদ্র, ১৩২১

লেখিকার আদর

দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কন্যা কিছু মর্মকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; আন্তরিক প্রেরণায় লিখিয়াছিলেন, প্রকাশ করিবার জন্য নহে।...

রবিবাবু তাহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিকারও অনুবাদ রচনাগুলির ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে ছাপা হইবে।

আশ্বিন, ১৩২১

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। সভাস্থলে বঙ্গের প্রধান প্রধান মনীষীদিগের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন, তাহার একটি প্রতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিতেছি। উহাতে যে কেবল কবির নিজ হৃদয়ের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে; যিনি ত্রিবেদী মহাশয়কে জানেন, তিনিই কবির কথায় সায় দিবেন···

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিযাছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বযসে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদযের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্যপরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ! ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র, ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্বিন, ১৩২১

জাতিতে জাতিতে মৈত্রীসাধক রবীন্দ্রনাথ

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় আডিলেড্ সহর হইতে কুমারী কন্‌ষ্টান্স র‍্যাডক্লিফ মান্দ্রাজ টাইমসে একখানি পত্র লিখিয়া এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ ভারতবাসিদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করে বলিয়া তাহাদের যে নিন্দা হইতেছে, তাহা অন্যায় নহে ; কিন্তু তাহারা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে অষ্ট্রেলিয়ার বাহিরের জাতিরা এক মহা ভ্রাতৃসংঘের অঙ্গ। তাহাদিগকে তাহারা নিজেদের সভ্যতার শত্রু বলিয়া সন্দেহ ও ভয় করে। তাহাদের মনের এই ভাব হঠাৎ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া বাহিরের জাতিদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জায়গায় সত্য ও পূর্ণ জ্ঞান জন্মিতে সময় লাগিবে। এইরূপে অন্য জাতিদের প্রতি সদ্ভাব জন্মিবার দিকে একটা গতি লক্ষিত হইতেছে ; তাহার অন্যতম কারণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী। সুন্দর ও শান্ত ধীর ভাবে তাঁহার গান ও প্রবন্ধগুলি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার বিনষ্ট করিয়া ভারতের জীবন ও চিন্তার মর্মের মধ্যে মানুষকে প্রবেশ করিতে সমর্থ করিতেছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর এই গুণ লক্ষিত হইয়াছে।

মাঘ, ১৩২২

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ

...শান্তিনিকেতনের বালক ও অধ্যাপকগণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিক্ষা অনুসারে এই মাঘ মাসে "ফাল্গুনী"র অভিনয় করিবেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করিবেন। দর্শক ও শ্রোতাদের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবে।

ফাল্গুন, ১৩২২

নিরন্নের সাহায্যার্থ অভিনয়

বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে দুই দিন তাঁহার 'বৈরাগ্য সাধন' ও 'ফাল্গুনী'র অভিনয় করিয়াছিলেন। দর্শকশ্রোতাদিগের নিকট টিকিট বিক্রয় করিয়া ৭৯৪৯ এবং নাট্য দুটির চুম্বক বিক্রয় করিয়া ২২২, মোট ৮১৭১ টাকা আয় হইয়াছে। এই সমস্ত টাকাই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দেওয়া হইবে। অভিনয় উপলক্ষে যে নগদ ১০৩০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সমস্তই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন। বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত বৌবাজার ষ্ট্রীটের এন্ এণ্ড এন্ ঘোষ বিনামূল্যে করিয়া দিয়াছিলেন, মিঃ জে এফ মদন বিনাভাড়ায় কিছু রঙ্গমঞ্চের সরঞ্জাম ধার দিয়াছিলেন, বেভান কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ বিনা পারিশ্রমিকে টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন, মিঃ আব্দুল খালেক কিছু সাজসজ্জা বিনা ভাড়ায় দিয়াছিলেন, ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ বিনা লাভে নাট্যদুটির বাংলা চুম্বক সমস্তটি এবং ইংরেজী চুম্বকের মলাটটি ছাপিয়া দিয়াছিলেন, জাপানী মালী মিঃ কাসাহারা রঙ্গমঞ্চ সাজাইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, ঈশ্বরীপ্রসাদ, অসিতকুমার হালদার, এবং 'বিচিত্রা'র আরও কোন কোন চিত্রকর দৃশ্যপটগুলি আঁকিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান মুকুলচন্দ্র দে চুম্বকটির মলাটের চিত্রটি আঁকিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই বাঁকুড়াবাসীদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যাঁহারা অভিনয় ও সঙ্গীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঋণ বাঁকুড়াবাসী কখনও শোধ করিতে পারিবে না।

যাঁহার যে প্রকার শক্তি সামর্থ্য আছে তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে জনহিত সাধনে প্রযুক্ত হইলেই তাহার সার্থকতা হয়।

'ফাল্গুনী'র অভিনয় প্রথমে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল। অতি চমৎকার হইয়াছিল। সাজসজ্জা রঙ্গমঞ্চের ঘটা ছিল না। কিন্তু নাটক হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে বিশ্বে চিরযৌবন ও চিরবসন্ত বিরাজিত, তাহার অভিনয় মুক্ত প্রান্তরে উদ্যানমধ্যস্থ তৃণাচ্ছাদিত নাট্যশালায় ক্রীড়াচঞ্চল বালক বৃন্দ ও তাহাদের অধ্যাপকদিগের দ্বারা হওয়ায় সকলই সংগত, সুশোভন সমঞ্জসীভূত বোধ হইয়াছিল। আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

কলিকাতার অভিনয়ে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্যরূপ বিশেষত্ব ছিল না বটে, কিন্তু অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল, এবং সাজসজ্জা, দৃশ্য, রং ও আলোকের চিত্রকলানুমোদিত আশ্চর্য সংযোগে মায়া পুরীর সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজসভা যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা শূদ্রকের রাজসভার মত মনে হইতেছিল। রাজবেশী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সুন্দর মানাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মত নানাবিষয়িকী শক্তি ও প্রতিভা অতি অল্পলোকেরই ভাগ্যে ঘটে। তাঁহার অন্যান্য শক্তির মত অভিনয়ের ক্ষমতাও অসাধারণ। তাঁহার যৌবনকালের অভিনয় কলিকাতার লোকে দেখিয়াছে, কিন্তু ইদানীং তাঁহার অভিনয় দেখিবার সুযোগ বোলপুর না গেলে ঘটিত না। এবার কলিকাতায় এই সুযোগ ঘটায় লোকে নির্মল আনন্দ লাভ করিল। তাঁহার অভিনয়, জগদানন্দ রায় প্রমুখ অধ্যাপকদিগের অভিনয় বালকদের অভিনয়, সকলকে মুগ্ধ করিল। নূতন যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথে" গত জন্মদিনে অবনীন্দ্রনাথের কলির ভগীরথের অভিনয় যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন যে তিনি কেবল চিত্রশিল্পী নহেন, নাট্যকলাতেও সুনিপুণ। 'বৈরাগ্যসাধনে' অবনীন্দ্রনাথ, শ্রুতিভূষণ সাজিয়াছিলেন। তাঁহার বেশ যেমন অভিনয়ও তেমনি চমৎকার হইয়াছিল।

'বৈরাগ্যসাধন' ও 'ফাল্গুনী' মুখ্যতঃ বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষা কল্পে অভিনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু যাঁহাদের অন্তরাত্মার অন্নগ্রহণের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা ইহা হইতে অন্যবিধ অন্ন আহরণ করিতে পারিবেন। এই অন্ন ব্যতিরেকে মানুষ ও জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এই অন্ন যাঁহারা আত্মস্থ করিতে পারেন, তাঁহারা বিশ্বে কেবল যৌবন, কেবল বসন্তের লীলা দেখেন। যৌবন ও বসন্ত কখন নিজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়, কখন বার্ধক্য ও

শীতের ছদ্মবেশে লুকায়িত থাকে। ঘুরিয়া ফিরিয়া জগতে যৌবন ও বসন্তের লীলা চলিতেছে। বার্ধক্যের জড়তা ও অবসাদের এবং প্রাচীন দেশ ও প্রাচীন জাতির কল্পিত শক্তিহীনতার ঔষধ 'ফাল্গুনী'তে রহিয়াছে। তিনিই ইহার অভিনয় ঠিক দেখিয়াছেন যিনি আপনাকে এবং আপনার দেশ ও জাতিকে চিরনবীন জানিয়া বীতভয়, বীতশোক ও শক্তিশালী হইয়াছেন।

আষাঢ়, ১৩২৩

রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা

রেঙ্গুন হইতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন :—

"জাপান যাইবার পথে কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে দুইদিন অবস্থান করেন। ব্রহ্মদেশবাসীরা ও ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতসন্তানগণ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে এদেশে সম্বর্ধনা করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। তাসামারু নামক জাপানী ষ্টীমার কবি রবীন্দ্রনাথ, মিষ্টার এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন এবং শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে প্রভৃতিকে লইয়া বন্দরে পেঁাছিবার বহু পূর্বেই নদীতীরে বিপুল লোক সমাগম হয়। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ জাহাজঘাটে সমবেত হইয়া ষ্টীমার আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বঙ্গের গৌরব রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই অভ্যর্থনা কমিটির সভ্যগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলী দলবদ্ধ হইয়া কয়েকখানি মোটর গাড়ীর সহিত মিছিল করিয়া দুই মাইল দূরবর্তী নির্দিষ্ট বাসস্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যান। পথে বর্মিজ, মান্দ্রাজী, মারাঠী, পার্শী বাঙ্গালী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক "বন্দেমাতরম্," "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী জয়" শব্দে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে স্থানীয় জুবিলি হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। প্রায় চারি সহস্র লোক এই অভ্যর্থনাসভায় যোগদান করিয়াছিল। জুবিলি হলে এরূপ জনতা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। বণিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী, দানবীর আবদুল করিম জামাল, সি, আই, ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ইউ বা থিন নগরবাসী-গণের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় একটি অভিনন্দন পাঠ করেন এবং কবিবর

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আর একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। অভিনন্দনপত্র দুইখানি ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীর কারুকার্য শোভিত দুইটি স্বতন্ত্র রজত আধারে কবিবরকে প্রদান করা হয়। এই সময় সম্বর্ধনা কমিটির কয়েকজন সভ্যের সহিত তাঁহার একটি ফটোগ্রাফ তোলা হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট অনেক পত্র ও টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশের ছোটলাট সার হারকোর্ট বাটলার সাহেব মফস্বল হইতে লিখিয়াছেন, "এই সুরম্য ব্রহ্মদেশে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে রেঙ্গুন সহরে আমার অনুপস্থিতির জন্য আমি আমার আবাসে আপনার আতিথ্য-সম্বর্ধনা করিতে পারিলাম না।"

ভাদ্র, ১৩২৩

জাপানে রবীন্দ্রনাথ

জাপানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব আদর অভ্যর্থনা হইয়াছে। জাপানী কোন কোন কাগজে দেখা যাইতেছে যে জাপানীরা তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়াছে। দি হেরাল্ড অব এশিয়া অর্থাৎ এশিয়া-দূত নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার একটি বক্তৃতার উপদেশ জাপানীদের মনে গভীর ও স্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে, ভাব ও চিন্তারাজ্যে, ভারতবর্ষের নিকট জাপানের ঋণ অনেক জাপানী কাগজে স্বীকৃত হইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "ভারতবর্ষের ঋণ আমাদের শোধ করা অবশ্য কর্তব্য।"

জাপানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র পরিচালকেরা রবীন্দ্রনাথকে ভোজ দিয়াছিলেন।

উয়েনো উদ্যানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট ওকুমা প্রভৃতি দুইশতাধিক প্রধান প্রধান লোক রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা করেন। অভিনন্দনপত্রের উত্তরে কবি বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেন। এই বাংলা বক্তৃতা অধ্যাপক কিমুরা

জাপানীতে অনুবাদ করিয়া জাপানী শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। কিমুরা অনেক দিন কলিকাতায় থাকিয়া বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। *

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

রবীন্দ্রনাথ কানাডার মাটি মাড়াইবেন না

জাপানে কিছুকাল থাকিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে গিয়াছেন। কানাডার টরোণ্টো শহরের ডেলী ষ্টার কাগজে মিষ্টার ভি, জেমীসন লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে কানাডার ভ্যাংকুভার শহরে নামিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, কানাডায় অবতরণ করেন নাই। তিনি ঐ দেশে ইহা প্রকাশ করিয়া সকলকে জানাইতে বলিয়াছেন যে যতদিন তাঁহার স্বদেশবাসীকে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় নির্যাতন করা হইবে ততদিন তিনি তাহাদের মাটি মাড়াইবেন না ; ঐ সব জাতির মনের গতি না ফিরিলে তাহারা ভারতবাসীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন না।

পৌষ, ১৩২৩

প্রিয়নাথ সেন

খ্যাতিমান সাহিত্যরসিক ও সমালোচক প্রিয়নাথ সেন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যোগ্য পুত্র মন্মথনাথ সেনের অকালমৃত্যুর শোক পাইয়াছিলেন, নিজেও বৃদ্ধ পিতাকে কাঁদাইয়া গেলেন। তিনি বাংলা, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এই সকল ভাষায় বিস্তর পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "সুবর্ণ বণিক-সমাচার" পাঠে অবগত হইলাম, তিনি—

"কলিকাতা আহিরীটোলা নিবাসী স্বনামধন্য মথুরমোহন সেনের বংশধর··· তিনি বাণীপূজার একজন নির্বাক সাধক ছিলেন। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে সঞ্চিত

* বিবিধ প্রসঙ্গের 'ওকুমার [illegible] বক্তৃতা'—এই আলোচনায় আছে—"রবীন্দ্রনাথের বাংলা বক্তৃতাকে [illegible] প্রধান মন্ত্রী ওকুমা ইং[illegible]জি মনে করিয়াছিলেন।"
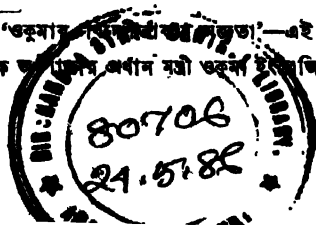
তাঁহার পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সযত্নে সংগৃহীত আছে। মৃত্যুর পূর্ব দিবসেও তিনি ত্রিশটাকার পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ পাঠ করেন"।

প্রথমে "প্রবাসী"তে মুদ্রিত এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতিতে" প্রিয়নাথ সেন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"এই সন্ধ্যাসংগীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসংগীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সংগে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষায় সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সংগে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারা আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।"

সাহিত্যরসিকের ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ এখন সুদূরে। দেশে থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে সেন মহাশয় সম্বন্ধে আরও কত কথা জানিতে পারা যাইত। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সম্ভবতঃ বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন।

প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ দরিদ্র হইল।

চৈত্র, ১৩২৩

বিতর্কভীত না আর কিছু ?

এইরূপ কথা হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস, নেপালে বঙ্গনারী প্রভৃতির লেখিকা, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা সরকার মহাশয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িবেন। কিন্তু ইন্‌স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ প্রবন্ধ পাঠ করিবার অনুমতি দেন নাই; কারণ শুনিতেছি নাকি এই যে রবিবাবুর কাব্যসমূহ একটা তর্কবিতর্কের বিষয় (Controversial topic)। ইহা সত্য কি না, তাঁহারা সর্বসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়। যে কারণে যুদ্ধের সময় আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কোন প্রকার তর্কবিতর্ক উত্থাপন করিতে বারবার নিষেধ করিতেছেন, ইন্‌স্টিটিউটের কর্তারা কি সেই কারণে তর্কভীত হইয়াছেন ? তাহা ত বোধ হয় না। বিলাতের গবর্ণমেণ্ট খুব বেশী পরিমাণে, এবং আমাদের এখানকার গবর্ণমেণ্ট কতক পরিমাণে যুদ্ধ লইয়া ব্যতিব্যস্ত আছেন। কিন্তু ইন্‌স্টিটিউটের কর্তারা ত কোন যুদ্ধ করিতেছেন না।

আমরা শুনিলাম ইন্‌স্টিটিউটের কার্যনির্বাহ সভার যে অধিবেশনে এই বিষয়টির মীমাংসা হয়, তাহাতে অন্যান্য সভ্যের মধ্যে সার্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিঃ লায়ন, এবং মিঃ হর্নেল উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ লায়ন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। বাঙালী নাইট দুজন ও মিঃ হর্নেল প্রবন্ধ পাঠের বিরুদ্ধে মত দেন। বিরোধী দলেরই জয় হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ কোন সভ্য ভয়ে বিরুদ্ধ পক্ষে ভোট দিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। আশুবাবু কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া আপত্তি করেন, এবং হর্নেল তাহার সমর্থন করেন। আশুবাবু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন তখন রবিবাবুকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দেওয়া হয়। এখন তাঁহার আপত্তিটার কারণ জানিতে ইচ্ছা হয়।

ইন্‌স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ইন্‌স্টিটিউটে সাধারণতঃ যে-সকল বক্তৃতা হয়, তাহা কি সর্ববাদিসম্মত ? দুই আর দুয়ে চার, বক্তৃতাগুলিতে কেবল এই-প্রকারের তর্কাতীত সত্যই কি

থাকে ? ইন্‌স্টিটিউটে আর কোন বাঙালী কবি সম্বন্ধে বক্তৃতা কি কখন হয় নাই ? আমাদের মনে পড়িতেছে যে হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে, তাঁহাদের কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধে কি দ্বিমত নাই ? ইন্‌স্টিটিউটের কোন কোন বক্তৃতায় রবিবাবুর রচনার প্রতিকূল সমালোচনা কি হয় নাই ? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই-সকল সমালোচনা কি তর্কাতীত ছিল ? তৎসমুদয় কি বিতর্কের বিষয় নহে ? শ্রীমতী হেমলতা সরকারের প্রবন্ধ পঠিত হইবে কি না, তাহা বিচার করিবার সময় তাহা কি ইন্‌স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ছিল ? আমরা যতটা জানি ছিল না। কিন্তু প্রবন্ধটিতে হয় (১) প্রতিকূল সমালোচনা, নয়, (২) অনুকূল ব্যাখ্যা পরিচয় ও প্রশংসা, কিম্বা, (৩) প্রতিকূল ও অনুকূল মন্তব্য উভয়ই ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই (১) একজন লেখক রবিবাবুর বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাহা বিতর্কের বিষয় বিবেচিত হয় না, অন্য আর একজন তদ্রূপ মন্তব্য করিলে তাহা কেন তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে ? (২) অনুকূল মন্তব্য কেন তর্কের কারণ হইবে ? রবিবাবুর নিন্দাটাই বুঝি তবে তর্কাতীত ও সর্ববাদিসম্মত ! (৩) প্রতিকূল ও অনুকূল মন্তব্যের সমাবেশ হইলেই বা কোন প্রবন্ধ কেন বিশেষ করিয়া তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে ?

জগতের সমুদয় সভ্যদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষিত সমাজে রবিবাবুর কাব্যের খুব আদর। পাঞ্জাবের শ্রীযুক্ত লালা লজপৎ রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক। তিনি আর্য-সমাজী। তিনি বাঙালীর, ব্রাহ্ম সমাজের, বা রবিবাবুর গোঁড়া ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। তিনি এখন আমেরিকায় আছেন। তিনি তাঁহার একখানি নবপ্রকাশিত পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

'Tagorism is becoming a cult and he is at the present moment perhaps the most popular and most widely read and most widely admired literary man in the world.'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত-ও-ভাবের অনুবর্তিতা একটি ধর্মমতের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি বর্তমান সময়ে বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়, সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের দ্বারা অধীত, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের দ্বারা প্রশংসিত সাহিত্যিক।'

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের গৌরব, ভারতের গৌরব। বাংলাদেশের কতকগুলি

লোক বহুকাল হইতে তাঁহার নিন্দা ও শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটেও এই-সব লোকের প্রভুত্ব থাকা দেশের পক্ষে অকল্যাণের কারণ। এই সমিতি ও প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত, স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ইহার নাম ছিল, Institute for the Higher Training of Young Men. 'যুবকদের উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।' গুণের আদর করিতে না শিখিলে, যিনি শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে না শিখিলে, উচ্চতর কেন, কোন শিক্ষাই হয় না, সব তথাকথিত শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ইন্‌স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষেরা এই ক্ষেত্রে কি আপনাদের দৃষ্টান্তদ্বারা যুবকদিগকে বর্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিকে সম্মান করিতে শিখাইলেন? রবীন্দ্রনাথের নিন্দায় তাঁহার নিজের কিছু আসে যায় না। ক্ষতি দেশের।

তাঁহার নিন্দা ও শত্রুতা কতকগুলি লোকে কেন করে, তাহা আমরা ঠিক্ বুঝিতে পারি না। সমকক্ষ লোকদের মধ্যে কখন কখন একটা ঈর্ষা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ সাহিত্যিক তাঁহার নিন্দুকদের মধ্যে কেহ নাই। কেহ তাঁহার কাছাকাছিও যান না। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, এবং তজ্জন্য প্রতিকূল সমালোচনাও হইতে পারে। এইরূপ সাহিত্যিক সমালোচনায় বিষ থাকিবার কথা নয়। কিন্তু বঙ্গে তাঁহার বিরোধীরা সাহিত্যিক সমালোচনায় আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখেন না, তাহাতে অন্যবিধ বিষ ঢালেন। এই বিষ উদ্গারের কারণ কি? কারণ আর যাহাই হউক, পরশ্রীকাতরতা বা ক্ষুদ্রাশয়তা অন্যতম কারণ না হইলেই সুখের বিষয় হইবে। কারণ, পরশ্রীকাতরতা ও নীচাশয়তা জাতিকে অত্যন্ত ছোট, নীচ ও দুর্বল করে। দেশ—মধ্যে এইসকল দোষের বিস্তৃতি হইলে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হইবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

আসল পণ্ডিত ও নকল পণ্ডিত
অথবা সূর্য ও বাতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছেন :—

"জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী, আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার মাটি বাংলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ এখন—স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি, হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেই মতের এই ক্ষেত্রে বাংগালী জাতির এই মহাসভার সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।"

চিত্তরঞ্জনবাবু স্বীকার করিতেছেন যে তিনি রবিবাবুর "সমস্ত বক্তৃতাটি" পড়েন নাই, সুতরাং "হয়ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা" করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি প্রতিবাদ করাটা চাই! এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়? যখন প্রতিবাদ করিলেনই তখন Modern Review-এ প্রকাশিত রবি-বাবুর যে যে বাক্যের প্রতিবাদ করিতেছেন, অন্ততঃ সেইগুলি উদ্ধৃত করা উচিত ছিল; তাহা হইলে লোকে বুঝিতে পারিত যে রবি-বাবু ঠিক কি বলিয়াছেন, এবং চিত্তরঞ্জনবাবু তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন কিনা, ও প্রতিবাদ সারবান্ হইয়াছে কি না। তাহা তিনি করেন নাই। রবিবাবুর বা অপর কোন লোকেরই মত অবিচারিতভাবে গ্রহণীয় নহে; তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আলোচনা করিতে হইলে কোন্ মতের আলোচনা

হইতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হওয়া উচিত। বক্তা রবি-বাবুর একটি কথাও উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু নানা রকমের ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা— (১) রবিবাবু নকল পণ্ডিত, ইউরোপের মত ধার করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন ; (২) রবিবাবু বালি, এবং সূর্য আর কেহ ; (৩) রবিবাবু আগে স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন, এখন স্যার উপাধি পাইয়া উপাধিদাতা গবর্ণমেণ্টের সন্তোষসাধনার্থ স্বদেশদ্রোহী হইয়াছেন ; ইত্যাদি।

রবিবাবু কোন্ কোন্ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কি কি মত ধার করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া তাহার পাশে রবিবাবুর উক্তিগুলি সাজাইয়া দেখাইলে আমরা চিত্তরঞ্জনবাবুর সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি কোন প্রকার ধরাছোঁয়া দেন নাই ;—বুদ্ধিজীবী মানুষের এই ত বাহাদুরী। রবিবাবু যে বালি, চিত্তরঞ্জনবাবু তাহা বলিয়া তাঁহাকে একেবারে মাটি (বালি নয়) করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু সূর্য যে কে, তাহা না বলায়, বাস্তবিক রবিবাবু তাঁহার নিকট হইতে আলোক ও তাপ সংগ্রহ করিয়াছেন কি না, তাহার বিচার করা গেল না। ইহা আর এক বাহাদুরী। স্বদেশপ্রেমিক রবিবাবু ভাবক স্বদেশদ্রোহী স্যার রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন, ইহা অতি হাস্যকর মিথ্যা কথা। চিত্তরঞ্জনবাবু মডার্ন্ রিভিউ পড়েন দেখিতেছি। সেই মডার্ন্ রিভিউ-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা পড়িলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, রবীন্দ্রনাথের অধোগতি হইয়াছে কি না।

"Apparently he cares precious little for his title of English Knighthood and the degree of doctorate. Indeed, he seems to regard them with half amusement." P. 218

"When I helped him into the Pullman car at the station that night I thought of him as a personification of the Vedic spirit of Hindusthan. No sentiment seems to command his life so completely as loyalty to Indian ideals. This loyalty is no mere academic formula, no pose, but a reality. It is with him something vivid, tangible it is something alive, practical, fit

to live and work for. "I shall be born in India again and again," remarked Tagore with a smile of pride lighting up his face, "with all her poverty misery and wretchedness I love India best." P. 220.

যে প্রবন্ধটি হইতে এই বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইল, তাহা আমেরিকা হইতে তথাকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু, এম্-এ, পি-এইচ-ডি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অযথা প্রশংসা বা অযথা নিন্দা করিয়াছিলেন কিনা তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি না ছাপিলে তাহা বুঝাইবার জো নাই। কিন্তু সামান্য একটু আভাস দিতেছি। গত বৎসর ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবাবু পোর্টল্যাণ্ড শহরে "The Cult of Nationalism" নামক অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটি ইংরেজ স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁহার আত্মীয়েরা ভারতবর্ষে বিষয়কর্ম করেন। স্ত্রীলোকটি ঐ শহরের The Portland Oregonian নামক কাগজে একখানি চিঠি লেখেন; তাহাতে বলেন—"It was unfortunate that he (the poet) gave such an impression of inefficient rule in India."

রবিবাবু সম্ভবতঃ নকল পণ্ডিত ও বাগ্মি তবে ঠিক কিছু বলা যায় না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনবাবু যে নিশ্চয়ই আসল পণ্ডিত এবং একটা সাহিত্যিক দার্শনিক রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক সৌরজগতের কেন্দ্রস্থিত সূর্য কাহার সাধ্য তাহা অস্বীকার করে? এই দেখুন না, নকল পণ্ডিত রবিবাবু ও আসল পণ্ডিত চিত্তরঞ্জন দাশের কথায় কত সাদৃশ্য রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন-বাবুর সমস্ত কথা তাঁহার আলোচ্য অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত। রবিবাবুর কোন্ কথা কোথা হইতে গৃহীত তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়।

রবীন্দ্রনাথ। ইহা নিশ্চয় জানা চাই প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অংগ। বিশ্বমানবকে দান করিবার সহায়তা করিবার কি সামগ্রী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (স্বদেশী সমাজ)

চি। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা…এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে হয়ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না।

র। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এই উৎপাতে আমাদের কি আশ্চর্য শক্তি ছিল তাহা চোখে পড়িল। (স্বদেশী সমাজ)

চি। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে তাহাই জাগিয়া উঠে।

র। বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে. সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ তাহা আদর্শ-ই নহে। (সমাজভেদ)

চি। পল্লীসমাজ বাঙালীর সভ্যতাসাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, পুষ্করিণী নূতন খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া মিলিয়া ছোটখাট ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

র। সমস্ত দেশ যে-শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে…সে গ্রাম্যসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থা বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।…গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর, গ্রাম-বাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর এবং যাহাতে নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য

সম্পন্ন করে সেই রূপ বিধি উদ্ভাবিত কর।······নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয় ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাংক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে।

(পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণ)

চি। আমাদের এখন বিলাতী আদর্শজনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সরল করিতে হইবে।

র। প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন···দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্রের অবধি নাই। (বিলাসের ফাঁস—সমাজ)

চি। সে কালে···পল্লীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল···এখন সেই আনন্দ কই, সে উৎসব কই।

র। যে দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। (বিলাসের ফাঁস)

চি। আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন তাহা এই মিল ফ্যাক্টরীতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

র। সহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। (পাবনা সম্মিলনীর অভিভাষণ)

চি। আমাদের দেশে রাজার কর্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবনযাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।

রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদ্বারা আবদ্ধ।···জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকেরই উপর আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

(স্বদেশী সমাজ)

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে রবিবাবু ত এসব কথা অনেক আগে বলিয়া গিয়াছেন; আর, চিত্তরঞ্জনবাবু গত মাসে বলিয়াছেন। সুতরাং

নকল পণ্ডিত রবিবাবু আসল পণ্ডিত চিত্তরঞ্জনবাবুর নিকট ঋণী হইলেন কি প্রকারে? অথবা সূর্যরূপী চিত্তরঞ্জন বালিরূপী রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আলোক সংগ্রহ কেমন করিয়া করিলেন? যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা অধুনা আবিষ্কৃত নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানেন না। সম্প্রতি প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, নকলটা আগে হয়, তাহার পর আসলটা আসে; অর্থাৎ ভবিষ্যতে আসল পণ্ডিত কি বলিবেন, নকল পণ্ডিতেরা তাহা অনুমান করিয়া কয়েক বৎসর পূর্বেই তাহা বলিয়া ফেলেন। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, যে, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি, আরব দেশের মরুভূমি, রাজপুতানার মরুভূমি, প্রভৃতির বালুকা আগে নিশীথ কালে দীপ্তিমান ও উত্তপ্ত হয়, পরে সূর্য প্রাতে ও মধ্যাহ্নে সেইসব বালুকণা হইতে আলোক ও উত্তাপ সংগ্রহ করেন। আরো প্রমাণ হইয়াছে যে প্রতিধ্বনি বহু বৎসর পূর্বে বায়ুরাশিকে তরঙ্গায়িত করিতে থাকে, তাহার পর ধ্বনি মানুষের কর্ণগোচর হয়। এই হেতু, রবিবাবু যে "কণিকা"য় লিখিয়াছেন

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে!"

ইহা অতি ভ্রান্ত কথা। রবিবাবু কবি মানুষ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া-সমূহের কোনই খবর রাখেন না; তাই এত বড় একটা ভুল করিয়াছেন।

কেবল যে রবিবাবুই চিত্তরঞ্জন বাবুর নিকট ঋণী তাহা নয়; একখানা সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত তাঁহার অভিভাষণের ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় বিবৃত পল্লী-সমাজে ও জেলাসমাজের অনুরূপ, পল্লীগ্রাম অঞ্চলের কার্যনির্বাহের প্রণালী লিখিত রহিয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে সরকারী জেলা-শাসনকার্য-নির্বাহ কমিটি (Bengal District Administration Committee) নিযুক্ত হয়, লেভিঞ্জ সাহেব তাহার সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট ১৯১৪ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার সপ্তম অধ্যায়টি পড়িলে মনে হয়, যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যাহা বলিবেন, মিঃ লেভিঞ্জ ও তাঁহার সহযোগিগণ ১৯১৪ সালে তাহা অনুমান দ্বারা বা অন্য উপায়ে জানিতে পারিয়া তদ্বিধ একটি কার্যপ্রণালী বিবৃত করিয়া থাকিবেন। আসল পণ্ডিতের মত এই প্রকারে নকল পণ্ডিতেরা বহুপূর্বে নিজেদের বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশ্য সরকারী রিপোর্টে পল্লীসমাজ-আদি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত

হওয়া এবং গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানের অধীন করা দরকার বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে; চিত্তরঞ্জনবাবুর ব্যবস্থা বেসরকারী রকমের। এই অধ্যায়টি প্রবাসীতে উদ্ধৃত করিলে ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী হইত। এতখানি জায়গা দেওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া ইহা উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রাবণ, ১৩২৪

বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তির সহযোগিতায় "বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ" প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় দিয়াছেন। তাঁহার বিভাগের কতকগুলি পুস্তক লিখিবার ভার ইতিমধ্যেই কেহ কেহ লইয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিভাগেও কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুস্তক লিখিবার ভার লইয়াছেন।

কাজটি যেমন কঠিন, আংশিকভাবে করিয়া তুলিতে পারিলেও বংগদেশের পক্ষে তেমনই হিতকর হইবে। এই জন্য উদ্যোগীরা যোগ্য ব্যক্তিগণের সাহায্য পাইবার আশা করেন। এখন কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য। কিন্তু 'শুভস্য শীঘ্রম' নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা কাগজ সস্তা হইবার অপেক্ষা না করিয়া সত্বর দু-একখানি বহি প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

ভাদ্র, ১৩২৪

রবিবাবু ও ষ্টেটস্‌ম্যান

ভারতবাসীদের বিরোধী ইংরেজী কাগজ এদেশে যতগুলা আছে, তাহার মধ্যে ষ্টেটস্‌ম্যান একখানা প্রধান কাগজ। এই কাগজটাতে লেখা হইয়াছে :—

Sir Rabindranath Tagore has received much generous admiration from the English people in India and at Home. In the *Atlantic* monthly he reciprocates this kindness by an article on "Nationalism in the West" in the course of which he

writes as follows :—"This abstract being, the nation, is ruling India. We have seen in our country some brand of tinned food advertised as entirely made and packed without being touched by hand. This description applies to the governing of India, which is as little touched by the human hand as possible. The governors need not know our language, need not come out into personal touch with us except as officials ; they can aid or hinder our aspirations from a disdainful distance, they can lead us on a certain path of policy and then pull us back again with the manipulation of office red tape ; the newspapers of England in whose columns the London Street accidents are recorded with some decency of pathos, need take but the scantiest notice of calamities happening in India over areas of land sometimes larger than the British Isles." Statements of this kind published for a constituency which has no means of judging their merits, make one wonder why Sir Rabindranath Tagore accepted a knight hood from a Government of which he thinks so poorly.

ষ্টেটসম্যানের তাহা হইলে কি ইহাই বলা অভিপ্রায় যে মানুষ যাহাতে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য কথা না বলে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উপাধিরূপ ঘুষ দিয়া থাকেন ? অনেক ইংরেজ যে রবিবাবুর বহিগুলির আদর করিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি যেন ভবিষ্যতে ইংরেজ "নেশন" বা গভর্ণমেণ্টের সত্য দোষত্রুটি না দেখান ?

নিখুঁত কোন জাতি বা গবর্ণমেণ্ট নাই। এরূপ পাগল বা ভণ্ড কি কেহ আছে যে বলিবে যে বৃটিশ জাতির বা গভর্ণমেণ্টের কোন দোষ নাই ? ষ্টেটসম্যানেও ত গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা বাহির হয় ? রবিবাবুও কি বৃটিশজাতির বা গভর্ণমেণ্টের কেবল নিন্দাই করিয়াছেন ? তাহা ত নয়। আমরাও তাঁহার এই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।

রবিবাবু ত উপাধি পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেন নাই।

স্টেটসম্যান যদি তাঁহার উপাধিটা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রত্যাহার করাইতে পারেন, তাহা হইলে কাহারও কোন দুঃখ হইবে না।

কার্তিক, ১৩২৪

দলাদলির মিটমাট

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে কংগ্রেসঘটিত দলাদলির একটা মিটমাট হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট বিধিসঙ্গতভাবে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ কতৃর্ক আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।...

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব

এই দলাদলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ যাঁহাকে বাস্তবিক সম্মানার্হ করিয়াছেন, তিনি লোকের কাছে সম্মান পাইতেছেন কি না, সে চিন্তা কেন মনে স্থান দিবেন ? নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে তাঁহার বিরোধীরাও বুঝিতে পারিবেন যে তিনি বরাবর কর্তব্যবুদ্ধি ও সদুদ্দেশ্য-প্রণো ত হইয়া অনাসক্ত ভাবে কাজ করিয়াছেন। সভাপতিত্বটাকে মরণ কামড় দিয়া ধরিয়া থাকিবার লোক তিনি নহেন। বাংলাদেশের এবং বঙ্গের বাহিরের অনেক কাগজে তাঁহার মহাশয়তা স্বীকৃত হইতেছে।

যাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের দলের সভাপতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান প্রধান সকল লোকেরই ব্যবহারের প্রশংসা করিতে পারিলে সুখী হইতাম। যাহাতে তাঁহার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন; ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু অনেকে তাঁহাকে নির্বাচন করার পর হইতেই, তাঁহাকে বিসর্জন দিয়া দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অশোভন ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পদত্যাগ পত্রে লিখিত আছে "আমার এই পদত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনারা আমাকে অনুগ্রহপূর্বক

নিষ্কৃতি দিবেন।" এখন তিনি নানা প্রকারেই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন ; তন্মধ্যে একটা প্রধান নিষ্কৃতি, এমন কোন কোন কৌশলী লোকের সাহচর্য যাহারা তাঁহাকে ভালবাসেন না এবং বর্তমানক্ষেত্রে কেবল তাঁহার দ্বারা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক কখন কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না ; কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার দ্বারা রাজনীতিক্ষেত্রে খুব বড় কাজ হয় নাই, একথা বলা যায় না। তাঁহার অভিভাষণ ও অন্যবিধ গদ্য প্রবন্ধে, কবিতায় ও গানে দেশ উদ্বোধিত হইয়াছে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী,' 'কণ্ঠরোধ,' 'অত্যুক্তি,' 'পথ ও পাথেয়,' 'স্বদেশীসমাজ,' প্রভৃতি প্রবন্ধ বাংলাসাহিত্যের পাঠকদিগের সুপরিচিত। তাঁহার সংগীত ও ললিতকলাবিষয়ক বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধে পর্যন্ত স্বদেশ-প্রীতি ও দেশের দুর্দশায় তাঁহার মর্মপীড়ার কথা এবং ইংরেজ আমলের ত্রুটির কথা আছে। আমেরিকায় পঠিত The Cult of Nationalism নামক বক্তৃতা এবং জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ভারতের জীবনাদর্শ জগতের গোচর করিয়াছে। তাঁহার জাতীয়-সংগীত সমূহের উল্লেখই যথেষ্ট, প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই। 'নৈবেদ্যে'র অনেক কবিতা, 'কথা'ও কাহিনী'র অনেক কবিতা, এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। সর্বশেষে এই সেদিন যখন বঙ্গের গবর্ণর টাউনহলে শ্রীমতী বেসাণ্টের স্বাধীনতা লোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুমজারী করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি "রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষানবীস" ('novice in politics') রবীন্দ্র-নাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরীতে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।

কার্তিক, ১৩২৪

রাজা রামমোহন রায়

২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন। এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ সভা হইয়া থাকে। ১১ই আশ্বিন কলিকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শেষে সভাপতি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুঃখের বিষয় এই সুন্দর বক্তৃতাটি কেহ লিখিয়া লন নাই। তত্ত্বকৌমুদীতে ও সঞ্জীবনীতে ইহার যেরূপ তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু আভাস পাইবেন।

"এদেশে যে কিরূপে রাজা রামমোহনের জন্ম হইল, তাহা বুঝা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই. তিনি সেই অবস্থার বহু উচ্চে অবস্থিত। অরুণচ্ছটা যেমন নিম্নভূমি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকা কালেও উন্নত পর্বত শিখরকে অনুরঞ্জিত করে, সেইরূপ স্বর্গীয় আলোক তাঁহার উন্নত আত্মাকে আলোকিত করিয়াছিল—বিশ্বমানবের মুক্তির বাণী তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল। মানবজীবনে যেমন একটা সময় আছে, যখন তাহাকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই বর্দ্ধিত হইতে হয়, বাহিরে গেলেই তার বিপদ, তেমনি মানবসমাজেও এরূপ শিশুকাল আছে। যে সকল সমাজ সেরূপভাবে রক্ষিত ও বর্ধিত হইয়াছে তাহারাই আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু শিশুকাল অতিক্রান্ত হইলে যেমন তাহাকে বাহিরে বিশ্বজগতের মধ্যে যাইতে হয়, তাহা না হইলে তাহার উন্নতি ও বিকাশ হইতে পারে না, তেমনি যে সমাজ চিরকাল আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে, বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তাহারও উন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠে। ভারতকে বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই রামমোহন আসিয়াছিলেন। শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্ব-মানবের জন্য মুক্তির বাণী লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র আদর্শ, সমগ্র দৃষ্টি, সমগ্র ভবিষ্যৎ আপনার মধ্যে ধরিয়াছেন। চারিদিকের অন্ধকার মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বলিতেছেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

"এই অন্ধকারের পরপারস্থিত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।" সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাতেই সুখ, ক্ষুদ্রে সুখ নাই। আমরা ক্ষুদ্র লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি না। ক্ষুদ্র দেশে আবদ্ধ থাকিলে হইবে না। দেশকে বিশ্বের অন্তর্গত করিয়া ভালবাসিতে হইবে। সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে।

রামমোহন যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন সে শস্য আমরা কর্তন করিব। আমরা অনেক সময় দুঃখ করি, আমাদের উপযুক্ত নেতা নাই। রামমোহনই আমাদের নেতা আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলি, তাঁহার বাণী শুনিয়া চলি। আমরা ক্ষুদ্রে ডুবিয়া থাকিতে পারি না। মহান্ ব্রহ্ম আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়দ্বারে অতিথি রূপে উপস্থিত। এই অতিথিকে স্থান দিতে হইবে। প্রত্যাখ্যান করিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। আমরা কেহ ছোট নই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যাহারা বড় তাহারাও চূর্ণ হইয়া গিযাছে, অহংকাবী বিধ্বস্ত হইয়া গিযাছে, আর যে ছোট সে বড হইষাছে। ইতিহাসে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ রহিযাছে। আমরাও ছোট নই, ছোট থাকিব না। সেই মহাবাণী শুনিযা চলি, সেই নেতার অধীন হইয়া চলি, আমরাও বড হইযা উঠিব, এ দেশ বড হইযা উঠিবে।" —তত্ত্বকৌমুদী।

"শিশু মাযের কোলে বাড়িতে থাকে। প্রত্যেক জাতি তেমনই আপন আপন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাড়িয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি ও পরিণতির প্রয়োজন আছে। এক সমযে পৃথিবীর সকল জাতি এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বাড়িযাছে। কিন্তু এই বৃদ্ধিই চরম বৃদ্ধি নহে। সকল জাতিকেই বিশ্বের মন্দিরে পূজার অর্ঘ জোগাইতে হইবে।

"আপনাবা শুনিযাছেন যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে রামমোহন জন্মলাভ করেন। ঐ বিপ্লবের যুগে যে বিশ্ববাণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা কেমন করিয়া শিশু রামমোহনের প্রাণ স্পর্শ করে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

"উষার অরুণরশ্মি যেমন উচ্চ শিখরগুলিকে আলোকমণ্ডিত করে, তেমনি সেই যুগে পৃথিবীর কতিপয় মহাত্মা বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিয়াছিলেন। শিখরে যখন প্রথম আলোকসম্পাত হয় তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে। বঙ্গভূমি যখন নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন বালক রামমোহন অলৌকিকরূপে বিশ্ববোধের আলোক লাভ করিযাছিলেন। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে দেশ অনুকূল ছিল না, বরং সমস্তই তাঁহার প্রতিকূলে ছিল। তিনি যেন দৈবশক্তি বলে এই জ্ঞানলাভ করিলেন।

"বঙ্গদেশের এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে

কেমন করিয়া বিশ্ববোধ লাভ করিলেন তাহা বিস্ময়কর। তিনিই এই দেশে তখন ভূমার বাণী ঘোষণা করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সেই অন্ধকারের পরপারের মহান্ পুরুষকে তিনি জানিয়াছিলেন। অন্ধকারের পরপার হইতে জ্যোতির্ময় পুরুষের আলোক আসিয়া এই শিখরের উপর পতিত হইয়াছিল।

"পৃথিবীর কোন জাতি এখন আপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিবে না। উহাতে যে হীন দেশাত্মবোধ জাগাইয়া থাকে তাহা হইতেই হানাহানি মারামারির সৃষ্টি হয়। এখন প্রত্যেক দেশকে আপন গৃহবাতায়ন খুলিয়া দিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ছোট হইয়া থাকায় সুখ নাই—ভূমাতেই সুখ।

"ভূমৈব সুখম্ নাল্পেসুখমস্তি"

"পৃথিবীর কোন জাতি হীনতার মধ্যে চিরকাল থাকিবে না। বাঙ্গালীর নিরাশার কারণ নাই। বাঙ্গালীর গৃহে রামমোহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা মহৎ তাঁহারা অগৌরবের মধ্যে গৌরবকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে প্রত্যক্ষ করেন। এখন পৃথিবীতে যে রণকোলাহল চলিতেছে ইহারই মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা জাতিসমূহের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃসংঘের ছবি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তখন জাতিতে জাতিতে কিরূপ মৈত্রী স্থাপিত হইবে তাহার আলোচনা চলিতেছে।

"বঙ্গের ভবিষ্যৎ গৌরব তখনকার গভীর অন্ধকারের মধ্যেই রামমোহন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালীকে বিশ্বের রাজপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর কোন নিরাশার কোন আশঙ্কার কারণ নাই, বাঙ্গালী বৃহৎ মনুষ্যত্বের পথে যাত্রা করিয়াছেন।"— (সঞ্জীবনী)

কার্তিক, ১৩২৪

রাজনারায়ণ বসু

এমন অনেক মানুষ পৃথিবীতে জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের কাজের চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁহাদের কাজ এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে তাঁহাদের

মহত্ত্বের ঠিক ধারণা হয় না। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই রকমের মানুষ ছিলেন। তাঁহার আত্মচরিত এবং তাঁহার রচিত নানা গ্রন্থ হইতে তাঁহাকে অনেকটা বুঝা যায় বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থাবলী হইতে লব্ধ এই ধারণা অপেক্ষা তাঁহাকে বড় বলিয়াই জানেন! তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়ে, ততই ভাল। এইজন্য আমাদের মনে হয়, তাঁহার বার্ষিক স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বক্তৃতা করেন, তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইলে ভাল হইত। তদভাবে আমাদিগকে সঞ্জীবনীতে প্রদত্ত চুম্বকেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা

রাজনারায়ণবাবুর গ্রন্থ ও জীবনী পড়িয়া তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহার কথা আমি বলিব না। শিশুকালে আমার বয়স যখন ৮ বছর তখন হইতে আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিতাম। তখনই তাঁহার পককেশ-গোঁফদাড়ি। তবু তিনি যেন শিশুভাবে আমাদের সহিত মিশিতেন।

জীবনের পরিণতি।

তিনি যে অতি বড় লোক তখন আমরা তাহা বুঝিতাম না। এখনকার মত তখন সংবাদপত্র, সভাসমিতি, সমালোচনা, প্রভৃতি ছিল না, সুতরাং মানুষ লোকচক্ষুর আড়ালে বাড়িতে পাইত। শকুনি যেমন শবদেহ লইয়া টানা-হেঁচড়া করে, এখন জীবিতদের লইয়া সংবাদপত্র সেইরূপ করে। রাজ-নারায়ণ বাবুর আমলে "সোমপ্রকাশ" প্রভৃতি কাগজ ছিল বটে, তবে ঐ-সকল কাগজ সংযত ছিল। অন্ততঃ এখন যেমন কাগজে সত্যমিথ্যায় জোড়াতাড়া দিয়া এক-একটি লোকের সম্বন্ধে লেখা হয় তখন তেমন হইত না। তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার সুযোগ ছিল। এইরূপভাবে রাজনারায়ণবাবু মহৎ হইয়াছিলেন বলিয়া লোকের মধ্যে তিনি তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই। এমন কি অমন মহৎ ব্যক্তির নামও হয়ত এইকালে অনেকে জানেন না।

পরিপূর্ণ জীবনের ছবি।

রাজনারায়ণবাবু দিবারাত্র কার্য করিতেন। ভাঙাগড়ার এক বিশেষ যুগে তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সকল-প্রকার দেশের কার্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। আমার পূর্বে যাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহাদের মুখে আপনারা শুনিয়াছেন যে, স্বদেশীমেলা এবং নানা প্রকার সভার সহিত তাঁহার যোগ ছিল; কিন্তু তবু তাঁহার মুখে কোন চাঞ্চল্য ছিল না।

জাপান যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি, অতি ভীষণ ঝটিকার মধ্যে জাপানী জাহাজের কর্ণধার আমার সহিত তখনকার বায়ুর গতির বেগ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এত বড় প্রবল ঝড় সাধারণতঃ হয় না। ঐ ঝড় সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন চিন্তা ছিল না তাহা নহে; কিন্তু সকল কার্যের ব্যবস্থা এমন কি জাহাজ জলমগ্ন হইলে যাত্রীরা যাহা পরিয়া জলে ঝাঁপ দিবে, তাহার আয়োজন হইয়াছিল; তবু তিনি আমার সহিত গল্প করিতেছিলেন।

রাজনারায়ণবাবু তখনকার সেই প্রবল ভাঙাগড়ার যুগে সকল কার্যের মধ্যে থাকিয়াও আমার মত বালকের সহিত মেলামেশা কর্তব্য মনে করিতেন। শিশুদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল।

ইহা যে তিনি কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে করিতেন তাহা নহে, ঐ কর্তব্য বুদ্ধির পশ্চাতে তাঁহার একটা পরিপূর্ণ জীবন রহিয়াছে। কর্তব্য বুদ্ধি অনেক সময়ে সংকীর্ণভাবে কার্য করিয়া থাকে। রাজনারায়ণবাবুর কর্তব্য বুদ্ধি তেমন সংকীর্ণ নহে। তিনি আমার পিতার সকল কার্যের সঙ্গী ছিলেন; আমার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, তিনি তাঁহার সুহৃদ ছিলেন। সকলের সহিত মিশিবার জন্য যেমন সরসতার দরকার তাহা তাঁহার ছিল।

আনন্দ সৃষ্টি করে।

উপর হইতে যে বারিবর্ষণ হয় উহাই পৃথিবীর সজীবতা রক্ষা করে তাহা নহে, পৃথিবীর ভিতরেও নিত্যপ্রবাহিত রসের ধারা আছে। কর্তব্যের চাপে নহে, আনন্দেই সংসারের সৃষ্টি হইতেছে। উপনিষদে আছে "আনন্দাদ্ধ্যেব

খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে," অর্থাৎ আনন্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবুর জীবনে এই আনন্দ রসের প্রাচুর্য ছিল।

ক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধা।

যাহাকে কিছু উৎপন্ন করিতে হয় তাহার নিজের পদতলের ভূমির উপর শ্রদ্ধা থাকা চাই। এই ভূমি বালুকাময়, এই ভূমি অসার, এইরূপ যিনি মনে করেন তাঁহার ভূমিকর্ষণ ও শস্যোৎপাদনে মনোযোগ হয় না।

এই দেশের প্রতি রাজনারায়ণবাবুর শ্রদ্ধা ছিল ; শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তিনি এই দেশের মঙ্গলের জন্য বিবিধ কার্য করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে শিক্ষিতেরা দেশকে ভুলিয়া বিদেশী ইতিহাসকে উপাড়িয়া এই দেশে আনিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়াছিলেন ইতিহাসের রূপ দেশকে আশ্রয় করিয়া এক এক স্থলে এক এক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই রূপ অনুসরণ করা যায় না। ইতিহাসের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে ঐ সত্য সকল দেশেই এক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ।

রাজনারায়ণবাবুর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। তিনি ডিরোজিয়োর শিষ্য, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত, ঐ ভাষাতেই চিরদিন ভাবপ্রকাশে অভ্যস্ত। অথচ তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োগ করেন।

তিনি যখন এই সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন, তখন এই সাহিত্যের শিশু অবস্থা। তখন ইহার মধ্যে আকর্ষণের কিছু ছিল না। তাঁহাকে যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইত—"এই ভাষায় কি আছে যে তুমি এই ভাষার সেবা করিবে?" উত্তরে তিনি কিছুই দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি ত এমন ভাবে দেখেন নাই। এই শিশুর সূতিকাগৃহে যখন মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়াছিল তিনি সেই ধ্বনির মধ্যে ভবিষ্যতের গৌরব বাণী নিঃসন্দেহে শুনিয়াছিলেন ; এই জন্যই তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেই শিশুকালেই

ইহাকে যে আসন প্রদান করিয়াছিলেন এখনও বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই গৌরব দান করিতে চাহেন না। এই জন্য তিনি ঐ সময়েই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান না করিলে বাঙ্গালীর উন্নতি হইতে পারে না ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতেন।

আমার তিনি বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮ বছরের সময় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আমি ভারতীতে যাহা লিখিতাম, তাহা পাঠ করিয়া আমার লজ্জা হয়, তাহা এখনও ছাপার অক্ষরে আমার প্রতি চাহিয়া আমাকে লজ্জিত করে। রাজনারায়ণ বাবু তাহা পরম আগ্রহে পড়িতেন, প্রত্যেকটি বাক্যের সমালোচনা করিয়া দেওঘর হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সহৃদয়তা পূর্ণ পত্র পাইবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতাম।

শিশুর প্রতি অনুরাগ।

ছোট শিশুদের প্রতি রাজনারায়ণ বাবুর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তাঁহারা অনেকে শিশুদের মধ্যে কেবল দোষই দেখেন, তাহাদের উপর কেবল অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবু যখন পককেশ বৃদ্ধ, তখন আমার বয়স ৮ বছর; ঐ বয়সে তিনি আমার বয়স্য ছিলেন, আমার সহিত তাঁহার মেলামেশায় কোন বাধা ছিল না। তাঁহার এই শিশুপ্রীতির মূলে অসীম বিশ্বাস ছিল। শিশুদের মধ্যে যে মহৎ পরিণাম আছে তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতে· ' জগতের একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—"শিশুদের আমার নিকট আসিতে দাও।"

আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি যে এখন শিশু ও যুবকদিগকে ভালবাসিতে পারি, ইহার মূলে দুই ব্যক্তি আছেন।

প্রথম আমার পিতা। তিনি কোন দিন আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করেন নাই। তাঁহার সহিত আমার আলাপ আলোচনা হাস্য পরিহাস সকলই চলিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। আমাকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করিতেন।

দ্বিতীয় রাজনারায়ণ বাবু। তিনি আমার সহিত সমবয়সীর মত মিশিতেন।

আমাদের গৃহের দক্ষিণের কক্ষে দ্বিপ্রহরের সময় তিনি শুইয়া থাকিতেন। তখন আমরা নির্ভয়ে ঐ কক্ষে কোলাহল করিতাম। হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে কত কথা বলিতাম। তিনি সময়ে সময়ে চক্ষু মেলিয়া চাহিতেন। যেন বলিতেন, তোমরা ভাবিয়াছ আমি ঘুমাইয়া আছি, তাহা নহে, এই দেখ আমি দিব্য জাগিয়া আছি।

আমার সহিত সেই সময়ের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আনন্দস্মৃতি বহন করিয়া আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি এবং আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

কার্তিক, ১৩২৪

রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সমস্যা

…গত ১৬ই আশ্বিন কলিকাতা শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "নিম্ন" শ্রেণীর লোকদের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এরূপ বক্তৃতা শুনিলে সদাশয় বুদ্ধিমান লোকমাত্রেরই মনে এই বিশ্বাস জন্মে, যে, আমাদের এমন অনেক গুরুতর কর্তব্য আছে, যাহা আমরা করিতেছি না বলিলেও হয়। দুঃখের বিষয় বক্তৃতাটি যথাযথ লিখিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। "সঞ্জীবনী"তে যে ইহার কিয়দংশের তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে তাহা মন্দের ভাল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নাই, ভাব ও চিন্তা কতক কতক আছে। ইহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আমাদের দেশের অসংখ্য লোক অশিক্ষিত। তাহাদের উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য। এই আলোচনা এখন আর নূতন নহে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান।

এ কথা মনে করিয়াও আমার লজ্জা হয় যে, গোখলে যখন অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন এই বঙ্গদেশ হইতেই তাহার প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। এই দেশের কোন কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন,

ছোট লোকেরা যদি বিদ্যাশিক্ষা করে, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথায় ?

আমাদের দেশে অশিক্ষিত কৃষক ও নিম্নবর্ণের লোকই অধিক। দেশের যে রাজস্ব হইতে আমাদের উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার বেশির ভাগ অর্থ আমাদের ঐ অশিক্ষিত কৃষকেরাই যোগাইতেছে। বড় মানুষের ঘরে থাকিয়া তাহাদের ব্যয়ে যেমন কোন কোন দরিদ্রমানুষের বিদ্যাভ্যাস হয়, ভাবিয়া দেখিলে আমরাও তেমনি আমাদের অনুন্নত ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের টাকায় লেখাপড়া শিখিতেছি। কারণ শিক্ষায় যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই তাহারাই দেয়। এই যে তাহাদের ব্যয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছে, তাহার কি কোন প্রতিদান আমরা করিব ?

আমাদের দেশে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ব্যবধানের যে উচ্চ পর্বত রচিত হইয়াছে, বিদ্যালোচনার মেঘরাশি ঐ পাহাড়ে ঠেকিয়া এক পার্শ্বেই বারিবর্ষণ করে। উর্বরতা শ্যামলতা এক পার্শ্বেই দেখা যায়। অপর পার্শ্বে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে।

পূর্বের কথা।

পূর্বে আমাদের দেশে ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এখনকার মত ব্যবধান ছিল না। তখন এমন সকল আয়োজন ছিল যাহার দ্বারা সকলপ্রকার জ্ঞানধর্মমূলক কথা আপনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। উহার ফলে পাশ্চাত্যদেশে ধনী দরিদ্রে যে প্রভেদ, পণ্ডিতে মূর্খে যে প্রভেদ রহিয়াছে, আমাদের দেশে তেমন প্রভেদ কখনও হইতে পারে নাই।

বর্তমান অবস্থা।

এখন ক্রমশঃ সেই প্রভেদ বাড়িতেছে। পল্লীর সমৃদ্ধেরা নগরের মুখে ছুটিয়াছেন। পল্লীর শিক্ষিতেরা জীবিকার্জনের নিমিত্ত বিদেশে বাস করিতেছেন। যাঁহারা পল্লীকে সঞ্জীবিত করিবেন, তাঁহারাই নগরে গিয়াছেন। এই কারণে পল্লী নির্জীব।

ফল।

ইহার কুফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। পল্লীবাসী কৃষকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে না। তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে কেন? তাহারা জানে যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া তাহারা যাহা উপার্জন করে, জমিদার, গোমস্তা, উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার সকলেই তাহা শোষণ করিয়া সেই টাকায় বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আমরা এখন যখনই হঠাৎ তাহাদের দুয়ারে হাজির হইয়া বলি, আমরা তোমাদের উপকারের জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহারা স্বভাবতই আমাদিগকে সন্দেহ করে। করিবে না কেন? তাহাদের শ্রমের ধন আমরা ভোগ করি, কিন্তু বিনিময়ে কি দিয়াছি?

বিপ্লবের সূচনা।

ইহা এক ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সূচনা করে। এক জায়গায় যখন বায়ু একান্ত শুষ্ক, অন্য স্থলে অত্যন্ত সরস, তখন প্রবল ঝটিকাবর্ত উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সাম্য আনয়ন করে। এইরূপ বৈষম্য হইতেই বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার প্রভেদের জন্য আমাদের দেশে স্বামীস্ত্রীতে মনের মিল কমিতেছে, নিম্নবর্ণে উচ্চবর্ণে ব্যবধান ভীষণ বাড়িতেছে।

ব্যবধান দূর করিবার উপায়।

এই ব্যবধান দূর করিবার উপায় শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। একটি দুইটি নহে, দেশের মধ্যে এইরূপ সহস্র সহস্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উন্নত ও অবনতের ব্যবধান দূর করিয়া দিতে হইবে।

ভিত্তি ফাটা।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের সময় আমরা কিছু কিছু অধিকার পাইতেও পারি। এই দেশে রাজনৈতিক সৌধনির্মাণের চেষ্টা হইতেছে, অনেক মিস্ত্রী সেই কার্যে

লাগিয়াছেন, রাজকীয় মিস্ত্রীও আমাদের অনুকূল। আমাদের এই সৌধ যত সুন্দর হউক, ইহার কারুকার্য যত নিপুণ হউক, মনে রাখিতে হইবে যে ঐ সৌধের ভিত্তিই ফাটা। আমাদের দেশের নিম্নস্তরে যে কোটি কোটি লোক আছে, তাহাদিগকে টানিয়া না তুলিলে আমাদের কোন উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে না।

পৌষ, ১৩২৪

ছাত্র সাহায্য সমিতি

কলিকাতায় ৬২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটি ছাত্র সাহায্য সমিতি আছে। ইহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস ইহার সম্পাদক। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ এম্ টি কেনেডী, রেভারেণ্ড মিঃ হল্যাণ্ড, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি ইহার সভ্য। সর্বসাধারণে এই সমিতিকে সাহায্য করিলে আমরা খুব খুশী হইব। দরিদ্র ছাত্র বিস্তর, কিন্তু সমিতির আয় নিতান্ত কম।

মাঘ, ১৩২৪

ভারতবর্ষের প্রার্থনা

বেদমন্ত্র গীত হইবার পর কংগ্রেস মণ্ডপে আরও কছু গান হইয়াছিল। তাহার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "India's Prayer" বা ভারতবর্ষের প্রার্থনা নাম দিয়া স্বরচিত দুটি প্রার্থনা ইংরেজীতে পাঠ করেন। প্রথমটির অনেক ভাব তাঁহার "নৈবেদ্য" গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় আছে। গোড়ার কথা-গুলি নৈবেদ্যের সেই কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহাতে আছে—

> "আমারে সৃজন করি' যে মহাসম্মান
> দিয়েছ আপন হস্তে রহিতে পরাণ
> তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
> যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্বরী
> তার উর্ধ্বশিখা যেন সর্বউচ্চে রাখি,
> অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি!

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর! যেথায় যে পদক্ষেপ করে,
অবসান বহি' আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক্‌না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে,…"

"দেবদ্রোহী বলে সর্বশক্তি লয়ে মোর" তাহারও সেই দেবদ্রোহচেষ্টা যেন প্রতিহত করিতে পারেন, কবি এই প্রার্থনা করিয়াছেন।

"যাক্ আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব!"

ইংরেজী প্রথম প্রার্থনাটি পড়িয়া আরো মনে পড়ে নৈবেদ্যের সেই কবিতা যাহাতে আছে—

"ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীনপ্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়!—দুর্বল আত্মায
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে;
ক্ষীণ-প্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্র ক্ষীণ করে
আপনার মত,—যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে—আবেশে দিবস কাটে তার!
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দিকে; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তকমাড়াযে
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে!
অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন!"

কিন্তু ইংরেজী এই প্রথম প্রার্থনাটি কবির কোন বাংলা কবিতার অনুবাদ নহে। ইহা সময়োপযোগী নূতন রচনা।

দ্বিতীয় ইংরেজী প্রার্থনাটির সহিত তাঁহার নিম্নলিখিত গানটির মিল আছে।

"আমার এই যাত্রা হ'ল সুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার !"
(সম্পূর্ণ গানটি এখানে উদ্ধৃত আছে)

মাঘ, ১৩২৫

শ্রীযুক্ত প্যাটেলের বিল সম্বন্ধে রবিবাবুর মত

মহারাষ্ট্রদেশের নাসিক শহরের ভারতসেবক নামক মারাঠি মাসিকপত্রের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বিঠলভাই ঝাভেরভাই প্যাটেলের অসবর্ণ হিন্দু বিবাহ বিষয়ক আইন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে রবিবাবু যে চিঠি লিখিয়াছেন, দেশহিতৈষী মাত্রের তাহা প্রণিধানযোগ্য, পত্র খানির মূলকথা যাহা তাহা "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" নামক তাঁহার বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

আষাঢ়, ১৩২৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা

...তৃতীয় প্রশ্নপত্র দ্বারা পরীক্ষার্থীর মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের বাংলা গ্রন্থাবলীর জ্ঞান পরীক্ষিত হইবে। তজ্জন্য নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইবে। পুস্তক নির্দিষ্ট হইয়াছে, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও মেঘনাদবধ। নির্বাচনের দোষ দেওয়া যায় না। কেবল লক্ষ্য করিতে বলিতেছি যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের কোন পুস্তক নির্বাচিত হয় নাই ;—হইতে পারে যে বাহুল্য ভয়ে হয় নাই। তাহার পর বিবেচ্য, চতুর্থ প্রশ্নপত্রের বিষয়—
(ক) ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গদ্যলিখনরীতির ক্রমবিকাশ (Development of prose style in Bengali Literature, 1800—1857)
(খ) ১৮৫৭ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলনের প্রভাব (Influence of western culture on Bengali Literature, 1857—1880)।...

একটা কথা মনে হইতেছে। ১৮৫৭ সালে রবিবাবু জন্মগ্রহণ করেন নাই,

এবং ১৮৮০ সালে রবিবাবুর বয়স বোধ হয় ১৮।১৯ ছিল। বাংলা গদ্যলিখন রীতির বিকাশ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অনুশীলিতব্য করায় এবং বাংলাসাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলনের প্রভাব ১৮৮০ সাল পর্যন্ত অনুশীলিতব্য করায় কার্যতঃ রবিবাবু ৪র্থ প্রশ্নপত্রের সমুদয় বিষয় হইতে বাদ পড়িলেন। অভিসন্ধি-পূর্বক ইহা করা হইয়াছে, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না, কারণ "পরচিত্ত অন্ধকার"। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা বাংলায় এম্-এ দিবেন, তাঁহাদের নিকট আধুনিক সাহিত্য মানে বস্তুতঃ ৪০ বৎসরেরও আগেকার সাহিত্যই দাঁড়াইবে, এবং যিনি উচ্চ হইতে উচ্চতম চিন্তাক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যের ধ্বজা উড্ডীন করিতেছেন, যিনি সকল সভ্যদেশে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ কৌতূহল উৎপাদন করিয়াছেন, যিনি বঙ্গসাহিত্য মন্দিরের সকল কক্ষ উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং যাঁহার প্রতিভা এখনও নব নব আকারে ও প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে, সেই রবীন্দ্রনাথ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোন প্রকারেই, এম্ এ পরীক্ষার্থীদের আলোচনার বিষয় হইবেন না। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কাহারো নীচে নহে, এবং তাঁহার প্রতিভা এত দিকে এত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার প্রভাব আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের উপর এত বেশী ও এত ব্যাপক, বঙ্গের বাহিরের জগতের সহিত ভাব ও চিন্তার আদান প্রদানে তিনি বঙ্গীয় অন্য সকল লেখকদের অপেক্ষা এরূপ উচ্চস্থানীয়, যে, তাঁহাকে বাদ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বাংলা পরীক্ষার অধীতব্য বিষয় কোন বৎসরই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

আষাঢ়, ১৩২৬

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

…বাঙলা দেশে অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত সৎ ও প্রতিভাশালী লোকের ৫৫ বছর বয়সেই মৃত্যু হইয়াছিল।…

১৩২১ সালের ভাদ্র মাসে ত্রিবেদী মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার সম্বর্ধনা করেন। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন তাহা রামেন্দ্রবাবুর কীর্তি ও প্রকৃতির সম্যক পরিচায়ক। উহা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি।

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অমর, কীর্তিতে তুমি অমর তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্যসুন্দর। হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথী তুমি, এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রী[illegible]র দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে॥

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি; নিধি-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।

৫ই ভাদ্র ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহাতে যে কেবল কবির নিজের হৃদয়েরই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নয়; রামেন্দ্রবাবুকে যিনি জানিতেন, তিনিই কবির কথায় সায় দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

পঞ্জাবে গত আড়াইমাসে যাহা ঘটিয়াছে তাহার মোটামুটি খবর দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক কি যে হইয়াছে এবং কি কারণে হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ সরকারী সেন্সরের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন খবর প্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই। ফলে কেবল পঞ্জাবের এংলো ইণ্ডিয়ান কাগজের খবর এবং সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া খবরই দেশে প্রচারিত হইয়াছে; ভিন্ন প্রদেশের লোককে পঞ্জাবে যাইতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ভিন্ন প্রদেশের এংলো ইণ্ডিয়ান কোন কোন সংবাদ-দাতা পঞ্জাবে যাইতে পারিয়াছে; পঞ্জাবে সামরিক আইন অনুসারে যাহাদের বিচার হইয়াছে তাহারা অন্য প্রদেশ হইতে নিজেদের মনোনীত উকীল ব্যারিস্টার লইয়া যাইতে পায় নাই; পঞ্জাব হইতেও যাহারা বাহিরে আসিয়াছে তাহারা কোন চিঠিপত্র লইয়া যাইতেছে কিনা দেখিবার জন্য, কোন কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে তাহাদের খানাতল্লাসী হইয়াছে; পঞ্জাব হইতে যাহাতে ডাকযোগে কেহ বাহিরের কোন কাগজে খবর দিতে না পারে, তাহার চেষ্টাও হইয়াছে, যদিও তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু বেসরকারী খবর বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত যে-সব খবর বাহির হইয়াছে এবং এই সকল সতর্কতা সত্ত্বেও বেসরকারী সামান্য খবর যাহা বাহির হইয়াছে ও গুজব যাহা রটিয়াছে, তাহা হইতে পঞ্জাবে যে-সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকের মোটামুটি একটা ধারণা হইয়াছে। এবং তাহাতে জনসাধারণের মন সংক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়াছে। সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত খবর ভিন্ন অন্য খবর যাহাতে বাহির না হয়, এবং বাহিরের কোন লোক যাহাতে পঞ্জাবে অনুসন্ধান করিতে না যায়, পঞ্জাবের গভর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা করায় লোকের মনে এই সন্দেহও বদ্ধমূল হইয়াছে যে, পঞ্জাবে নিশ্চয়ই এমন অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহা সরকারী কর্মচারীরা গোপন রাখিতে উৎসুক। তাহার উপর ক্রমে ক্রমে বিস্তর ফাঁসীর, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ও অন্যবিধ ভীষণ দণ্ডের খবর আসিতেছে, অথচ প্রেস আইন

ও অন্যবিধ কঠোর আইন থাকায় এবং গবর্ণমেণ্টের মেজাজ মহানুভব ফ্রেডরিকের মত না হওয়ায়, দেশের লোকদের মনের ভাব ঠিক প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতের গবর্ণর-জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডকে নিম্ন মুদ্রিত চিঠিখানি লিখিয়াছেন :—

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are covinced, are without parallel in the history of civilised Governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, for less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement

from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I shall entertain great admiration.

Yours faithfully
Rabindranath Tagore.

পত্রখানিতে পঞ্জাবের আধুনিক ঘটনাবলী ও অবস্থা সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা ও মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আদ্যোপান্ত সত্য। "কবিসুলভ ভাবপ্রবণতা" বশতঃ হঠাৎ বিচলিত হইয়া তিনি এই কাজ করেন নাই। ধীর সত্যনিষ্ঠ হৃদয়বান নির্ভীক মানব প্রেমিকের যাহা করা উচিত, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

ইতিহাসে ও মানবপ্রকৃতিতে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে নানা ঘটনার কারণ ও

প্রকৃতি সহজে সামান্য উপকরণ হইতে বুঝা যায়। ইতিহাসের স্রোত কি কি কারণে কোন্ পথে ধাবিত হয়, জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতন কি কি কারণে হয়, জনসমাজ কি কি কারণে সংক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, অবসাদগ্রস্ত বা নববলশালী হয়, ঐতিহাসিক নানা ঘটনার নিগূঢ় কারণ কি কি, এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অসাধারণ; তিনি ইতিহাসের তত্ত্বদর্শী, উহার মর্মস্থলে উনি পেঁছিয়াছেন। এইজন্য দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টির বলে ভারতেতিহাসের কোন কোন যুগ সম্বন্ধে বহুবৎসর পূর্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, বহু অধ্যয়ন ও গবেষণা-পরায়ণ নিরপেক্ষ ও সত্যভাষী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার নানা ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ ও অধ্যয়নের পর সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া স্বরচিত কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যে শক্তির বলে রবীন্দ্রনাথ পুঞ্জীকৃত মূল ঐতিহাসিক উপাদানে পরিবেষ্টিত না হইয়াও ইতিহাসের মর্মস্থলে পেঁছিতে পারিয়াছিলেন সেই শক্তি অল্প সংবাদ হইতেও তাঁহাকে পঞ্জাবের ঘোর দুর্দশা উপলব্ধি করিতে সমর্থ করিয়াছে। তিনি কেবল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করেন নাই, হৃদয়েও অনুভব করিয়াছেন। কবিদের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা কল্পনা ও অনুকম্পার (sympathy) বলে সকল রকম মানুষের সংগে অভিন্নাত্মা ও অভিন্ন হৃদয় হইতে পারেন, সকল রকম মানুষের চিন্তা, ধারণা, ভাব, উত্তেজনা, অবসাদ. বেদনা ও হর্ষ আপনাদের আত্মায় উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য মানুষদের বিষয় যখন তাঁহা ভাবেন ও লেখেন তখন তাঁহারা আপনাদের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া যেন ঐ সব মানুষ হইয়া যান। রবীন্দ্রনাথের এই কবি শক্তি অসামান্য। এই শক্তি থাকায় মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবের দুর্দশা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, পঞ্জাবীদের অপমান, নিগ্রহ ও বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছেন: উহা তাঁহার মর্মে বিঁধিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ জগদ্বিখ্যাত লোক; তাঁহার পত্র চাপা থাকিবে না। সভ্য জগতের বহু সাধারণ লোক ও বহু মনীষী তাঁহার পত্রের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন। প্রভুত্বোন্মাদ ও স্বার্থান্ধতা বশতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ানরা বুঝিবে না, কিংবা না বুঝিবার ভান করিবে। লর্ড চেমসফোর্ড যদি এংলো-ইণ্ডিয়ান দলভুক্ত হন, তাহা হইলে তিনিও চিঠিটার দ্বারা উপকৃত হইবেন না। কিন্তু সভ্যজগতের লোক চিঠিটি পড়িয়া কি ভাবিবে, এংলো ইণ্ডিয়ানদিগকে,

ইংরেজদিগকে ও বড়লাটকে চিঠিটি কি ভাবাইবে ও করাইবে, তাহা আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় নহে। কারণ চিঠিটি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কাহারও কাছে আবেদন ও ভিক্ষুকের ক্রন্দন নহে। আমরা ভাবিব "the helplessness of our position as British subjects in India," "ভারতে বৃটিশ প্রজারূপে আমাদের অসহায় অবস্থা" এবং প্রতিকারের চিন্তা ও প্রতিকারের চেষ্টা করিব ;—প্রতিকার কিরূপ হইতে পারে তাহা গতমাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছি। আমাদের মধ্যে যদি সাংসারিক ক্ষমতা সম্মান ও পদমর্যাদায় কাহারও মাথা ঘুরিয়া গিয়া থাকে, তিনি বুঝুন, যে, "badges of honour make our shame glaring in their context of humiliation," এবং রবীন্দ্রনাথের মত অন্তরের সহিত বলুন, "I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who for their so called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings." যাঁহারা উপাধিধারী তাঁহাদিগকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আমরা একথা বলিতেছি না। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন রকমের অহংকার আছে,—আভিজাত্যের, ধনের, শিক্ষার, বিদ্যার, পদমর্যাদার, শক্তির বা রূপের অহংকার আছে। এই সব অহংকার বিসর্জন দিয়া যদি আমরা, দেশে ও সমাজে ভ্রমবশত: তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বা ইতর বলিয়া বিবেচিত সকল মানুষের পাশে তাহাদেরই দশজন বলিয়া কথায় কাজে ও অন্তরে দাঁড়াইতে পারি, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের পত্র সার্থক হইবে। আর যদি আমরা আশা করিয়া বসিয়া থাকি, যে, তাঁহার পত্র পড়িয়া সভ্যজগৎ বা সভ্যজগতের কোন অংশ দয়ার্দ্র হইয়া আমাদের দুঃখমোচন করিবে, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপমান করিতে পারি না, এবং অধিকতর আত্মপ্রতারিত হইতে পারি না। যে নিজের দুঃখ মোচন করিতে পারে না, নিজের দুঃখ মোচন জন্য সর্বোৎসর্গের সত্য পণ করিতে পারে না, অন্য কেহ তাহার দুঃখ মোচন করিতে পারে না।

ভাদ্র, ১৩২৭

স্বাবলম্বন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

প্রবাসীর একজন মফস্বলবাসী হিতৈষী লেখক গত ৯ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছেন, তাহা আমাদের ব্যবহারার্থে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

এখানে এসে অবধি জনসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। চিঠিপত্র লেখা শক্ত হয়েচে। এখানে এসে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমরা মাংসাশী মানুষের হাতে। এরা প্রচণ্ড,...। পাঞ্জাবে এরা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, মনে করেছিলুম সেটা আকস্মিক, এবং সাময়িক আতঙ্ক থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পার্লামেণ্টে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল তার থেকে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছি এই প্রচণ্ডতা এদের মজ্জায় নিহিত, তাদের রক্তে বহমান। ডায়ারের কীর্তিকে এরা কেউ কেউ "splendid brutality" বলে প্রশংসা করেছে। এই উপলক্ষে এদের মেয়েদের মধ্যেও রক্তলোলুপ হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি। আমাদের বোঝবার সময় এসেচে যে, এদের কাছ থেকে আমাদের শুধু আশা করবার নেই—আশা করা আত্মাবমাননা। আমাদের এতকাল মনে এই দুরাশা ছিল যে,—এরা দেবে আমরা পাব, এদের সঙ্গে আমাদের এই দাতা ভিক্ষুকের সম্বন্ধ। কিন্তু দেবার শক্তি এদের নেই, সেই আমাদের সৌভাগ্য—কারণ দানের দ্বারা দুর্বলকে যত নষ্ট করা যায় এমন বঞ্চনার দ্বারা নয়। আমাদের যদি পৌরুষ থাক্‌ত, বল থাক্‌ত, তাহলে দান গ্রহণের দ্বারা আমরা ক্ষুদ্র হতুম না। সকল বড় হাতই অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে ; কিন্তু সেই গ্রহণ করা খাজনা গ্রহণ করার মত—কেননা যার আছে সেই পাবে এই নিয়ম—রাজাই পাবে, ভিক্ষুক পাবে না অতএব এদের কাছে হাতপাতার চেয়ে আমাদের মৃত্যু শ্রেয়। আমাদের দেশের 'মডারেট' যাঁরা তাঁরা হাত জোড় করে ভিক্ষা করেন, আর যাঁরা 'এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট' তাঁরা চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করেন, এইমাত্র তফাৎ। একদল মনিবের পায়ের সামনে ল্যাজ নাড়েন, আর একদল ঘেউ ঘেউ করেন ;

—একদল মনে করেন তাঁরা ভারি সেয়ানা, আর একদল মনে করেন তাঁরা ভারি তেজস্বী কিন্তু মনিবের উচ্ছিষ্ট এবং লাথি দুই দলের পিঠে সমান ভাবেই পড়ে—অথচ সেই উচ্ছিষ্টের ভাগ সম্বন্ধে দুই দলের কলহের আর অন্ত নেই। ওদিকে দেশের কাজ পড়ে আছে, সেদিকে মন দেবার সময় নেই। অতএব উচ্ছিষ্টের চেয়ে এই লাথিই আমাদের পক্ষে যথার্থ সৌভাগ্য।

বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাদ্র, ১৩২৭

শাসনযন্ত্র ও শাসক মানুষ

রয়টারের তারের খবরে দেখিলাম, যে, বিলাতের অবজার্ভার কাগজের একজন প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতে অশান্তি ও তাহা নিবারণের উপায় প্রভৃতির কথা পড়িয়া তাঁহার মত জানিতে চান। প্রতিনিধি যাহা জানিতে পারেন অবজার্ভারে তাহা বাহির হইয়াছে। রয়টার তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত চুম্বক পাঠাইয়াছেন। তাহা পড়িয়া কোন সমালোচনা করা চলে না। তবে তাহা হইতে যাহা বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে দু-এক কথা বলিতেছি। চুম্বক হইতে মনে হয় যেন রবিবাবুর মত এইরূপ যে শাসনযন্ত্রের এবং শাসনপ্রণালীর পরিবর্তনে বিশেষ কোন ফল হইবে না; রাষ্ট্রিয় কার্য চালাইবার লোকগুলি যদি এমন হয় যে তাহাদের সংগে ভারতীয়দের সংস্পর্শ থাকিতে পারে এবং ভারতীয়দের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে অশান্তি দূর হইবে। অবজার্ভারে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে রবিবাবুর মতে মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষের বড়লাট হইলে অশান্তি প্রশমিত হইবে। এই-সব মতের আলোচনা করিতেছি, কিন্তু তাহা রবিবাবুর মত কি না বলিতে পারি না।

... ...

মণ্টেগু সাহেবের বড়লাট হওয়া সম্বন্ধে আমাদের মত কতকটা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। তিনি বড়লাট হইয়া তাঁহার ভারত সম্বন্ধীয় কোন কোন বক্তৃতায় প্রকাশিত আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে অশান্তি

দূর হইতে পারে, এবং ভারতীয়গণ নিরুপদ্রবে গণতন্ত্র অর্জনের চেষ্টা করিতে পারে।

শ্রাবণ, ১৩২৮

জার্মেনীতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার জন্মদিনে জার্মেনীর মনীষীদের অগ্রণীগণ তাঁহাকে তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক এক অভিনন্দনপত্র উপহার দিয়াছেন। তাহার সংগে জার্মেণীর আধুনিক লেখকদের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা কবিকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অয়কেন্, কাউণ্ট বন্‌ষ্টফ, এডল্‌ফ্, হার্ণ্যাক, হৌপট্‌ম্যান, হৌসম্যান, হার্ম্যান্ জ্যাকবী, কাউণ্ট কৈসরলিং, প্রভৃতির নাম আছে।

ভাদ্র, ১৩২৮

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্ত্তন

বিদেশে মাতৃভূমির জন্য জয়মাল্য ও পূজার অর্ঘ্য অর্জন করিয়া রবীন্দ্র-নাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহার দ্বারা ভারতের ও জগতের আরো কল্যাণ হউক, এবং জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হইতে থাকুক, সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

আমেরিকা ও ইংলণ্ড ছাড়া তিনি এবার আরো অনেক দেশে গিয়াছিলেন। সুইডেন, ডেন্মার্ক, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্, ফ্রান্স, জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া, সুইট-জার্ল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া তিনি এবার দেখিয়া আসিয়াছেন। এই সকল দেশে যেরূপ মনীষী ও গণ্যমান্য লোকদের দ্বারা, যেরূপ বিপুল জনসংঘের দ্বারা তাঁহার যে-প্রকার আন্তরিক সম্বর্ধনা হইয়াছে, কোন কবি, কোন মনীষী, কোন রাজনীতিজ্ঞ, কোন সেনাপতি, কোন সম্রাটের তাহা হয় নাই। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা এবং তাঁহার দ্বারা প্রচারিত বলবিধায়ক ও শান্তিপ্রদ বাণী যে তাঁহাকে নানা দেশে অগণিত লোকের প্রীতি ও ভক্তির পাত্র করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, জার্মেণীতে তিন সপ্তাহে তাঁহার 'সাধনা' নামক

ধর্মগ্রন্থের জার্মান অনুবাদের পঞ্চাশ হাজার খণ্ড বিক্রয় তাহার অন্যতম প্রমাণ। কবি স্বয়ং কিন্তু অন্য একটি কারণেরই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া এই ধারণা হইয়াছে, যে, যুদ্ধের পর ইউরোপের ভুক্তভোগী লোকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্দদিকটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে; অর্থগৃধ্নুতা ও জাতিগত বিদ্বেষে জর্জরিত হওয়া যে কিরূপ দুঃখের কারণ, তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। নূতন জীবনের জন্য অনেকে ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আলোকের জন্য তাহারা আশার সহিত প্রাচ্য-জগতের দিকে, ভারতের দিকে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে প্রাচ্যভূখণ্ডে ও ভারতে যে মুক্তিপ্রদ শান্তিপ্রদ বাণী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, ইউরোপীয়েরা রবীন্দ্রনাথে যেন তাহাকেই মূর্তি পরিগ্রহ করিতে দেখিয়াছিল।

তাঁহার অসাধারণ সম্বর্ধনায় ভারতীয়দিগের আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু আহ্লাদিত হইলে ও কিছু গৌরব অনুভব করিলেই আমাদের কর্তব্যের সমাপন হইবে না। দুটি চারিটি সভা করিয়া আমরাও যদি তাঁহার সম্বর্ধনা করি, তাহাতেও কর্তব্যের অবসান হইবে না। জীবনের যে পূর্ণ ও আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্য প্রাচ্যের ও তাঁহার সম্মান, সেই আদর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; বিশ্বমানবের মধ্যে প্রীতি স্থাপন, ভারতীয় ও প্রাচ্য সভ্যতা ও বিদ্যার অনুশীলন, প্রভৃতি যে সকল মহৎ কার্য এখন তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে তাঁহার সহায় হইতে হইবে।

আশ্বিন, ১৩২৮

বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী কে ?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ধনাঢ্য পত্রিকা-গুলি পুরস্কার ঘোষণা করেন, অথবা এক হাজার বিখ্যাত লোকের নিকট চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের মত আনিয়া অধিকাংশের ভোট অনুসারে মনীষীগণের গুণানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করেন। আমাদের পুরস্কার দিবার মত অর্থ নাই এবং পত্র লিখিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রলোকের উত্তর পাওয়া

কঠিন। সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমরা নিজেরাই কিঞ্চিৎ "মৌলিক" গবেষণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বিখ্যাত নাইনটীন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকায় মিসটার লেনার্ড লিখিয়াছেন, "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তব্য, ছাত্রদিগকে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্বীদের আদর করিতে শিখান।" "It is the function of a University to train its students in the appreciation of the greatest minds the race has produced."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা হইতে বি-এ পর্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে বাধ্য করিয়াছেন। গত দশবৎসরে (১৯১৩-১৯২২ খৃঃ) এইসব পরীক্ষার বাংলা রচনার পাঠ্যপুস্তকগুলি গণিলে দেখা যায়, কোন্ গ্রন্থকার কত বার পঠিত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। সে গণনাফল এইরূপ :—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—	১৪ বার
বঙ্কিমচন্দ্র--	১০ „
চন্দ্রনাথ বসু—	১০ „
যোগীন্দ্রনাথ বসু—	১০ „
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—	১০ „
রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ—	১০ „
দীনেশচন্দ্র সেন—	১৩ „
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—	৭ „
রবীন্দ্রনাথ—	২ „

এখানে দুটি কথা মনে রাখিতে হইবে। চন্দ্রনাথের গ্রন্থবিশেষ অনেকবার নীতিশিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়, ভাষা বা ভাবের জন্য নহে। আর, চণ্ডীচরণ ও যোগীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের জীবনী লিখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা এই দুই পাঠ্যগ্রন্থের রচয়িতা হইলেও, তাঁহাদের পুস্তকে বিদ্যা-সাগর ও মাইকেল এবং তৎকালীন অন্যান্য মহাপুরুষের কথা ও পত্রগুলিই কার্যতঃ আসল পাঠ্য। সুতরাং শেষফল এই দাঁড়াইতেছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে দীনেশচন্দ্র সেন ও রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ বঙ্কিমের সম্পূর্ণ সমকক্ষ এবং রামেন্দ্রসুন্দর হইতে প্রায় দেড়গুণ ও রবীন্দ্রনাথ হইতে পাঁচগুণ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী, the greatest mind of

race, বলিবার যত কারণ আছে, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও দীনেশ সেনকে সেই পদ দিবার তদপেক্ষা পাঁচগুণ প্রবল কারণ পাওয়া গিয়াছে।

বিষয়টা আর-একদিক দিয়া দেখিলে এই সত্যটা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে বি এ পরীক্ষার্থীগণ বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থের শুদ্ধ ভাষা শিক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তাহার মর্ম বিষয় ও ভাবগুলিও হৃদয়স্থ করিবে এবং তাহাতে পরীক্ষিত হইবে। গত দশ বৎসর বি, এ পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল—

বঙ্কিম—	১০ বার
চণ্ডীচরণ (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর)—	১০ বার
রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ—	৯ বার
রবীন্দ্রনাথ—	১ বার

অতএব প্রমাণ হইল, যে, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা নয়গুণ greatest mind of the Bengali race, এবং রবীন্দ্রনাথকে যে সাহিত্য সম্রাট, Laureate of Asia, প্রভৃতি বলা হয়, তাহা আমাদের ছোকরাদের মোহ বা অবিদ্যার ফল। বিশ্ববিদ্যালয় গুণের যথার্থ আদর করেন, তিনি রাজেন্দ্রকে রবীন্দ্রের মাথায় ৯ তলা উপরে এবং দীনেশচন্দ্রকে অনেক তলা উপরে বসাইয়া দিয়াছেন।

আমরা গবেষণা-কার্যে "নূতন ব্রতী" এবং গণিত পারদর্শী নহি; সুতরাং উপরের অংকগুলায় এক আধটা ভুল "অসাবধানতা" বশতঃ থাকিলে তাহা কেহ দেখাইয়া দিলে সংশোধন করিব। তবে, ইহা নিশ্চিত, যে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র বা রাজেন্দ্রনাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনস্বী, ইহা কোন সংশোধন দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে না।

কার্তিক, ১৩২৮

দুটি পুস্তিকা

জোড়াসাঁকোতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে যে বর্ষা-উৎসব হইয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে গীত ১৮টি বর্ষাবিষয়ক গান "বর্ষামঙ্গল" নামক পুস্তিকায় আছে। ষোলটি গান রবীন্দ্রনাথের, তাহার মধ্যে ৫টি নূতন। পুস্তিকাটির দাম দু-আনা; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসে পাওয়া যায়।

"সত্যের আহ্বান" পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা। ইহাও ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসে পাওয়া যায়। উভয় পুস্তিকার লভ্যাংশ বিশ্বভারতীকে দেওয়া হইবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

"বিশ্বভারতী"

বোলপুরের নিকটবর্তী শান্তিনিকেতন পল্লীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বৎসরের কার্য আগামী পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার বিজ্ঞাপন প্রবাসী বিজ্ঞাপনীর মধ্যে দৃষ্ট হইবে। যাহাতে নূতন বৎসর হইতে কতকগুলি ছাত্রী আশ্রমে পড়াশুনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে। বিশ্ব-ভারতীতে এখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা আছে :—

ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সংস্কৃত, পালি, বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠি, মৈথিলী, সিংহলী, ফরাসী, জার্মান্ ও গ্রীক্। দর্শনবিভাগে—অভিধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন। কলাবিভাগে—ভারতীয় চিত্রকলা। সংগীত বিভাগে—গান ও বাদ্য।

শ্রীযুক্ত সদ্ধর্মবাগীশ ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুজ, শ্রীযুক্ত এইচ্ মরিস্, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য, প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভাঁ লেভি বিশ্বভারতীতে আগমন করিয়াছেন। ইনি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন, ও ছাত্রগণকে গবেষণার কার্য বিশেষ রূপে শিক্ষা দিবেন।

অধ্যাপক লেভির প্রারম্ভিক বক্তৃতা আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণে হইবে। তৎপরের তাঁহার ব্যাখ্যান প্রতি রবিবার অপরাহ্ণে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য এই, যে ইহাতে কলিকাতায় ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানে সর্বোচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র ও অপর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ উপদেশ শুনিয়া আসিতে পারিবেন, এবং সোমবার পুনর্বার স্ব স্ব স্থানে

আসিয়া নিজ নিজ কার্য করিতে পারিবেন। এইসকল বিদ্যার্থী বিশ্ব-ভারতীর অধ্যক্ষ মহাশয়কে আগে হইতে খবর দিতে পারিলে ভাল হয়।

মাঘ, ১৩২৮

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা

বিশ্বভারতীর কার্য আগে হইতে চলিতেছিল। গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উহার নিয়মাবলী সভাস্থ সকলের সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, প্রিন্সিপ্যাল সুশীল কুমার রুদ্র, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই বিশ্বভারতীর সভ্য হতে পারেন। ইহাতে ছাত্রছাত্রী উভয়েরই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রীদের বাস ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। বিশ্বভারতীতে প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববিধ বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য, সকল বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত এখন হয় নাই, কিম্বা অদূর ভবিষ্যতেও না হইতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বিদ্যাকেই বাদ দেওয়া হয় নাই, কোন বিদ্যা শিখাইবার সামর্থ যখনই হইবে এবং উহা শিখিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীও জুটিবে, তখনই উহা শিখাইতে আরম্ভ করা হইবে।

মাঘ, ১৩২৮

শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী মহোদয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ছিলেন।

তিনি সংগীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন ; এতদ্ভিন্ন কয়েকটি ভাষা জানিতেন, এবং সাধারণতঃ লোকে যাহা শিখিয়া থাকে তাহাতেও সুশিক্ষিতা

ছিলেন। সংগীত শিক্ষা দিবার জন্য তিনি "সঙ্গীত সঙ্ঘ" স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ঐ বিষয়ে যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সুশিক্ষা পায় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবতী ছিলেন এবং ব্যয় করিতেন। তিনি "আনন্দ-সংগীত পত্রিকা" নামক সংগীত বিষয়ক অন্যতম বাংলা কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

শ্রাবণ, ১৩২৯

মুক্তধারা

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নবতম নাটক মুক্তধারার একটি সমালোচনা জার্মাণীর সদর শহর বার্লিন হইতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'ফোসিশটু সাইটুং'-এর ১৯২২ সালের ২৬শে মে তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমালোচনাটি প্রকাশ করিবার পূর্বাভাষ রূপে সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন—

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর জার্মাণ অনুবাদক বলিয়া বিখ্যাত ডক্টর হেলমুট ফন্ গ্লাসেনাপ আমাদের পত্রিকার লেখক। তিনি আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে, ভারত-কবির একটি নূতন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা এ-পর্যন্ত কেনো য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। তিনি সেই নাটক সম্বন্ধে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নাটক।"

"কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্র প্রবাসী (অর্থাৎ বিদেশবাসী) তার এপ্রেল (বৈশাখ) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত মূল বাংলা একখানি নূতন নাটক প্রকাশ করিয়াছে।

'নাটকখানির নাম মুক্তধারা—অর্থাৎ বাধাহীন স্রোত,—ইহা একটি বড় ঝরণার রূপক নাম ; সেই ঝরণাটিই নাটকের ঘটনার কেন্দ্র এবং উহার চার দিকেই নাটকের সকল দৃশ্য সন্নিবেশিত', কবির নাটকের ভিত্তিভূত গল্পটি এই—

"উত্তরকূটের রাজা রণজিতের ইঞ্জিনিয়ার (যন্ত্ররাজ) বিভূতি ২৫ বৎসর চেষ্টার পর মুক্তধারার জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া একটি বাঁধ বাঁধিয়াছে, তাতে নাবাল দেশ শিবতরাই এর জলের জোগান বন্ধ হইয়াছে। শিবতরাই এর

লোকেরা উত্তরকূটের অধীন, কিন্তু প্রায়ই তাহারা বিদ্রোহী ও অবশীভূত হইয়া ওঠে।"

"রাজা রণজিত আশা করিতেছেন যে, মুক্তধারার জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া তিনি শিবতরাইএর লোকেদের বশে রাখিতে পারিবেন। মুক্তধারার বাঁধ সম্পূর্ণ হওয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মুক্তধারার সন্নিহিত ভৈরব-মন্দিরে সেইদিন এক মহৎ উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।"

"ভৈরব-মন্দিরের পূজারী ভৈরবপন্থী সন্ন্যাসীরা যখন তাদের ইষ্টদেবতা শিবের স্তোত্র গান করিয়া বেড়াইতেছে, তখন বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া যন্ত্ররাজ বিভূতির ও তার যন্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।"

"কেউ কেউ তাকে মহৎ প্রতিভাশালী স্থির করিয়া প্রশংসা করিতেছে এবং তার যন্ত্রের মহিমা গান করিতেছে। অন্যেরা আবার তাকে তুচ্ছ করিতে চেষ্টিত, এবং বাঁধ বাঁধিতে যে কত লোক প্রাণ দিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধ। রাজবাড়ীর কেউ কেউ বিভূতিকে শিবতরাই-এর লোকেদের সর্বনাশ করিয়া মুক্তধারা একেবারে রুদ্ধ করা হইতে বিরত করিতে চেষ্টিত। কিন্তু এদের চেষ্টা তেমনি বিফল হইল, যেমন হইয়াছিল রাজার কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে আগত শিবতরাই-এর লোকদের আবেদন।"

"কিন্তু রাজা সবচেয়ে বড় বাধা পাইলেন যুবরাজ অভিজিৎ হইতে। এই কুমার বিশ্বমানবের বিচক্ষণ বন্ধু। তিনি এই কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না যে উত্তরকূট রাজ্যের রাষ্ট্রনীতির কাছে শিবতরাই-এর সকল প্রজাকে বলি দেওয়া যাইতে পারে।"

"যুবরাজ অভিজিৎকে তাঁর পিতা রাজা রণজিত এই অধীন দেশ শিবতরাই এর শাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অভিজিৎ যখন বিজেতা রাজার প্রতিনিধিরূপে সে দেশে ছিলেন, তখন তিনি স্বদেশবাসীর স্বার্থ অপেক্ষা সেই দেশবাসীর হিতসাধনেই অধিক চেষ্টিত ছিলেন। এজন্য নন্দীসংকটের অবরুদ্ধ পথ খুলিয়া দিয়া তিনি বাণিজ্য চলাচলের সুবিধা করিয়া দেন। এই পরাধীন দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্যের তাহাতে সুবিধা হইয়াছিল যথেষ্ট, কিন্তু বিজেতা উত্তরকূটের তাতে পরধন অপহরণে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল।"

"যুবরাজ এই সংবাদ জানিবার পর অনুভব করিতে লাগিলেন তিনি যেন

অবাধ ব্যগ্রগতি মুক্তধারার সন্তান। সেই জলধারা তাঁকে মুগ্ধ আকৃষ্ট করিল। সেই জলধারা ও নিজের মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্কের টান তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। সুতরাং মুক্তধারার প্রাণ ও স্রোতগতি যেন তাঁর নিজেরই জীবনধারা বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। এবং সেই মুক্তধারার অবাধ জলস্রোতের আশীর্বাদ সর্বমানবের উপভোগ্য করিয়া রাখাই তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

"রাজা রণজিতের আদেশে যুবরাজ বন্দী হইলেন ; রাজা মনে করিয়াছেন যে শাস্তির ভয়ে অভিজিতের স্বভাব সংশোধিত হইবে। এদিকে উত্তরকূটের জনসংঘ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ; যুবরাজ অভিজিত শিবতরাই এর লোকদের পক্ষ হইয়া স্বদেশের বিপক্ষতা আচরণ করিতেছেন বলিয়া কেউ কেউ তাঁকে শাস্তি দিতে উগ্র হইয়া উঠিয়াছে ; কেউ কেউ তাঁকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক। অবশেষে বন্দীশিবিরে আগুন লাগাইয়া কুমার অভিজিতের মুক্তির সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। মুক্তি পাইয়া কুমার নিজের সংকল্পিত কর্তব্য পালনের জন্য যাত্রা করিলেন।

"তিনি গোপনে বাঁধের উপরে যন্ত্রকে আঘাত করিয়া রুদ্ধ জলধারা মুক্ত করিয়া দিলেন ; মুক্তিপ্রাপ্ত জলধারা বেগে প্রবাহিত হইয়া যন্ত্রকে ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। যুবরাজও তাঁর এই বীরব্রতের উদ্‌যাপনে মৃত্যু লাভ করিলেন—তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। রুদ্ধ জলধারা মুক্ত করিয়া তিনি নিজের মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি আপনার জননী মুক্তধারার কোলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

"যুবরাজ অভিজিতের শোচনীয় পরিণাম সমস্ত নাটকটির রূপক বুঝিবার চাবি। মানবের প্রগতি ও উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানুষ সংকীর্ণতা ও স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে যখন মানবসমাজের নেতৃস্থানীয় অসামান্য লোকেরা বৈষয়িকতা বর্জন করিয়া নিজেদের আদর্শের জন্য প্রাণপাত পর্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করেন না। এই নাটকটির মধ্যে কয়েকটি ঘটনাতেই একটি সংকীর্ণ পরপীড়ক ক্ষণিক সুখকর স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ও মানবভ্রাতৃত্বের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

"যথা, সুলভ স্বাদেশিকতার প্রতিভূ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই রাষ্ট্রভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে এক গুরুমহাশয় ও তার ছাত্রদল। গুরুমহাশয়

তার পোড়োদের এক বিকট বাগাড়ম্বরপূর্ণ রাজ্যপ্রশস্তি মুখস্থ করাইয়াছে, উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া লওয়া। সে ছাত্রদের মনে শিবতরাইএর লোকদের সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ও বিরাগের ভাব সঞ্চার করাইয়াছে, কারণ,—'ওদের ধর্ম খুব খারাপ' এবং মানবসমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত উত্তরকূটের লোকদের মতন তাদের নাক উঁচু নয়। অতএব তারা নিশ্চয়ই 'খুব খারাপ'। অতি আগ্রহের বশে গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে শিখাইয়াছে যে জগতের সকল ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত জগতে উত্তরকূটরাজবংশের চক্রবর্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সে ইহাও বুঝাইতেছে যে রাজা রণজিতের রাজবংশের নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অন্যের উপর অত্যাচার করার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে এবং উহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

"এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁর শিক্ষা তেমন সফলও হয় নাই, লোকে ভালো করিয়া বুঝেও নাই; কিন্তু তিনি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টিত যে অশুভ অকল্যাণ সহ্য করিয়াই প্রতিকার করিতে হইবে যাহাতে তারা আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায় অশুভের প্রতিরোধে অশুভ অনুষ্ঠানে, অত্যাচারের প্রতিরোধে অত্যাচারে নূতন নূতন অকল্যাণেরই সৃষ্টি হইতে থাকে।

"ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ভারতের বর্তমান জাতীয় নেতা সম্প্রতি বন্দী মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সামান্য কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু কবি নিজে একটি টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র ও তাঁহার উক্তি কবির ১৫ বৎসরের পুরাতন নাটক প্রায়শ্চিত্ত হইতে পুনর্গৃহীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নাটকখানি এইরূপ গভীরভাব-দ্যোতক ঘটনায় ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ ঐশ্বর্যশালী। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের গদ্য কথার মধ্যে কবিত্বময় গদ্যচ্ছন্দের গানও ছড়ানো আছে।

"ভারতীয় জীবনে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় মুক্তধারা নাটক ভারতে সুস্পষ্ট আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হইবে নিশ্চয়। রংগমঞ্চে এর সফলতা কতদূর হইবে তাহা কেবল অনাগত ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করিতে পারিবে।"

শ্রাবণ, ১৩২৯

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর সংস্থিতিপত্র (constitution) ছাপা হইয়া রেজিস্ট্রী হইয়া গিয়াছে। ইহার কাজ আগে হইতেই চলিতেছিল, এখন সংস্থিতি অনুসারে চলিতে থাকিবে।

"জাতীয় শিক্ষা" কথা দুটি নানা জনে নানা অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু যিনি যে অর্থেই করুন, সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে অন্ততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ না থাকিবে। আমাদের দেশের বাবু লোকেবা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিকে লইয়াই জাতি গঠিত ত নহেই। যাহারা চাষ করিয়া কুলি মজুরের কাজ করিয়া বা কোন প্রকার কারিগরী মিস্ত্রীগিরি করিয়া খায় তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারেনা। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও বিশ্বভারতীতে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম্য জীবনের ও জীবিকার সহিত সম্পর্ক আছে। এখানে চাষ ও কয়েক প্রকার কারিগরীর কার্যগত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে আষাঢ়ের 'শান্তি-নিকেতন পত্রিকা' হইতে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুরুলে বিশ্ব-ভারতীর কৃষি বিভাগে চর্মশিল্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। "ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান কুলদাপ্রসাদ সেন এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। নিকটবর্তী মৌদপুর গ্রামের তিনজন মুচিও বিশেষ আগ্রহের সহিত একমাস শিক্ষালাভ করিয়া এই কাজে পাকা হইয়াছে। বর্তমানে কৃষি বিভাগে বারোটি ছাত্র আছে। তাহাদের প্রত্যেককে নিজেদের স্বতন্ত্র জমি দেওয়া হইয়াছে। সেই জমি তাহারা নিজেদের হাতে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিনেবাদাম, বিলাতি বেগুন, বরবটী ও মুলার বীচি লাগাইয়াছে, ছুতারের কাজেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি ছাত্রেরা নূতন বৃষ্টি পাইয়া কয়েকদিন চাষের কাজে ব্যস্ত আছে। তাহাদের জমির কাজ একটু কমিলেই তাহারা অন্যান্য কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে।"

ছাত্রেরা পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল ও অন্যান্য সাধারণ লোকদিগকে লেখাপড়া ও অন্যান্য শিক্ষা দিয়া থাকে, এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষের লোকদের সাধনায় শ্রমে ও প্রতিভায় যে যে বিদ্যা ও যেরূপ সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোন শিক্ষা প্রণালী জাতীয় হইতে পারে না। বিশ্বভারতীতে এরূপ যোগ আছে।

আমাদিগকে সমুদয় মানবজাতির সহিত যোগ রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে ও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। বিশ্বভারতীতে এই আদান-প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। ইহা এই প্রতিষ্ঠানের যেমন জাতীয় দিক, তেমনি আন্তর্জাতিক দিকও বটে। ভারতবর্ষকে বাহির হইতে এখন বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান এবং তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়েও যে দৃষ্টি আছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"গ্রীষ্মকালে এখানে বড় জলাভাব হয় বলিয়া আশ্রমে দেড়শ ফুট এবং সুরুলে প্রায় দু'শ ফুট মাটী মৃত্তিকাভেদন যন্ত্রের সাহায্যে খনন করা হইয়াছে। কিন্তু নীচে পাথরের মত শক্ত মাটী বলিয়া কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। খনন করিবার যন্ত্রটি দিবারাত্রি চালাইবার জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই অক্লান্ত ভাবে দিনরাত্রি কাজ করিয়াছিলেন।" নানা ভাষার পুস্তক সংগ্রহ বিশ্বভারতীতে যেমন হইতেছে, এমন ভারতের আর কোথাও হইতেছে কিনা সন্দেহ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

"টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনাসাকী কয়েকখানি বহুমূল্য চীনা ও জাপানী পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

সাংহাই হইতে আমরা সমগ্র চীন ত্রিপিটক (প্রায় চারশত গ্রন্থ) উপহার পাইয়াছি। ফরাসী দেশ হইতে বিশ্বভারতীর বন্ধুগণ বর্তমান ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক পাঠাইয়াছেন।

জার্মানীতে গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে যে পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল সেগুলিও হ্যম্বুর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীতে জৈন সাহিত্য ও ধর্ম আলোচনার জন্য জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ বোথরা কলিকাতার শ্রীযুক্ত পুরনচাদ নাহার ও তদীয় পুত্র শ্রীমান্ পৃথী সিং এবং ভাওনগর কাঠিবারের 'যশোবিজয় গ্রন্থমালার' প্রকাশক অনেকগলি জৈন গ্রন্থ দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।"

তদুপরি অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি, ডক্টর কুমারী ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ, অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাবেশ।

এখানে অন্যান্য স্কুল কলেজের মত সাধারণ শিক্ষিতব্য বিষয়ও শিখান হয়। অধিকিন্তু সংগীত ও চিত্রবিদ্যা শিখান হয়।

চৈত্র, ১৩২৯

সফরে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর অর্থসংগ্রহের জন্য ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একটি সভায় তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। অযোধ্যার তালুকদারদের পক্ষ হইতে রাজা রামপাল সিংহ বিশ্বভারতীতে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

করাচীতেও রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে। করাচীর মিউনিসিপ্যালিটি এই অভ্যর্থনার জন্য দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। (দেশবিদেশের কথা)

কার্তিক, ১৩৩০

বিশ্বভারতী সংবাদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর সমস্ত বাংলা পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। তাঁহাব পুস্তকের সংখ্যা দেড়শতেরও উপর হইবে। ঠাকুর মহাশয়ের সমস্ত বাংলা বই কলিকাতায় ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বিশ্বভারতী কার্যালয়ে বিক্রয় হইবে। এই গ্রন্থাগারের সংলগ্ন একটি পাঠাগারও খোলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের যে কোন বই ঐ পাঠাগারে গিয়া পাঠ করার সুবিধা থাকিবে।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি কারিগরী বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেই বিভাগে বই বাঁধানো, গালারকাজ, কাপড়-বোনা, কাঁথা সেলাই, কাঠের ও মাটির খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি কাজ শিখানো হইতেছে। এ বিভাগের

পরিচালন ভার প্রধানতঃ মহিলারাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিভাগের সমস্ত কাজের নমুনাও বিশ্বভারতীর উপরিউক্ত কলিকাতার কার্যালয়ে পরিদর্শনের জন্য রাখা হইবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

বিশ্বভারতী নারীবিভাগ

আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য পাইয়াছি :—

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত নারী বিভাগ হইতে স্ত্রী-লোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত, চিত্রকলা, বস্ত্রবয়ন এবং বই বাঁধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া চলিতেছে। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগী পরিচর্যা, শাকসব্জী, ফুলফলের বাগান তৈয়ারী, বিজ্ঞানবিহিত গৃহকর্ম-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীরা পারদর্শিতা লাভ করে, ইহা আমাদের ইচ্ছা। নানা কারণে পুরুষ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা নিয়মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংকীর্ণ পথে বিদ্যা উপার্জন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের নারীদের পক্ষে এ সম্বন্ধে অবশ্যবাধ্যতা নাই। এজন্য বুদ্ধি চরিত্র কর্মপটুতা ও সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উদারভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাধা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই সুযোগ আছে বলিয়া ভরসা করি, নারীশিক্ষায় আগ্রহবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যথোচিত আনুকূল্য পাইলে দেশবিদেশ হইতে উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শের নারী শিক্ষালয় গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য হইব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে এককালীন বা বার্ষিক দান প্রার্থনা করিতেছি ; আশা করি আমাদের আবেদন বিফল হইবে না। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

আচার্য ভিন্‌তার্‌নিৎস

প্রাগ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাক্তার ভিন্‌তার্‌নিৎস এত দিন বিশ্বভারতীতে ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাতে সকলে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যে সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে সম্প্রতি তাঁহার বিদায় গ্রহণে তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রমণ্ডলীর সকলের বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা বিশেষ রূপে বোধ হইয়াছে।

বিদায়কালে কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে বিদায়লিপি দিয়াছেন তাহার একস্থানে আছে, "আপনার চরিত্রের প্রতি আমাদের ভালবাসা, আপনার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সমান হইয়া উঠিয়াছে।" আচার্য ভিন্‌তার্‌নিৎস উত্তরে বলেন, "প্রসিদ্ধ কবি গেটে বলিয়াছেন, 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে আর বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারা যাইবেনা'। আমি বলি প্রাচ্যও প্রতীচ্য কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিল না।

"১৯২১ খৃঃ অব্দে আপনি যখন আমাদের দেশে বক্তৃতা দিতে যান তখন আমি আমার বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলাম, 'আপনার বক্তৃতার সাফল্য দেখিয়া আমার মনে হয় যে কোন না কোন সমস্ত পৃথিবী, কবি ও আদর্শবাদীর সহিত সায় দিয়া দাঁড়াইবে।'

"তখন আমি ভাবি নাই যে দুই-বৎসর পরেও পৃথিবীর অবস্থা আমার আশা পূর্ণ হইবার পথে এতটা অন্তরায় হইয়া থাকিবে।

"আমার মনে হয় যে আদর্শ যাহা তাহাই শুধু সত্য, তাহাই শুধু চিরস্থায়ী হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিলেই জগত উদ্ধার হইবে না। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা মিলিলে তবেই জগতের মংগল। কয়েক বৎসর পূর্বে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় একজন লিখিয়াছিলেন, 'কোন কোন মহাত্মা পূর্ব পশ্চিমের মতামত বিনিময় স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাহাতেই যে নিশ্চয় উপকার হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অসভ্যতার সহিত অসভ্যতা মিলিলে ফলে অসভ্যতাই হয়।' কথাটি সত্য।"

"আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। আমি জানি এদেশেও ইউরোপের মতন

অসভ্য পাশবিকতা আছে। ভারতীয় সাহিত্যে, ভারতীয় ধর্মে, ভারতীয় অন্যান্য ব্যাপারে আবর্জনা কিছু নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাই বলি—এই সকল আবর্জনা আবর্জনার টিনে ফেলিয়া দাও এবং ভালটুকু রাখ। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ যা কিছু তাহাই রাখা হউক, তাহা না হইলে পাশ্চাত্য আবর্জনার সহিত ভারতীয় আবর্জনা মিলিয়া এক বিরাট আবর্জনার সৃষ্টি হইবে।" আচার্যের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার কথা।

পৌষ, ১৩৩০

রবীন্দ্রনাথের সফর

বহু সামন্ত রাজার নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। গত ১২ই নভেম্বর তিনি রাজকোটের দরবার গৃহে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহুলোক স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। ধ্রাংগধ্রার মহারাজা ২৫,০০০; পোরবন্দরের মহারাজা ২০,০০০; মাভির ঠাকুর সাহেব ১০,০০০ দান করিয়াছেন। গত ২৮শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ জামনগরে পেঁীছিয়াছেন। জামসাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বিশ্বভারতী ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা দান করিবেন। এ পর্যন্ত বিশ্বভারতী ভাণ্ডারে ১৩৫,০০০ টাকা উঠিয়াছে

(দেশবিদেশের কথা : শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়)

বৈশাখ, ১৩৩১

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ

আজকাল স্কুলের ছেলেরাও জানে, যে, পুরাকালে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এশিয়া মহাদেশের মধ্যে, পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইয়াছিল। এখনও তাহার নিদর্শন অনেক দেশের ও দ্বীপের প্রাচীন মন্দিরাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রমাণ সাধারণ লোকেরাও বুঝিতে পারে। পণ্ডিতবর্গ আরও প্রমাণ ঐসব দেশের ধর্ম, সাহিত্য, নানাবিধ শিল্প এবং আচার ব্যবহার হইতেও আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রধানতঃ

বৌদ্ধভিক্ষু ও শিক্ষকগণ ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা এশিয়ায় বিস্তার করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সহিত এশিয়ার অন্যদেশগুলির সম্বন্ধ থাকায় কেবল যে তাহারাই উপকৃত হইয়াছিল, তাহা নয়; ভারতবর্ষেরও উপকার হইয়াছিল।

বহুশতাব্দী পরে একজন ভারতীয় মনীষী চীনদেশে ভারতের বাণী প্রচার করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। পেকিং বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে তথায় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিয়া আপনাদের হৃদয় মনের উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। যে জাতি অন্য জাতিসকলের মধ্যে যত বেশী পরিমাণে সাধারণ মানবত্ব দেখিতে পাইয়া নিজ আচরণ দ্বারা তাহা স্বীকার করে, সে জাতি তত শ্রেষ্ঠ। উদারভাবে নানা মত, আদর্শ, ও সভ্যতার আলোচনা করিয়া তাহার সার অংশ নিজের করিয়া লইতে পারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। কোন মানুষ যদি পরিচিত অপরিচিত আগন্তুকদিগকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়া তাঁহাদের যথোচিত আদর যত্ন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা অতিথি-পরায়ণ বলি ও তাঁহার আতিথেয়তার প্রশংসা করি। সেইরূপ যে জাতি নানা মত চিন্তা ভাব আদর্শ প্রভৃতির জন্য মনের দ্বার খুলিয়া রাখে, তাহার মানসিক আতিথেয়তা আছে বলিয়া আমরা প্রশংসা করি।

পৃথিবীর মধ্যে এখনও দুইটি বড় দেশে পর-মত সহিষ্ণুতা, পরমত সম্বন্ধে ঔদার্য এবং মানসিক আতিথেয়তা বিশেষভাবে বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ ও চীন সেই দুইটি দেশ। ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া, স্বতঃ কিংবা তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায়, হয় বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা জোর করিয়া বলা যায়, যে, এ দেশে যে পরিমাণ পর-মত সহিষ্ণুতা আছে, চীন ছাড়া অন্য কোন বড় দেশে তাহা নাই। 'সভ্য' ইউরোপের অবস্থা দেখুন। স্পেনে মুসলমান ধর্ম ছিল, কিন্তু স্পেনের খৃষ্টিয়ানরা তাহাকে নির্মূল না করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। মুসলমানরা তাড়িত হইয়াছে (এবং তাহাদের জন্য অর্থ ভিক্ষা-করিতে তুর্ক প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে আসিয়া ছিলেন), তুর্কের অধীনস্থ স্থান-সকল হইতে খৃষ্টিয়ান গ্রীকেরা তাড়িত হইয়াছে। বহুবৎসর ধরিয়া এই কথা বারবার শোনা গিয়াছে, যে, খৃষ্টিয়ানেরা ম্যাসিডোনিয়ার মুসলমানদিগকে নির্মূল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং মুসলমানেরা আর্মেনিয়ায় খৃষ্টিয়ান-দিগকে নির্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

চীনে কংফুচের ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, 'তাও' ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টিয়ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, এবং নানা আদিম পার্বত্য জাতিসকলের প্রকৃতি-পূজা ধর্ম প্রচলিত আছে। অধিকাংশ চীন (যাহারা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান নহে) কংফুচের ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং "তাও" ধর্ম তিনটিই মানে। "তাও" ধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষেও প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে পরস্পরের প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই দুটি দেশের মধ্যে অতীতকালে যে হৃদয় মনের যোগ ছিল, আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহা পুনঃ স্থাপিত হইলে এক নূতন যুগের আরম্ভ হইবে, বলা যায়। এইরূপ যোগের তুলনায় রাজনৈতিক সন্ধি ও বুঝাপড়া অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। চীন ভাষায় এখনও ভারতীয় নানা গ্রন্থের অনুবাদ আছে। তাহার সবগুলির মূল এখন বর্তমান নাই। তদ্ভিন্ন চীনের সাম্রাজ্যিক লাইব্রেরীতে বহু সংস্কৃত পুঁথি আছে। এইসব অনুবাদের ভারতীয় অনুবাদ এবং সংস্কৃত পুঁথিগুলির মুদ্রণ একান্ত আবশ্যক।

গত কয়েক বৎসরে চীনের আশ্চর্য মানসিক জাগরণ হইয়াছে। যে পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটিতে ইউরোপের অনেক শতাব্দী লাগিয়াছে, চীনে এক পুরুষের মধ্যে, কোন কোন বিষয়ে দশ বৎসরের মধ্যে, তাহা ঘটিতেছে।

আমাদের দেশে এই সেদিন রবিবাবুর বিদায়সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে একটা আজব চীজ্ স্বরূপ রেডিও দ্বারা গান শুনাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। চীনে বহুবৎসর হইতে ব্যবসা বাণিজ্যে পর্যন্ত রেডিওর ব্যবহার চলিত হইয়াছে। চীনেরা অবিচারিত চিত্তে পাশ্চাত্য যা-তা লইতেছে না; সবই সমালোচক ও বিচারকের দৃষ্টিতে পরখ করিয়া লইতেছে। প্রতিবৎসর হাজার হাজার চীন ছাত্র নানা দেশে বিদ্যা লাভার্থ যাইতেছে। এখন চীন দেশে কোথাও কোথাও অশান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব আছে বটে; কিন্তু তাহা কাটাইয়া উঠিয়া উহার অধিবাসীরা মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে বলিয়া আশা আছে। এ-হেন দেশের সহিত ভারতের হৃদয়মনের যোগ বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ চীন ছাড়া জাপান, বলী দ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও যাইবেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

"চীনে রবীন্দ্রনাথ"

সংবাদপত্রপাঠকেরা চীনে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনার কথা অবগত আছেন। তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের আদর যত্ন খুব হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ১লা বৈশাখ তারিখের একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—

"বেশ মনে হচ্ছে, এদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হবে। [বিধুশেখর] শাস্ত্রী মহাশয়কে এখানে পাঠান দরকার আছে। আমাদের প্রস্তাব শুনে এরা ভারি খুসী হয়েছে। এরাও এখান থেকে অধ্যাপক পাঠাতে সম্মত আছে। তাহলে বিশ্বভারতীতে চীনীয় ভাষা শেখ্‌বার সুব্যবস্থা হবে। চীনীয় থেকে হারান সংস্কৃত বইয়ের তর্জমারও সুবিধা হতে পারবে।"

"বোধ হয় মে মাসের শেষ পর্যন্ত আমাদের এখানকার পালা। তারপরে জাপানে জুনের মাঝামাঝি। তারপর জাভা, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি শেষ করতে জুলাই আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লাগতেও পারে। তারপরে দেশে ফিরবো, এইরকম আন্দাজ করছি।"

বিশ্বভারতীর কৃষি ও গ্রাম সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ এল্মহার্ষ্ট্ সাহেবের একখানি চিঠিতে দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হু সু, চু, এবং চাঙ্ নামক তিনজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি শাংখাই আসিয়াছিলেন। এল্মহার্ষ্ট মহোদয় লিখিয়াছেন—"গুরুদেব হু সুকে পাইয়া ভারি খুসী। হু সু বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকিবেন এবং আশা করি ভারতবর্ষ পর্যন্ত যাইবেন; যদি আমরা বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে চু মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ যাইবেন।"

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের পুরস্কার।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে দুইশত শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয় পাঁচটি পুরস্কার দিবেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনের পাতায় ছাপা হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সমুদয়

কবিতা পড়িয়াছেন, এবং কবিতার উৎকর্ষ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের নির্বাচনই উৎকৃষ্ট হইবে। যাঁহারা সমস্ত কবিতা পড়েন নাই, তাঁহাদের পক্ষেও পড়িয়া নির্বাচন করিবার যথেষ্ট সময় আছে। যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাও আর একবার পড়িলে ঠিক্ নির্বাচন করিতে পারিবেন। নির্বাচনের কাজ কঠিন বটে, কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে যত কঠিন মনে হইতে পারে, ততত কঠিন নহে। কোনও পুস্তক বা কবিতাকে কেন ভাল মনে করি, তাহার ঠিক সমুদয় কারণ নির্দেশ করা খুব কঠিন, কিন্তু কোন্ কোন্ পুস্তক বা কবিতা আমাদের ভাল লাগে তাহা বলা কঠিন নয়। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসগ্রাহীদিগকে বস্তুতঃ ইহাই বলিতে আহ্বান করিতেছেন, যে, কোন্ দুই শত কবিতা তাঁহাদের ভাল লাগে। পুরস্কার পাওয়া অপেক্ষা বেশী লাভ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভ। অধ্যয়ন-অভ্যাসের গুণই এই, যে, আমাদের সুবিধা মত অল্প বা অধিক সময়ের জন্য আমরা ঘরে বসিয়া যে-কোন মহৎ লোকের সঙ্গলাভ করিতে পারি। মহৎ লোকদিগকে চাক্ষুষ দেখা ও তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহার আনন্দ লোভের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ আরও আনন্দের ও লাভের বিষয়। কারণ, তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের—ভাবচিন্তা আদর্শ রসিকতা আদির—শ্রেষ্ঠ অংশ আমরা নিবদ্ধ দেখিতে পাই, যাহার পরিচয় কোন এক সময়ে, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া আমরা না পাইতেও পারি। এই জন্য মনে হইতেছিল, যে, রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য থাকিলেও, যদি অবসর পাইতাম তাহা হইলে পুরস্কার লিপ্সা ব্যপদেশে তাঁহার সমুদয় কাব্য পড়িয়া ফেলিতাম ; রবীন্দ্রনাথ এক নহেন, অনেক ; তন্মধ্যে বরেণ্যতম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে আনন্দিত হইতাম, উন্নত হইতাম, অনুপ্রাণিত হইতাম, মনের ময়লা কাটিত, প্রাণে নূতন প্রেরণা নূতন শক্তি আসিত। কিন্তু কর্মফল ও কর্ম-বন্ধ বশতঃ কোন মহদ্ব্যক্তির এইরূপ নিভৃত সঙ্গ-লাভ ইহ জীবনে আর ঘটিবে কিনা, সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। যাঁহারা অধিকতর সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা হৃদয়মনের এই ভোজের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবেন না।

আশ্বিন, ১৩৩১

বিশ্বভারতী

বোলপুরের সন্নিহিত শান্তিনিকেতন পল্লীতে চব্বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ছাত্র লইয়া ব্রহ্মচর্য-আশ্রম স্থাপন করেন। ইহা এখনও চলিতেছে।

ইহার উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী। ইহার জন্য প্রতিষ্ঠাতা কখন কোন সরকারী সাহায্য চান নাই, উপযাচক হইয়া দিতে চাহিলেও গ্রহণ করেন নাই। ইহার শিক্ষা প্রণালী ও অপরাপর বন্দোবস্তও প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত। ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে সেই প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেহ যদি সরকারী পরীক্ষা দিতে চায়, অধ্যাপকগণ তাহাকে সাহায্য দেন মাত্র; কিন্তু আশ্রমের ব্যবস্থা কোন সরকারী পরীক্ষা পাস্ করাইবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। এখন ইহা বিশ্বভারতীর অংগীভূত হইয়াছে। তাহাও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে, ইহা যদিও বেসরকারী এবং সর্বপ্রকারে কল্যাণকর এবং যদিও ব্রহ্মচর্য আশ্রমকে ছাত্রশূন্য করিবার সরকারী চেষ্টাও এক সময়ে হইয়া গিয়াছে। তথাপি, ইহার সহিত কোন রাজনৈতিক চীৎকার ও হুজুক জড়িত নাই বলিয়া, ইহা বংগের ধনী, মধ্যবিত্ত ও নির্ধনদের দৃষ্টি ভাল করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহার ব্যয়নির্বাহ রবীন্দ্রনাথ প্রায় একাই করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে যে অল্পস্বল্প টাকা বিশ্বভারতী পাইতেছেন, তাহাও বাংলা দেশের বাহির হইতে। কেহ বিশ পঞ্চাশ এক-শ দু-শ টাকা দান করিলেও তাহার একটা খবর অনেক কাগজে পাঠান হয়। রবিবাবুর সেরূপ প্রবৃত্তি না থাকায় তাঁহার ত্যাগের পরিমাণ ও ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিয়া গিয়াছে। লোকে এখনও মনে করে, তিনি ধনী জমিদার, নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, বহি বিক্রীর আয় আছে,—তাহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা চান কেন? তিনি যে তাঁহার যথাসাধ্য দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহার বেশী তাঁহার সাধ্যাতীত সে খবরটা লোকের জানা নাই।

আমরা সব জানি না, কিছু জানি। কিন্তু যাহা জানি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, বিশ্বভারতীর টাকার খুব দরকার আছে, এবং টাকার যাহাতে সদ্ব্যয় হয় তাহার মত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

ইহার প্রতি সর্বসাধারণের কর্তব্য তো আছেই। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের কর্তব্য আরও অধিক পরিমাণে আছে।

আশ্বিন, ১৩৩১

লর্ড লিটনের দ্বিতীয় চিঠি

রবি-বাবুর প্রথম চিঠির উত্তরে লর্ড লিটন যে-চিঠি লেখেন, কবি তাহা সন্তোষজনক মনে না করায় তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া ছিলেন। তাহার উত্তরে লিটন যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় সন্তোষজনক না হইলেও, আমরা এ বিষয়ে বেশী কিছু লিখিতে অনিচ্ছুক। তাহার কারণ, লিটন্ সাহেব তাঁহার প্রথম চিঠিতেই ভারতীয় নারীদের উচ্চ প্রশংসা অকপটে করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি সরলভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এই আশা করিয়াছেন, যে, ব্যাপারটির যেন এইখানেই পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু একটা কথা না বলিলে আমাদের সম্পাদকীয় কর্তব্য করা হইবে না বলিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি।

রবিবাবু তাঁহার দ্বিতীয় চিঠিতে লিখিয়াছিলেন:—

"...a considerable number of my country men,...are ready to challenge your government to trustworthy evidence in support of your statement even about those rare cases of a patricular type of conspiracy against public officials".

তাৎপর্য—"আপনি সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-রকম ষড়যন্ত্রের বিরল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, আমার স্বদেশবাসীদের অনেকে আপনার গবর্ণমেণ্টকে সেরূপ বিরল মোকদ্দমারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য আহ্বান করিতে প্রস্তুত।" শিষ্টভাষায় লিখিত চিঠিতে ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট "চ্যালেঞ্জ" হইতে পারে না। রবিবাবুর কথাটা খবরের

কাগজের ভাষায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়—"আপনি বলিতেছেন যে, ওরূপ ঘটনা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সংখ্যা কম। ভারতীয় বিস্তর লোক বলিতেছেন, আমরা ওরূপ একটি ষড়যন্ত্রেরও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অস্তিত্ব অবগত নহি। আপনি যে অল্পসংখ্যক ঘটনার কথা জানেন বলিতেছেন, তাহার অন্ততঃ একটারও প্রমাণ উপস্থিত করুন। যদি না পারেন তো, আপনার কথা প্রত্যাহার করুন!" লাটসাহেব একটিরও প্রমাণ দেন নাই—সম্ভবতঃ এইজন্য যে, সেরূপ কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই; অথচ তিনি তাঁহার কথা প্রত্যাহারও করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন, "Incidents which must be familiar to almost every judicial authority", "প্রায় প্রত্যেক বিচারকের নিকট এরূপ ঘটনা সুপরিচিত।" আগে বলিয়াছিলেন, ওরূপ ঘটনা বিরল; এখন হইয়া গেল প্রায় প্রত্যেক বিচারের নিকট সুপরিচিত! কিন্তু প্রমাণ তো একটারও দিতে পারিলেন না। এইজন্য বলিতেছি তাঁহার জবাব সন্তোষজনক নহে।

লাটসাহেব তাঁহার চিঠিতে এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—"I would conclude…with an appeal to all those who desire to maintain the credit of the police force in Bengal to refrain from vilifying the force as a whole and to assist me in my efforts to purge it of the defects the existence of which I have never denied." তাৎপর্য—"যাঁহারা বঙ্গের পুলিস কর্মচারীদের সুখ্যাতি রক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ জানাইয়া চিঠি শেষ করিতেছি, যে, তাঁহারা পুলিস কর্মচারী মাত্রেই খারাপ, এরূপ নিন্দা হইতে নিবৃত্ত হউন, এবং পুলিসের যে-সব দোষ-ত্রুটির অস্তিত্ব আমি কখনও অস্বীকার করি নাই, তাহা দূর করিতে আমাকে সাহায্য করুন।"

বিশেষ-বিশেষ ঘটনার বৃত্তান্ত দিয়া পুলিশের বিশেষ বিশেষ দোষ লাট সাহেবকে দেখাইয়া দিতে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ পারেন, আরও অনেকে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহা করিতেও পারেন; কিন্তু ফল কিছু হইবে কিনা সে-বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে।

কার্তিক, ১৩৩১

রক্ত করবীর ইংরেজী সংস্করণ

অনেক সময় একই জিনিষ দুই ভাষাতে লিখিত হইলে লেখকের বক্তব্য বুঝিবার অধিকতর সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের "রক্ত করবীর" একটি ইংরেজি সংস্করণ তিনি নিজেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা ইংরেজী "বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক" বিশেষ শারদীয় সংখ্যারূপে বিশ্বভারতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা দুখানি দুই রঙের ও আটখানি এক রঙের ছবি আছে। শান্তিনিকেতনের হাসপাতাল ফণ্ডের সাহায্যার্থ ইহার মূল্য তিন টাকা রাখা হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

গল্প নির্বাচনের জন্য পুরস্কার

"বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়" বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, রবিবাবুর ছোট গল্পের বই গুলি হইতে ১৫টি ছোটগল্প নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য তিনটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রবিবাবু নিজে একটি তালিকা করিয়া দিয়াছেন। সেই তালিকাভুক্ত গল্পগুলির নামের সঙ্গে যাঁহাদের তালিকার নামগুলি ঠিক মিলিয়া যাইবে, কিম্বা অনেকটা মিলিবে, তাঁহারা মিলের পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার পাইবেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি হইতে উৎকৃষ্টতম কবিতা সমূহ বাছিয়া দিবার জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তখন আমরা যে-মর্মের কথা বলিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ বলিতেছি ;—নির্বাচন উপলক্ষে কবির গল্পগুলি নূতন করিয়া পড়িবার আনন্দ ও উপকার লাভই আসল লাভ, পুরস্কারটা আনুষঙ্গিক উপরি পাওনা মাত্র। সুতরাং পুরস্কার যদিও তিনটি, কিন্তু আসল পুরস্কার যাহা তাহা নির্বাচক মাত্রেরই হইবে।

ইহার মধ্যে একটা কৌতুহলের বিষয়ও আছে। রবিবাবু কোন গল্প-গুলিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহা জানিবার ইচ্ছা পাঠকদের হওয়া স্বাভাবিক।

পিতামাতার স্নেহ কেবল কৃতী গুণবান সন্তানের উপরই পড়ে না, অকৃতী অক্ষমের উপরও বিশেষ করিয়া পড়ে।

মানবসন্তানের সম্বন্ধে কবিদের মমতা এইরূপ উভয় দিকে ধাবিত হয় কিনা, অকবিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহাদের গল্পের তালিকার সহিত রবিবাবুর তালিকার বেশী গরমিল হইবে, তাঁহারা এই মনে করিয়া কৌতুক অনুভব ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারবেন, যে, কবি তাঁহার মানস সন্তানদের সম্বন্ধে কেবল গুণ-অনুসারে বিচার করিতে পারেন নাই, হয়ত জনক-জননীসুলভ দুর্বলতাও আছে! আমরা যখন এই নির্বাচন পুরস্কারের কথা শুনিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম 'লিপিকার' গল্প গুলির মধ্য হইতেও নির্বাচন চলিবে। পরে জানিলাম, "লিপিকা" এখন বাদ দেওয়া হইয়াছে!

"লিপিকার" মত লেখা রবিবাবুর কলম হইতেও আগে বাহির হয় নাই। শুনিয়াছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ গল্প নির্বাচনের পুরস্কার পরে দেওয়া হইবে।

রবিবাবুর ডায়েরী ও "রক্ত করবী"

রবিবাবুর যে ডায়েরী প্রবাসীতে ছাপা হইতেছে তাহার এক জায়গায় তিনি 'রক্তকরবী'তে কি বলিতে চান, তাহার একটু আভাস দিয়াছেন। কিন্তু সমজদার পাঠকেরা অবশ্য তাহাতে মনে করিবেন না, যে, ঐ ইংগিতেই 'রক্ত করবীর' সব অর্থ ও রহস্য নিঃশেষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। কবিকে নিজের কাব্যের ভাষ্যকার হইতে বলিলে বড় বিপদে ফেলা যায়। কবি কাব্য দিয়াই নিষ্কৃতি পাইবার অধিকারী। ভাষ্য রচনার দায়িত্ব অন্যের।

"ভূমি লক্ষ্মী" ও "উপায়"

আরো দু'খানি পত্রিকার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। 'ভূমি লক্ষ্মী' বীরভূম জেলার ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ইহা কয়েক বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়। এখন বিশ্বভারতীর হাতে আসিয়াছে।

"বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে কৃষি সম্বন্ধে যা কিছু চেষ্টা হচ্ছে, তার পরিচয়

এতে থাকবে। আর এই জেলার নানা স্থানে নানা কর্মীরা দেশের কৃষির উন্নতির জন্য যা করছেন তার পরিচয়ও এতে থাকবে। কিসে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই জেলার কৃষি শোধন, উন্নতি করতে পারা যায় তার আলোচনাও এতে থাকবে।"

নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় রবিবাবু লিখিয়াছেন :—

"মানুষের সভ্যতা প্রকৃতির প্রাণপূর্ণ সঙ্গ থেকে যতই দূরে চলে যাবে ততই তার মরণদশা ঘনিয়ে আসবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মানুষ এত কাল বুদ্ধির জোরে ও ব্যবহারের নৈপুণ্যে যে লোকালয় গড়ে তুলেছিল তার সঙ্গে প্রকৃতির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটেনি; তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাই ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু আধুনিককালে কলের রাজত্ব প্রবল ও জটিল হয়ে উঠেচে, তাতে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কেবল ভেদ নয় বিরুদ্ধতা বেড়ে চলেছে। এর সাংঘাতিক ফল আমাদের অন্তরে বাহিরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ পাবেই। এই যন্ত্ররাজক সভ্যতার প্রধান দুর্গ হচ্ছে একালের সহর। যে-পল্লী প্রকৃতির সন্তান তারি প্রাণ শোষণ করে সহরগুলো স্ফীত হয়ে উঠচে। এই শোষণ ব্যাপার মানুষের আত্মঘাতের প্রক্রিয়া।

"মানুষ বিনাশ হতে রক্ষা পেতে যায় যদি তবে তাকে আবার সেবাকুশলা ভূমির আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। সেইখানেই তার স্বাস্থ্য সুখ শান্তি সৌন্দর্য। কিন্তু এতকাল এই ভূমিলক্ষ্মীর সদাব্রত যেখানে ছিল সেই তার অতিথিশালা আজ ভেঙে পড়েচে। বাংলা দেশে যে সাধকেরা তাকে গড়ে তোলবার ভার নিয়েছেন 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকায় তাঁদের বাণী সার্থক হোক।"

প্রথম সংখ্যাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মানভূম প্রভৃতি অনেক অঞ্চলের মৃত্তিকা ও সমস্যা এক রকমের। এই জন্য বীরভূম জেলার বাইরের লোকেরাও ইহা পড়িলে কর্তব্য নির্ণয়ে সাহায্য পাইবেন।

"উপায়" নামক কাগজটি বর্ধমান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা "কৃষি শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য স্বাস্থ্য এবং আর্থিক ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় উন্নতি-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র।" ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা একত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতেও কয়েকটি ভাল প্রবন্ধ আছে, এবং ইহাও বর্ধমান জেলার বাহিরের লোকেরা পড়িলে উপকৃত হইবেন। ইহারও একটি প্রস্তাবনা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া দিয়াছেন।

মাঘ, ১৩৩১

ছাড়া ও গড়া

কেবল বর্জনের দ্বারা দেশ স্বাধীন হইবে, এ ভুল অসহযোগীরা করেন নাই; যাহা বর্জন করিলাম, তাহার জায়গায় নূতন কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এ ধারণাটা তাঁহাদেরও ছিল। যাহা ছাড়া হইল, তাহার স্থান পূরণের জন্য কিছু গড়া চাই, এবং গড়িবার চেষ্টা কিছু হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু যথেষ্ট হয় নাই। সরকারী আদালতের জায়গায় বেসরকারী সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত, সাহায্যে পরিচালিত ও জানিত শিক্ষালয়সকলের জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী কাপড়ের জায়গায় দেশী খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছে;—এমনকি সরকারী উপাধিসমূহ বর্জিত হওয়ায় বেসরকারী "মহাত্মা" "দেশবন্ধু" "দেশভক্ত" প্রভৃতি উপাধির অত্যধিক ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। কখন কখন এইসব উপাধি গালাগালি ও লাঠির জোরে কায়েম রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে।.

কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই, যে, উৎসাহ এবং শক্তি বর্জনের ও বিনাশের দিকে যতটা গিয়াছে, গড়িবার দিকে ততটা যায় নাই। বরং বিরোধের দ্বারাই শক্তি জাগে, এই মন্ত্রেরই সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। বিরোধের দ্বারা এক প্রকার শক্তি জাগে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু এই শক্তির কার্য স্থায়ী হয় না, এবং উহা গঠনের, সৃষ্টির রচনার কাজে প্রযুক্ত না হইয়া বর্জন ও বিনাশেই প্রযুক্ত হয়।

প্রধানতঃ এই কারণে ইতিপূর্বে বর্জনগুলি বন্ধ রাখিয়া বার্দোলীতে কেবল গড়িবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, এবং পরে ত সম্প্রতি অসহযোগ স্থগিতই করা হইয়াছে।

মন্দ যাহা তাহার বিনাশের প্রয়োজন নাই, তাহা ভাঙিবার দরকার নাই, ইহা কেহ বলিবেন না; কিন্তু না গড়িলেও যে চলিবে না, ইহাও মানিতেই হইবে। অসহযোগের যেটা গড়ার দিক, যাহা ব্যতিরেকে জাতির মঙ্গল হইতে পারে না, তাহা নূতন নহে;—অন্ততঃ বাংলা দেশে নূতন নহে। অবশ্য অসহযোগের আইডিয়া অর্থাৎ ধারণা, কল্পনা বা চিন্তাটাও নূতন নহে। উহা গত শতাব্দীতে

অধ্যাপক সীলী তাঁহার একখানা বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন অন্য এক ইংরেজ গ্রন্থকারের বহিতেও উহার আভাষ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ মহাত্মা গান্ধী করিয়াছেন, এবং উহা যে সফল হইতে পারে, তাহারও কিছু প্রমাণ অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও পাওয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম,যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বা প্রতিকূলতার চিন্তা না করিয়া দেশের অত্যাবশ্যক সমুদয় কাজ করিবার ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চিন্তাটা বাংলা দেশে নূতন নহে। কুড়ি বৎসর পূর্বে "স্বদেশী সমাজ," "সফলতার সদুপায়" প্রভৃতি প্রবন্ধে ও তৎপরে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ এই সকল বিষয়ের অত্যাবশ্যকতা পুনঃ পুনঃ দেশের লোকদের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার "সফলতার সদুপায়" নামক প্রবন্ধ হইতে দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।—"সর্ব প্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গল কর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে-অবকাশ পরের দ্বারা কখনই সন্তোষজনরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকী নাই।" ("সমূহ" নামক পুস্তকের ৬৮ পৃষ্ঠা।) 'দেশনায়ক' নামক অপর এক প্রবন্ধে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন :— 'একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে। এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দির ভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মত এমন কঠোর সত্য,—এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কি আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাতে ফাঁকি দিবার জো কি, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশ মাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। **এই দুঃখের কৃষ্ণকঠিন নিকষ-পাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত না করিয়া থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে।**

যাহা খাঁটি সোনা নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন ?'
('সমূহ' পৃঃ ৪০-৪১)

রবিবাবুর এই সব কথায় কোন দেশব্যাপী হুজুক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় নাই, কেবল শক্তি জাগে নাই ; কেননা তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানাবলীর ভিত্তি কেবল দেশানুরাগের উপর স্থাপন করিতে চাহিয়া ছিলেন, বিদেশী বিরাগের ও বিরোধের ভেজাল তাহাতে ছিল না ।

ফাল্গুন, ১৩৩১

ইতালীতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকায় সম্বর্ধিত হইবেন ইতালীতেও সম্বর্ধিত হইবেন, ইহা ত বলিয়াই রাখিয়াছিলাম। তথাপি খবরের কাগজে তাঁহার সম্বর্ধনার বৃত্তান্ত পড়িয়া আহ্লাদিত হইলাম ।

ইতালীর লোকেরা তাঁহাকে অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই । তাঁহারা বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে ইতালীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ উপহার দিবেন । এবং বিশ্বভারতীতে ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য দুই বৎসরের জন্য একজন ইতালীয় অধ্যাপককে নিজব্যয়ে নিযুক্ত রাখিবেন। ইতালীয় অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য ছাত্র পাঠাইয়া ভারতীয় জনগণ ইতালীবাসীদের এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্মান রক্ষা করিলে ও নিজেরা লাভবান হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব । নতুবা দুঃখের বিষয় হইবে ।

রবীন্দ্রনাথের বহির অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের কোন না কোন বহি নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে অনুবাদিত হইয়াছে :—হিন্দী, উর্দু, মরাঠী, গুজরাতি, তামিল, তেলুগু, কন্নাড, আর্মীনিয়ান, চীন, জাপানী, ইংরেজী, ডাচ, ডেনিশ, সুইডিস, নরউইজিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ, রুশীয়, চেক, এস্থোনীয়ান ।

শুনিয়াছি, যে, আরবী, হিব্রু এবং হাঙ্গেরীয় ভাষাতেও অনুবাদ হইয়াছে ।

বিশ্বভারতীর বৈদেশিক অধ্যাপকগণ

বিশ্বভারতীতে শিক্ষা দেবার জন্য বিদেশ হইতে বিখ্যাত অধ্যাপকগণের আগমন ইতিপূর্বেও হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি আসিয়া এখানে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। চেকোস্লোভাকিয়া হইতে প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিদ্যাবিৎ অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্‌ এবং অধ্যাপক লেজনী তাহার পর এখানে আসিয়া অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বাংলা বৎসরে নরওয়ে হইতে ক্রিশ্চিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচীন লিপিবিৎ ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক স্টেন কোনো এখানে আসিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রধানতঃ তিনি ভারতীয় ধর্মবিষয়ক চিন্তার বিকাশ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র ধম্মপদের ব্যাখ্যা করেন, পুরাতন খোটানীয় ভাষায় বজ্রচ্ছেদিক ও অন্যান্য পুঁথির পাঠনা করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতাতেও কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রীশৈল কণ্ব এবং তাঁহার পত্নীকে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নাম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় ও অন্যান্য কথায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নানা উক্তি বহুবার শ্রুত হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের গৌরব বোধ হয় বটে; কিন্তু তাহাতে আমরা যেন মনে না করি, ভারতীয় ধর্মমতসমূহের সবই ভাল, কুসংস্কারগুলিও ভাল। বস্তুতঃ বৈদেশিক সুধীবর্গ কর্তৃক ভারতীয় চিন্তার প্রশংসা হইতে এইরূপ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়াই এবিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যাহা হউক এই অবান্তর মন্তব্য হইতে আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয়ে প্রত্যাগমন করি। আমরা বলিতেছিলাম, যে, বিদেশ হইতে অনেক সুপণ্ডিত অধ্যাপক এখানে আসিয়া অধ্যাপনা করিয়াছেন। চীনদেশ হইতে চৈনিক অধ্যাপক ঙো চিয়াং লিম্‌ মহাশয় আসিয়া এখনও চৈন ভাষা শিক্ষা দিতেছেন এবং চীনের সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। ফ্রান্সের অধ্যাপক বেনোয়া এখানে স্থায়ীভাবে থাকিয়া ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখাইয়া থাকেন।

দুঃখের বিষয় বিদেশ হইতে যে সকল অধ্যাপক এখানে আসিয়া শিক্ষা দেন,

ভারতীয় যুবক বিদ্যার্থীরা যথেষ্ট সংখ্যায় আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন না। অথচ ইহাদের সমান অথবা ইহাদের চেয়ে কম পণ্ডিত লোকেদের নিকট শিক্ষালাভ করিবার জন্য অনেক ভারতীয় ছাত্র হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া ইউরোপ যাত্রা ও তথায় অবস্থান করেন।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, যে, যদি ইতালীয় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষালাভের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলেই সুখের বিষয় হইবে।

বৈশাখ, ১৩৩২

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কোন কোন বহি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের ইসাবেলা থোবার্ন কলেজ নামক নারীদের উচ্চশিক্ষার কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিস ড়িমিট রবীন্দ্রনাথের "দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার" ("রাজা") নাটক সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিবার নিমিত্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াছেন, আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি গবেষিকারূপে এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

তিনি যদি মূল বাংলা নাটকটি পড়েন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

"সুন্দর-দূত"

জাপানে ভূমিকম্পের নিষ্ঠুর ধ্বংস লীলার পর রবীন্দ্রনাথ সে দেশে যান। মৃত্যু-ব্যথা পীড়িত দেশে তাঁহার নবজীবনের বার্তা আনন্দ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বিদায় কালে সে দেশের মেয়েরা সমস্ত দেশের বিদায় অভিবাদন জানাইতে জাহাজ ঘাটে আসিয়াছিল। যে বন্ধুকে মানুষ ছাড়িয়া দিতে চাহে না, অথচ যাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া উপায় নাই, তাহার প্রতি হৃদয়ের প্রীতি ও আপনাদের বিচ্ছেদ দুঃখ জাপানী মেয়েরা জানায় তাহাদের চিরাচরিত প্রথার সাহায্যে। মেয়েরা সকলে হাতের মুঠায় সুদীর্ঘ কাগজের রঙিন ফিতা লুকাইয়া ঘাটে আসে। বন্ধু জাহাজে উঠিলে মেয়েরা ফিতার একটা মুখ হাতে রাখিয়া

আর একটা মুখ তীর হইতেই জাহাজের দিকে ছাড়িয়া দেয়। বন্ধুরা জাহাজ হইতে এই বন্ধনের ফাঁশ চাপিয়া ধরেন। এমনি শত শত রঙের ক্ষীণ বাঁধনে তাহারা যেন বন্ধুকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। জাহাজ চলিতে চলিতে ফিতার জাল টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যায়। "সুন্দর দূতে" রবীন্দ্রনাথের এই বিদায় অভিবাদনের ছবি দেখিতে পাই।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চৌষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে; ঐ দিন তিনি পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐ দিবস নিম্নলিখিত পদ্ধতি-অনুসারে শান্তিনিকেতনে উৎসব হইয়াছিল।

আচার্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

পঞ্চষষ্টিতম জন্মতিথি-উৎসব

কার্যাবলী

২৫শে বৈশাখ ১৩৩২

প্রাতে ৬ষ্ঠ ঘটিকা

১। শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিলে আচার্যের গৃহ "উত্তরায়ণে" সকলের উপবেশন।

২। গান।

৩। আচার্যের আগমন।

৪। সকলের দণ্ডায়মান হইয়া বেদগান ও মন্ত্রপাঠ।

৫। আশ্রমবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বস্তি বচন পাঠ:—

আচার্য, গুরো, তাত, কল্যাণমিত্র, প্রেষ্ঠ,
আশংকাং শময়ংস্তমো বিদলয়ন্নাশাঃ সমুদ্বোধয়-
ন্নানন্দং জনয়ঞ্জগজ্জনমনঃপ্রেমাঙ্কুরং রোপয়ন্।
শান্তিং সংঘটয়ন্ সমস্তবসুধাশ্রেয়শ্চ সংসাধয়-
ন্নদ্যায়ং তব বর্ষবৃদ্ধিদিবসঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ পুণ্যতঃ ॥

তদদ্য ইদং বয়মাশাস্মহে—

এষ ত্বাং সবিতা ধিনোতু ভগবান্ যজ্জ্যোতিরাদীপ্যতে,

ত্বাং পাত্বাশ্রমদেবতা ভগবতী নিত্যং প্রসন্নান্তরা।

জীব ত্বং শরদাং শতং স্ফুটতরং বিশ্বস্য পশ্যঞ্চ শিবং

ত্বৎপ্যত্বেতদনারতং চ ভুবনং শান্তিং পরামাগতম্ ॥

৬। আচার্যকে মাল্য চন্দনাদি দান।

৭। শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও আনন্দবাদ্য।

৮। বীণাবাদন।

৯। আশ্রম-কন্যকা ও পুরন্ধ্রীগণের প্রশস্তি পাত্র লইয়া আগমন ও আচার্যকে অর্ঘপ্রদান।

১০। কবিতা-আবৃত্তি।

১১। গান।

প্রাতে ৭ম ঘটিকা

উত্তরায়ণে জলযোগ।

প্রাতে ৭॥০ ম ঘটিকা

১। পঞ্চবটী রোপণ ও উৎসর্গ।

কর্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ পুণ্যাহং' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ পুণ্যাহং, পুণ্যাহং, পুণ্যাহম্।

কর্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ স্বস্তি' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

কর্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্মণি 'ওঁ ঋদ্ধিঃ' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ ঋধ্যতাম্, ঋধ্যতাম্, ঋধ্যতাম্।

কর্তা।

ওঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে পূর্ণিমায়াং তিথৌ স্ববর্ষবৃদ্ধিদিবসে শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা পান্থপশুপক্ষিণাম্ অন্যেষাং চ প্রাণভৃতাং হিতায় চ সুখায় চ এতাং পঞ্চবটীং রোপয়ামি, রোপয়িত্বা চ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎসৃজামি ।

সদস্যগণ ।

ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু । সাধু, সাধু, সাধু ।

আশ্রম-কন্যকা-ও পুরস্ত্রীগণ কর্তৃক শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ।

আনন্দবাদ্য ।

২ । কন্যকা ও পুরস্ত্রী-গণের প্রশস্তিপাত্র-হস্তে তিনবার পঞ্চবটীর প্রদক্ষিণ করা হইলে শঙ্খ, ঘণ্টা ও অন্যান্য আনন্দ-বাদ্যের সহিত তাহার রোপণ ।

৩ । স্মৃতিগাথা প্রতিষ্ঠা—

পান্থানাং চ পশুনাং চ পক্ষিনাং চ হিতেচ্ছয়া ।
এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা ॥

৪ । গান— মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ ।
মৌনী মাটির মর্ম্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্ম্মর তব রবে ?
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ !
পথিক বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি,
এস শ্যামসুন্দর ।
এস বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর ।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরাম গভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ ॥

মধ্যাহ্ন ১১শ ঘটিকা

আহার।

অপরাহ্ন ৫ম ঘটিকা

জলযোগ।

রাত্রি ৭ম ঘটিকা

১। অভিনয়—"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"

২। গান।

রাত্রি ৮॥০ ম ঘটিকা

আহার

অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী, এই পাঁচটি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। নিকটে একটি কূপও খনিত হইবে।

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র অভিনয় আশ্রম কন্যাকাগণ করিয়াছিলেন ; কেবল লক্ষ্মী-দেবীর ভূমিকা কলিকাতার কোন এক মহিলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালো হইয়াছিল।

সমুদয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

উপরে যে নূতন গানটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল।

বিশ্বভারতী পঞ্চবিংশ জয়ন্তী

আগামী পৌষ মাসে বিশ্বভারতীর পঞ্চবিংশ জয়ন্তী হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া বিশ্বভারতীতে পরিণত হইয়াছে।

সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ৭ই ও ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতনে যে-উৎসব হইয়া থাকে আগামী পৌষ মাসে তাহা হইবে ; অধিকন্তু আরও নানা অনুষ্ঠান হইবে। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শান্তিনিকেতনে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরে ও বাংলাদেশের অন্য অনেক স্থানে বালিকারা শিক্ষালাভ করিবার চেষ্টায় অনেক সময় স্বাস্থ্য হারাইয়া বসে। অবরোধ প্রথা আছে বলিয়া তাহাদিগকে গাড়ী করিয়া স্কুল ও কলেজে যাইতে ও সেখান হইতে আনিতে হয়। সেইজন্য সচরাচর সকাল সকাল তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া গাড়ীর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়; আবার আসিবার বেলা হয়ত স্কুল-কলেজের ছুটির অনেক পরে বাড়ী ফিরিতে হয়। তাহার উপর কলিকাতায় ও অন্যান্য অনেক শহরে মেয়েদের অংগচালনা ও মুক্ত বায়ু সেবনে কোন সুযোগ সচরাচর হয় না; অথচ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, যে কেহ মস্তিষ্ক চালনা করে, তাহার স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য অংগচালনা ও মুক্ত বায়ুসেবন বিশেষ আবশ্যক।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মধ্যাহ্নে শারীরিক অবসাদ হয়। এই জন্য আমাদের প্রাচীন পন্থা অনুযায়ী পাঠশালা ও টোলে সকাল বিকাল অধ্যাপনা হয়, দুপুরে কিছু হয় না। কিন্তু ইংরেজরা শীতের দেশের লোক বলিয়া নিজেদের দেশের রীতি-অনুসারে এদেশেও অফিস আদালত স্কুল-কলেজ এর কাজ ১০টা-১১টার পর হইতে ৪টা-৫টা পর্যন্ত করেন ও করান। এরূপ ব্যবস্থা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের, স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপনা হয় সকাল বিকাল। ফাঁকা জায়গায়, অনেক সময় গাছতলায় ক্লাস বসে; সুতরাং নির্মল বাতাস ও যথেষ্ট আলোকের অভাব কখনও হয় না। ছাত্রীনিবাস ও ক্লাস একই জায়গায়; সুতরাং তাড়াতাড়ি নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া ছাত্রীদিগকে গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাইতে হয় না। মুক্তবাতাসে খেলিবার ও বেড়াইবার সুবিস্তৃত জায়গা আছে। বোলপুর শহর এখান হইতে দূরে বলিয়া মেয়েরা অসংকোচে খোলা জায়গায় বেড়াইতে পারেন। এই সকল কারণে এই স্থানে বাস ও শিক্ষালাভ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল।

ছাত্রীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোন পরীক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয়ে পড়িতে হয় না; তাঁহারা সব পরীক্ষাই (অবশ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষা

ছাড়া) বাড়ীতে পড়িয়া "প্রাইভেট্" পরীক্ষার্থিনীরূপে দিতে পারেন। সুতরাং শান্তিনিকেতন হইতে ছাত্রীদের পরীক্ষা দিবার কোনো বাধা নাই।

এখানকার ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন্ বা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, সংস্কৃত, উদ্ভিদবিদ্যা, পালি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা এখানে হইতে পারে। ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র এবং অর্থনীতিতে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা করিবার লোক এখানে আছেন। অবশ্য কেহ কোন পরীক্ষা দিবেন বা না দিবেন তাহা তাঁহার ইচ্ছাসাপেক্ষ।

উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার শিক্ষালাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় নানা পুস্তক প্রচুর পরিমাণে আছে। বোধহয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া আর-কোন বঙ্গীয় কলেজে এত বহি নাই। কোন কোন বিষয়ে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

সাধারণতঃ স্কুল কলেজে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিলাম, এখন অন্য কথা বলি।

শিক্ষা-বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন, যে, বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী সর্বাঙ্গসম্পন্ন নহে। অথচ তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা সহজ নহে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এখন শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ পুস্তক হইতে জ্ঞানলাভ বুঝায়। কিন্তু যাঁহারা নিজে জ্ঞানলাভ করিয়া পুস্তক রচনা প্রথমে করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহা করিয়াছিলেন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাতে বালক বালিকারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন উৎসব করিয়া তিনি আশ্রমস্থ সকলের হৃদয়মনচক্ষুকর্ণাদিকে প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন করিতে ও রাখিতে চেষ্টা করেন। ছাত্র ছাত্রীদিগের সাহিত্য-সভা প্রভৃতির সাহায্যে তাহারা কবিতা প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনা, আবৃত্তি ও পাঠ করিতে শিখে; তাহাদের উপযোগী অভিনয় ও সঙ্গীতাদিও তাহারা করে। তাহাদের কয়েকটি হস্তলিখিত সচিত্র মাসিকপত্র আছে।

কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিখাইবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এখানে আছে।

চিত্রাঙ্কন এবং নানাবিধ কারুকার্য শিখাইবার ব্যবস্থা এখানে আছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এখানকার কলাভবনের অধ্যক্ষ।

ছাত্রীরা এখানে গৃহকর্ম শুশ্রূষা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারেন।

আমরা যতদূর অবগত আছি, ছাত্রীদের এখানকার মতন সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা বঙ্গের অন্যত্র কোথাও নাই। ৫টি ছাত্রীকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ মনস্থ করিয়াছেন। এই ৫ জনকে কেবল আহারাদির ব্যয় দিতে হইবে। "আশ্রম সচিব, শান্তিনিকেতন," এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে অন্যান্য সংবাদ জানা যায়।

আষাঢ়, ১৩৩২

শান্তিনিকেতনে গান্ধিজী

মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিয়া দীর্ঘকাল যে কথোপকথন করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত উক্তরূপ বলিয়া প্রকটিত হয়। এই কথোপকথনের সময় অনেকক্ষণ আমরা উপস্থিত ছিলাম। তাহাতে গোপনীয় কিছু না থাকিলেও তাহার বিস্তারিত কোন অনুলিপি প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ আরোগ্য লাভ করিয়া বল পাইবার পর যদি কখনও নিজের অতুলনীয় ভাষায় স্বীয় আদর্শ ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে মানবের উপকার হইবে।

বহুবৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মুখে বলীদ্বীপের হিন্দুদের সম্বন্ধে একটি ঘটনার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। ঘটনাটি এই :—ওলন্দাজরা যখন বলীদ্বীপ জয় করিবার জন্য তথাকার অধিবাসী হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে, তখন হিন্দুরা যজ্ঞোপযোগী শুভ্র বস্ত্র পরিহিত হইয়া আততায়ীদের সম্মুখীন হইল এবং বলিল, আমরা পরাধীনতা স্বীকার করিব না, কিন্তু যুদ্ধও করিব না ; তোমরা স্বেচ্ছায় আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পার। হল্যাণ্ডের রাণী ঘোষণা করিলেন, যে, এরূপ সাহসী ও মহৎ লোকেরা স্বাধীন থাকিবার উপযুক্ত, এবং তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার আর চেষ্টা করিলেন না।

ঘটনাটির বৃত্তান্ত আমাদের মোটামুটি যেরূপ মনে ছিল লিখিলাম।

কয়েক বৎসর পূর্বে এণ্ড্রুজ সাহেবের এক পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে। তাহার একস্থানে কবি বলিতেছেন :—

"Of course, we must not think that killing one another is the only form of war. Man is pre-eminently a moral being : his war instinct should be shifted to the moral plane and his weapons should be moral weapons. The Hindu inhabitants of Bali, while giving up their lives before the invaders, fought with their moral weapons against physical power. A day will come when man's history will admit their victory. It was a war. Nevertheless it was in harmony with peace, and therefore glorious."

তাৎপর্য। "অবশ্য ইহা মনে করিলে চলিবে না, যে, পরস্পরের প্রাণবধই যুদ্ধের একমাত্র রূপ। মানুষ সর্বোপরি নৈতিক জীব ; তাহার স্বাভাবিক যুদ্ধ প্রবৃত্তিকে নৈতিক স্তরে উন্নীত করা উচিৎ এবং তাহার অস্ত্র নৈতিক বা আত্মিক অস্ত্র হওয়া উচিৎ। বলীদ্বীপের হিন্দু অধীবাসীরা আক্রমণকারীদের নিকট প্রাণবলি দিতে প্রস্তুত হইয়া পাশব বলের বিরুদ্ধে নিজেদের নৈতিক বা আত্মিক অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল। একদিন আসিবে যখন মানুষের ইতিহাস তাহাদের জয় স্বীকার করিবে। তাহারা যুদ্ধই করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি শান্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য ছিল এবং এই হেতু ইহা মহিমামণ্ডিত।"

শ্রাবণ, ১৩৩২

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সরকারী নেকনজর

গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে ডাকে যাহাদর চিঠিপত্র যত আসিত, তাহা সেন্সর-নামক সরকারী কর্মচারীর অফিসে খোলা হইত এবং পরে কোন কোন চিঠি মালিককে দেওয়া হইত, কোনটা বা দেওয়া হইত না। প্রবন্ধাদি বাহির হইতে আসিলে তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা হইত। যাহা হউক, ইহা

গবর্ণমেণ্ট বলিয়া কহিয়া প্রকাশ্যভাবে করাইতেন। যুদ্ধান্তে এখনও যে গোপনে এই কাজ হয়, তাহা অনেকেই জানেন না ও সন্দেহ করেন না। কিন্তু এই চমৎকার কাজটি যে এখনও গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগ করিয়া থাকে, তাহার একটি কৌতুকজনক প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

গত ৩রা জুলাই শুক্রবার রবিবাবু শান্তিনিকেতনে জার্মাণী হইতে একটি রেজিষ্টরী চিঠি পান। তৎপূর্বে ২৮শে জুন শান্তিনিকেতনে ইউরোপীয় ডাক বিলি হইয়াছিল; ঐ চিঠিখানি রেজিষ্টরী বলিয়া ২৯শে সোমবার কিম্বা জোর ৩০ শে মঙ্গলবার তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল। তাহা না পাইয়া তিনি উহা পাইলেন শুক্রবার ৩রা জুলাই। ইহাই ত সন্দেহের একটি কারণ এবং এরূপ সন্দেহ রবিবাবুর মধ্যে মধ্যে আগেও হইত। যাহা হউক, তিনি চিঠির খামটি ছিঁড়িয়া খুলিয়া তাহার মধ্যস্থিত পত্রটি পড়িলেন, উহা যে আগে কেহ খুলিয়াছিল তাঁহার কোন চিহ্নই ছিল না। তাহার পর তাঁহার মনে হইল, খামটিতে যেন আরও কিছু রহিয়াছে। তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন উহা একটি বাংলা চিঠি, ঢাকা শহর হইতে ২৬শে জুন এক ভদ্রলোক তাঁহাকে লিখিয়াছেন। ঢাকার ২৬শে জুনের চিঠি শান্তিনিকেতন পেঁছিল ৩রা জুলাই; ইহাই ত এক রহস্য; তাহার উপর কোন জাদুমন্ত্র বলে উহা জার্মানির রেজিষ্টরী চিঠির মধ্যে ঢুকিল তাহা দুর্ভেদ্যতর রহস্য।

আমাদের অনুমান এই, কলিকাতায় কোন দেশ রক্ষক সরকারী অফিসে রবীন্দ্রনাথের জার্মান চিঠি ও ঢাকাই চিঠি দুই-ই খোলা হইয়াছিল। তাহার পর দুটি চিঠি আলাদা আলাদা খামে না পুরিয়া অসাবধানতা বশতঃ জার্মানীর খামেই পুরিয়া বেমালুম বন্ধ করিয়া তাঁহাকে পাঠানো হইয়াছে। এরূপ আহম্মক ও অসাবধান কর্মচারীকে গবর্ণমেণ্টের রায়সাহেব বা খাঁ সাহেব উপাধি ও পেনসন দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। কর্মচ্যুত করিলে লোকে পাছে ব্যাপারটার ঠিক ঠিক খবর পাইয়া যায়, এইজন্য এই পরামর্শ দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ঘটনাটি বলিয়া ঢাকার চিঠিখানি দিবার সময় পরিহাস করিয়া বলিলেন, যে এখনও তাঁহার প্রতি (কোন অনামিত কর্তৃপক্ষের বা বিভাগের) শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাকে একেবারে (অকর্মণ্য বলিয়া) অগ্রাহ্য করিয়া দেয় নাই!

বস্তুতঃ তাঁহার কিরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্রপূর্ণ চিঠির নকল বা ফোটোগ্রাফ

রাখা হইতেছে তাহা বক্ষ্যমাণ চিঠির নিম্নে প্রদত্ত নকল হইতে বুঝা যাইবে। লেখকের নাম ও বাড়ীর ঠিকানা বাদ দিলাম।

Dacca June 26, 1925

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

এই মাত্র আমার সেই প্রবন্ধটি ফেরৎ পেলাম, আপনার চিঠি কাল পেয়েছি।

একজন সত্যকার কবিকে বুঝে নিঃশেষ করে ফেলা, বিশেষ করে ভাষায় তা পুরোপুরি প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর সম্বন্ধে যত আলোচনা যত তাত্ত্বিকতা সবই, মোটের উপর "আংশিক হতে বাধ্য। আর আমার বিশ্বাস এই আংশিক হওয়াতেই সে সমস্তর সার্থকতা।

তাই আপনি যে লিখেছেন, "ছবিটি মূল বাস্তবের ঠিক প্রতিরূপ হইল কিনা তাহা বিচারের অধিকার ও সামর্থ আমার নাই"—একথার অর্থ পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারলাম না। আরোও গোলমালে পড়েছি এইজন্য যে আপনি লিখেচেন এ লেখাটি আপনার একটু ভালও লেগেছে।

এ সম্বন্ধে কিছু স্পষ্টতর ইঙ্গিত পেলে খুবই অনুগৃহীত হব। আপাততঃ এ লেখাটি আর ছাপতে দিলাম না। নিবেদন ইতি—

শ্রদ্ধানুরক্ত

ভাদ্র ১৩৩২

রবীন্দ্রনাথের গোরা

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসখানি মিঃ জে. স্যানো কর্তৃক জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহা কাইটো ও টোকিও দুইটি পুস্তকালয় হইতে একযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ জাপানী অনুবাদ খুব সুন্দর হইয়াছে; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের একখানি ফোটো, তাঁহার হস্তাক্ষরে লিখিত একটি কবিতা এবং শ্রীযুত নন্দলাল বসু ও শোকিন কাসুতার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি আছে।

দেশ বিদেশের কথা।

বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নাটক।

অনেক বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "কর্মফল" নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তিনি তাহাকে নাটকের আকার দিয়া "প্রবাসীতে" ছাপিতে দিবেন বলেন। পরে "গৃহ প্রবেশ" রচিত হয়। তখন তিনি "কর্মফল" ও "গৃহপ্রবেশ" এই দুটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে বলেন। তদনুসারে "প্রবাসীর" জন্য "গৃহপ্রবেশ" নির্বাচিত হয়। এই কারণে প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় "কর্মফল" বাহির হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও তাহার পরিবর্তে "গৃহপ্রবেশ" প্রকাশিত হইল।

এ বিষয়ে নানা কাল্পনিক কথার প্রচার হইতেছে বলিয়া, প্রকৃত কথা আমরা যতটুকু পাঠকদিগকে জানান দরকার, লিখিলাম।

পৌষ, ১৩৩২

লিটনের শান্তিনিকেতন গমন

রবিবাবুর সহিত সকলে সব বিষয়ে একমত হইবে, এ আশা বা ইচ্ছা তিনি নিশ্চয়ই করেন না। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত সব কাজের আলোচনা করাও আবশ্যক মনে হয় না। যে সব মত বা কাজের সহিত সর্বসাধারণের সম্পর্ক আছে তাহার আলোচনা আমরা কখন কখন করিয়াছি। যেমন, কলিকাতার বঙ্গীয় থিয়েটারগুলি সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে দূষণীয় বা অনিষ্টকর না হইলেও, উহার অনুকরণ দ্বারা অন্য লোকের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এই কারণে এবং তাঁহার সহিত যাহার কোনো সম্পর্ক নাই এরূপ অন্যান্য কারণে, আমরা থিয়েটার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগে আগে করিয়াছি। সত্য কারণ থাকিলে আমরা যেমন তাঁহার মত ও কাজের সমালোচনা করিবার অধিকারী অন্যেরাও সেরূপ করিবার অধিকারী। শুধু অধিকারী নহেন, তাহা করা কর্তব্য। কিন্তু যাহা সত্য নহে, বা যাহা আংশিক সত্য, তাহাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাকে বা অন্য কাহাকে

আক্রমণ করা উচিত নহে। তাঁহার ন্যায় অন্য যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে বিদেশী লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করে তাঁহাদিগের অমূলক সমালোচনা দ্বারা আমরা নিজেদেরই অসম্মান করি, ইহাও মনে রাখা উচিত।

সম্প্রতি লর্ড লিটন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় এবং সুরুলের শ্রীনিকেতনে পল্লীসমূহের উন্নতি সাধন চেষ্টার প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিয়াছেন। এ বিষয়ে একজন 'দর্শক' একখানি খবরের কাগজে রবিবাবুর নিন্দা করিয়াছেন, এবং অন্য একখানা কাগজেও এরূপ নিন্দা দেখিয়াছি। নিন্দা যিনি যাহা করুন, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু আমরা যাহা জানি, তাহাতে "দর্শকের" চিঠিতে তথ্য হিসাবে কিছু ভুল আছে। তাহাতে লিখিত আছে, যে, রবিবাবু লর্ড লিটনকে আমন্ত্রণ করিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; আমরা নিজে যাহা জানি তাহাই বলিতেছি।

গত পূজার ছুটির আগের দিন পর্যন্ত আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তাহার অনেকদিন আগে তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, বীরভূমের একজন সরকারী কর্মচারী বোলপুরে আসেন। তাঁহাকে তাঁহার বোলপুরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, যে, লাটসাহেব বীরভূম জেলায় আসিবেন এবং তখন প্রাইভেটভাবে শান্তিনিকেতন দেখিতেও তিনি ইচ্ছা করেন; কিন্তু লাট-সাহেব কোথাও প্রাইভেট ভাবে আসিলেও তাঁহার নিরাপদ অবস্থান ও আরামাদির বন্দোবস্তের দরকার বলিয়া তত আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিতে হইতেছে। কিছুদিন আগে রবিবাবুর সহিত কলিকাতায় কথা প্রসঙ্গে লাট-সাহেবের শান্তিনিকেতন দর্শন-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি আমরা চাই নাই। অনুমতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত যে, ঐ দর্শন-ব্যাপারটা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না। ইহার বেশী কিছু লিখিব না। তবে, কেহ যদি মনে করেন ও বলেন, শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ভাবী অতিথি-অভ্যাগতের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া তবে তাহাকে সেখানে আসিতে দেওয়া উচিত, এবং লাট লিটন আসিতে চাহিলেও তাহাকে নিষেধ করা উচিত ছিল, তাহা হইলে তিনি তাহা করিতে পারেন।

লাট-সাহেবকে অভিনয়াদি দেখান হইয়াছিল, রবিবাবুর নিন্দার ইহা একটা কারণ। কিন্তু অভিনয়াদি শুধু লাট-সাহেবের জন্যই হয় নাই; পূর্বে

আরও নানা উপলক্ষে হইয়া গিয়াছে। যমুনালাল বজাজ মহাশয় একবার যখন আসিয়াছিলেন তখন হইয়াছিল; বীরভূম জেলার স্বাস্থ্যকৃষি শিল্প-আদির উন্নতির জন্য কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের জন্য হইয়াছিল, ইত্যাদি। তাহা হইয়া থাকিলেও লাট সাহেবের জন্য হওয়া উচিত ছিল না। যদি কেহ মনে করেন, তাহা করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

রবিবাবু লিটনের সহিত আহার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ। কিন্তু আহার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অনেক অপ্রসিদ্ধ বাঙালী ও অবাঙালী অতিথির সহিত, জাত ও কর্মের বিচার না করিয়া, করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও লিটন-সাহেবের সহিত তাঁহার অন্নগ্রহণ করা উচিত হয় নাই, এরূপ মনে করিবার অধিকার অবশ্য প্রত্যেক সমালোচকের আছে। তথ্য-সম্বন্ধে ঠিক খবর দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য, সমালোচনার সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নহে।

ঢাকায় পুলিসের প্রশংসাপূর্ণ যে বক্তৃতায় লিটন ভারতনারীদের উল্লেখ করেন, আমাদের বিবেচনায় রবিবাবু তাঁহাকে সে বিষয়ে দুখানা চিঠি লিখিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম চিঠির জবাবে লাটসাহেব ভারত মহিলা-দিগের অবিমিশ্র উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবিবাবু দ্বিতীয় যে চিঠি লেখেন, তাহাতে লাটসাহেব কোণঠাসা হইয়া কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই। উহাতে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, যে ভারতীয়রা লাটসাহেবের গবর্ণমেন্টকে এই 'চ্যালেঞ্জ', করিতে প্রস্তুত, যে উক্ত গবর্ণমেণ্ট লাটসাহেবের উল্লিখিত এরূপ কোন মোকদ্দমার উল্লেখ করুন, যাহাতে ভারতনারীরা তাহাদের পুরুষ আত্মীয়দের প্ররোচনায় পুলিসকে জব্দ করিবার জন্য নিজেদের সতীত্বের উপর পুলিসের হস্তক্ষেপের মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে। এরূপ কোন দৃষ্টান্ত লাটসাহেব বা তাঁহার গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন নাই। অবশ্য চর মনাইয়ের মোকদ্দমাকে তাঁহার বক্তৃতায় লক্ষ্য করেন নাই বলায়, তথাকার স্ত্রীলোকদের উপর পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে ঐ স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য সত্য বা মিথ্যা তাহা বিবেচনায় বিষয় ছিল না; অন্য দৃষ্টান্তই রবিবাবু চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই।

কোন কোন খবরের কাগজ পাঠকদের বিশেষ দর্শনীয় স্থানে ও বড় অক্ষরে প্রচার করে, যে, রবিবাবু লিটনের অনুরোধে তাঁহাকে প্রথম চিঠি লেখেন;

কিন্তু যখন ঐ কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ হয়, তখন প্রতিবাদ ছোট অক্ষরে, সহজে চোখে পড়ে না এরূপ এককোণে ছাপা হইয়াছিল। এরূপ লোকদের কাছে তিনি ন্যায় বিচার পাইবেন না, জানি ; তথাপি আমাদের জ্ঞান-অনুসারে কয়েকটা তথ্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

ফাল্গুন, ১৩৩২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম হয়। বর্তমান ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতেখড়ি হইবার পর হইতে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁহার বিদ্যাচর্চা অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। ৪ঠা মাঘ রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয় ; সেদিন প্রাতেও তিনি একটি স্বরচিত নূতন কবিতা অল্পসল্প পরিবর্তন করিয়া তাহাকে নূতন আকার প্রদান করেন। তাহা এ মাসের প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

বাল্যকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তা ছাড়া তাঁহাদের বাড়ীর এক বৃদ্ধ কর্মচারীর নিকট হইত তিনি প্রত্যহ রামায়ণ মহাভারতের গল্প আগ্রহের সহিত শুনিতেন। সাত আট বৎসর বয়সেই তাঁহার বাংলা লেখার ঝোঁক চাপে। তখন যাহা কিছু মনে আসিত তাহাই গদ্যে বা পদ্যে লিখিয়া ফেলিতেন।

তিনি প্রথমে বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর পড়িয়া ইংরেজী সেণ্টপল্‌স স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু বাংলা শিখিবার ও লিখিবার তাঁহার যেরূপ আগ্রহাতিশয় বরাবর ছিল, ইংরেজী শিখিবার ও লিখিবার সেরূপ আগ্রহ তাঁহার কখনও হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ইংরাজী বেশ জানিতেন, এবং শেক্সপীয়ার, বায়রন্‌ ও কীট্‌সের গ্রন্থাবলী তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। ইংরেজীতে তিনি দর্শনের বহিও অনেক পড়িয়াছিলেন, বিশেষতঃ জার্মান দার্শনিক কাণ্টের বহির অনুবাদ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন ; গণিতজ্ঞ ছিলেন ;—ভারতবর্ষের লোক ইহাতে কিছু অসংগতি বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। ভারতীয় দার্শনিক সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন, কাব্য, যাহা হউক—একটি একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাতন্ত্র্য প্রসূত অসূয়ার বালাই তাহাদের নাই; সুতরাং পাশ্চাত্যসুলভ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকার প্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না। দার্শনিক প্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণতন্ত্র রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে নির্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ, এদেশে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর রুদ্ধদ্বার খাস্-কামরা আশ্রয় করা নহে।···আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধী-শক্তি প্রজ্ঞা আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলী এইসকল কথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' পুস্তকে তাঁহার বড়দাদার কাব্যরচনার কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"বেশ মনে পড়ে বড় দাদা একবার কি একটা কিম্ভূত কৌতুক নাট্য (burlesque) রচনা করিয়াছিলেন—প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড় বৈঠকখানা ঘরে তাহার রিহার্স্যাল চলিত। আমরা এ বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুতগানের কিছু কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যের কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না আর বলো না,
বল্‌চ বঁধু কিসের ঝোঁকে—
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা
হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!

এত বড় হাসির কথাটা যে কি তাহা আজ পর্যন্ত জানিতে পারি নাই—কিন্তু এক সময় জানিতে পাইব এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের হাস্য অসাধারণ রকমের ছিল। ১৩২১ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে গুপ্তনামা কোন লেখক তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন,

"হাস্য রসের সময় যে অট্টহাস্য শুনিয়াছি, সে হাস্য সমস্ত শরীর ও অন্তঃকরণ দিয়া একটি বিরাট সম্পূর্ণ হাস্য। তাহার মধ্যে কার্পণ্যের লেশমাত্র

থাকিত না, বাড়ীর ছাদ দ্বিধা বিভক্ত হইবার উপক্রম হইত এবং করতল নিম্নস্থ টেবিলের কাষ্ঠখণ্ডের আয়ুঃশেষ হইবার উপক্রম হইত। এ হাসি গ্রামোফোনে তুলিয়া রাখিবার মত হাসি—সরস উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রাচুর্যে দীপ্তিময় হাসি।"

তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন পরম বন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হাসিও এই রকমের ছিল।

রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতিতে" তাঁহার বড় দাদার "স্বপ্ন প্রয়াণ" কাব্যের উল্লেখ দু জায়গায় আছে। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ব বিকাশের পক্ষে বসন্ত-বাতাসের মত কাজ করিত। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্ন প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় গড়াগড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এই জন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

"তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব-নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম? কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না; কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারই অনেক আঘাতে শিরা উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

"সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে

পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

"স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভাল লাগিত। বিশেষতঃ আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুসরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই এই রকমের কিছু একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারু নৈপুণ্য! তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়ীতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটিও সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথের মত কবি এবং অন্য অনেক সমজ্দার ব্যক্তি স্বপ্নপ্রয়াণের প্রশংসা করিলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমার যথার্থ কবিতার মুড্ যখন ছিল—অর্থাৎ সেই কালে—তখন আমি এ কাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই; ইহার রচনার সময় তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মসগুল্ ছিলুম, তাই জন্য উহাতে মেটাফিজিক্স্ ঢুকিয়াছে।" তাঁহার পক্ষে একথা বলা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কারণ তিনি নিজের লেখার কঠোর সমালোচক ছিলেন; নিজে কিছু লিখিয়া সহজে সন্তুষ্ট হইতেন না। বার বার সংশোধন এমনকি পুনর্লিখন চলিত।

স্বপ্নপ্রয়াণের আগে এবং পরেও তিনি অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের পদ্যানুবাদ তাহার মধ্যে অন্যতম। তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ বাল্যকালের রচনা বলিলেও চলে। অথচ অনুবাদটি উৎকৃষ্ট। উহার কতকগুলি পংক্তি বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও পরিচিত; যথা :—

"কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়—"

"তাহারে নাচাত প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রণ রণ বাজে তার বালা।"

হাস্যরসাত্মক কবিতা তিনি অল্পবয়সে লিখিয়াছিলেন। জীবিতকালের শেষ দুই তিন বৎসরও লিখিয়াছিলেন। আগেকার হাস্যরসাত্মক কবিতার মধ্যে "গুম্ফ আক্রমণ কাব্য" তাঁহার পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। উহার শেষে এইরূপ ফলশ্রুতি আছে :—

"শুনিলে সুশ্রাব্য, এই কাব্য কবিকুল-অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্টসিদ্ধি, গোঁপ বৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা॥
পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে॥"

প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলা দ্বিজেন্দ্রনাথকে অধীর করিয়া তুলিত। এক সময়ে তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল, "কেন? ঐ সুন্দর আকাশের বর্ণ-মাধুরী আমার চিত্তকে এমন নাড়া দেয় কেন? আমার মন এবং আকাশের সহিত কি সম্বন্ধ?" অতঃপর তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহার ফলস্বরূপ "তত্ত্ববিদ্যা" পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত ।

"আমাদের দেশের সর্বসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।" রবীন্দ্রনাথ এই বাক্যে যে প্রজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ সেই প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। পরলোকগত কবি শান্তিনিকেতনের অন্যতম শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজের এক বন্ধুকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন,

"মাটর্‌লিংকের' 'প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বহিটি পড়িতেছিলাম—পড়িয়া দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা মাটরলিংক করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহঙ্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্যের মুখামুখি শয়ান, অভিভূতব্য (?)

চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা উইজডম্। সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্রবাবুর আছে।"

প্রায় বার বৎসর পূর্বে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন,

"সংসারে লোকের অনেক দিক্ থাকে। সংসারীকে অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্য করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের যদি কোন দিক থাকে, যদি তিনি সমগ্র জীবনে কিছু আরাধনা করেন, তবে তাহা একমাত্র জ্ঞান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আর একজনকেও দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় জ্ঞানের অনন্যনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি নাই। এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও কি দিন, কি রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। উৎসাহসম্পন্ন যুবকের ক্লান্তি আছে, কিন্তু শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচিন্তায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কখন ক্লান্তি দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধিবাসীগণ গভীর নিশীথ সময়ে সুষুপ্ত, শাল সমীরণ তাহাদের ললাট স্পর্শ করিয়া দিবসের ক্লান্তি খেদকে অপনয়ন করিতেছে, আশ্রমলক্ষ্মী শান্ত-স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানকার আমলক কুঞ্জের অধিদেবতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনও জাগিয়া রহিয়াছেন; ভৃত্য মুনীশ্বর দুইধারে দুইটি মোমবাতী জ্বালিয়া দিয়াছে, আর তাঁহার লেখনী অবিশ্রাম চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্বগগন লোহিতরাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! দ্বিজেন্দ্রনাথের এ নিশাকাহিনী পিতামহীর কাহিনী নহে।"

প্রবাসীর যে সংখ্যায় এই বাক্যগুলি বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই গুপ্ত নামা পূর্বোক্ত লেখকও বলিয়াছিলেন,

"পূর্বে দেখিয়াছি লিখিতে লিখিতে ভোর হইয়া গেল, চাকরকে ডাকিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন, প্রভাতের বিহংগম বৈতালিকগণ তাহাদের গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর শয়ন করা হইল না, স্নান করিয়া দৈনিক দুই মাইল পর্যটন সমাপ্ত করিয়া চা পান করিয়া আবার খাতা লইয়া লিখিতে বসিলেন।"

তিনি দর্শনশাস্ত্রের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। উহার চর্চা ও চিন্তাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় যাপিত হইত। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে তিনি উচ্চাঙ্গের গণিতের অনুশীলন করিতেন। তাঁহার রেখাক্ষর বর্ণমালা বিশ্রাম-

কালে লিখিত। একান্ত বিশ্রাম করিতে চাহিলে তিনি সূতা বা আঠার সাহায্য না লইয়া বিচিত্র কৌশলে কেবল ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া কাগজের নানা-রকম খাতা, খাপ, ব্যাগ, পেটিকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেন। তিনি প্রবাসীতে যে অগণিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সমুদয় এইরূপ খাতায় লেখা। তাঁহার চিঠিও খামের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইতেন না, সুকৌশলে তাহা ভাঁজ হইয়া আসিত। তিনি যাহাদিগকে স্নেহ করিতেন, তাহারা কলম, পেন্সিল, লেফাফা প্রভৃতি রাখিবার এক একটি কাগজের পেটিকা উপহার পাইত। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও একটির অধিকারী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে খুব বেশী বহি পড়িতেন, তাহা নহে ; কিন্তু পাঠ অপেক্ষা চিন্তা করিতেন বেশী তিনি গীতার ও উপনিষদাদি হিন্দু শাস্ত্রের যে-সকল ব্যাখ্যা স্বদেশবাসীদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার অসাধারণ চিন্তা শক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিভার বলে অন্যে যে-সকল সত্যের অস্তিত্ব অনুমান করে না তিনি শাস্ত্র বচন হইতে তাহা পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইতেন।

ইউরোপ হইতে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁহার বড়দাদাকে একখানি চিঠি লেখেন, তাহাতে এইরূপ মর্মের কথা ছিল, যে, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ভারতীয় দর্শনে ও জ্ঞানে সামান্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়রা বিস্মিত হইতেছে। এইজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথকে এই অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন ইংরেজিতে ভারতীয় জ্ঞানসম্ভার ইউরোপীয়দিগের নিকট উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে তাহরা উপকৃত ও মুগ্ধ হইবে। এই চিঠি যখন আসে, তখন আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি আমাদিগকে পড়িতে দেন ; তাহার পর নিজের ইংরেজী লেখার অনভ্যাস প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, পরোক্ষভাবে, কেন যে কনিষ্ঠভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা জানান। প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ে তিনি আমাদিগকে বলেন, 'রবির Wonderful literary Powers (আশ্চর্য সাহিত্যিক শক্তি) আছে,' অর্থাৎ কি না 'রবি' যাহা পারে সকলের পক্ষে কি তাহা সুসাধ্য ? রবীন্দ্রনাথও প্রৌঢ় বয়সে ইংরেজী লিখিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ যদি ইংরেজী লেখার অভ্যাস করিতেন তাহা হইলে তদ্দ্বারা জগৎ উপকৃত হইত।

দর্শনের প্রসঙ্গে আমাদের একটি আখ্যান মনে পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাতিশয় স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন, এবং ভারতীয় দর্শনের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাংলার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড্ রোনাল্ড্শে আমাদের যুবকদিগের পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা কিম্বা পাশ্চাত্য দর্শনের পূর্ব্বে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করেন, তখন আমরা তাঁহার প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে হইয়াছিল, যে, আমাদের লেখায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই। এই কারণে তিনি হঠাৎ একদিন প্রাতে তাঁহার রিক্সাটি আরোহণ করিয়া আমাদের তখনকার শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সহিত যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার দেশাভিমানে ও ভারতীয় দর্শনের প্রতি ভক্তিতে আঘাত লাগিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমাদের যে, কোনও অশ্রদ্ধা নাই, তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আর একবার, প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে, বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভার্থ ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করিতে অসমর্থ, এইরূপ কিছু লিখিবার কথা উত্থাপিত হয়। তাহাতে ওরূপ কোন কথা লিখিলে ভারতবর্ষের অপমান করা হইবে এইমত তিনি প্রকাশ করেন।

এণ্ড্রুজ্ সাহেব শান্তিনিকেতনে থাকিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া ও চা খাইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত যাপন করিতেন। তিনিও এণ্ড্রুজ সাহেবকে স্নেহ করিতেন। তথাপি, একদিন দেশে কি একটা অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে (অর্থাৎ ইংরাজদের মধ্যে অত্যাচারীদিগকে) তাড়াইয়া না দিলে আর শান্তি নাই" (ইংরেজী কথাগুলা ইহা অপেক্ষা জোরাল ছিল ; তাহা লিখিলাম না)। তাহাতে এণ্ড্রুজ সাহেব দ্বিজেন্দ্রনাথের এক পৌত্রকে বলিয়াছিলেন, 'I say,—,your grand-father is a terrible—" তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহার আভাস দিবার জন্যই এই কথাগুলি লিখিলাম নতুবা ধীর শান্ত (যদিও বীর্যবান) দ্বিজেন্দ্রনাথ যে হিংসামূলক কোন হঠকারিতার সমর্থন করিতেন না, তাহা তাঁহার ভক্তমাত্রেই জানেন।

ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাতন্ত্র ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ তাহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ম্রিয়মান থাকিতেন ও তজ্জন্য ক্ষোভ লইয়া মরিবেন, এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, যে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত প্রচেষ্টায় তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ইহার পর তাঁহার হৃদয় হইতে নৈরাশ্যের ভাব চলিয়া যায়। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং আমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে ধর্মবীর ও কর্মবীর বলিতে শুনিয়াছি।

"ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার,
ভয় নাই আর কিছুতে তার॥"

তিনি এই আনন্দের অন্বেষণে অন্তিম বৎসরগুলি ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার অধিকারী হইয়া অনেকদিন জীবিত থাকিয়া তিনি শান্তিতে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। 'দ্বিজের ত্রিজত্ব' কবিতাটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রপৌত্র ধনজনবিভব সবই ছিল, কিন্তু তিনি অনাসক্ত গৃহী ছিলেন। অথচ তিনি যে আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। তাঁহার অনেক কথায় তাহাদের প্রতি স্নেহের পরিচয় অনেকবার পাইয়াছি।

তাঁহার বাসভবনসংলগ্ন আমলক-কুঞ্জের জীবগুলির প্রতি তাঁহার স্নেহ করুণা দেখিলে প্রাচীনকালের শান্তরসাস্পদ তপোবনের কথা মনে পড়িত। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, এবং আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি :—

"তিনি নিরুপদ্রবে একাকী বসিয়া জ্ঞানসমুদ্রের রত্নগুলি আহরণ করিতেছেন, আর সম্মুখের আমলক তরু হইতে পাখী নিজের মনে তাঁহার গায়ে মাথায় আসিয়া বসিতেছে, খেলা করিতেছে, আবার খাবার খাইতেছে, কাঠ বিড়ালগুলিও লাফাইয়া এইরূপ খেলা করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভৃত্যকে দিয়া ইহাদের উপযুক্ত আহার প্রচুররূপে সংগ্রহ করাইয়া নীরব চিন্তায় বসিয়া আছেন। কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই, সকলেই যেন বলিতেছে, সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু—সমস্ত দিক্ আমার মিত্র হউক! মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষা মহে—মিত্রের চক্ষুতে আমরা দর্শন করি। একদিন একটি পাখী তাঁহার কাঁধে বসিয়া খেলিতে খেলিতে সহসা ঠোঁট দিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে।

চোখটি ইহাতে অত্যন্ত লাল হইয়া উঠে। সংবাদ পাইয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি স্বয়ং আমাদের নিকট উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোখে বেশ আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু তিনি বলিলেন—'না, ও বিশেষ কিছু নহে, এখনই সারিয়া যাইবে। ও তো আর ইচ্ছা করিয়া আমায় কষ্ট দেয় নাই!' দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্ঞান চর্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরস হইয়া যান নাই, তাঁহার 'ভূতদয়া' এইরূপই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।"

এই বিষয়ে প্রবাসীর পূর্বোক্ত গুপ্তনামা লেখকও লিখিয়াছেন :—

"সালিক চড়াই কাঠ বিড়ালী আসিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে গায়ের উপর, মাথার উপর, খাতার উপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিচরণ করিতেছে। লেখার ব্যাঘাত হইলে মাঝে মাঝে "আঃ বড় জ্বালাতন করচে" বলিয়া বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিতেছেন, তাহারা ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া যাহারা যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল কাঠবিড়াল ভদ্রতার অনুরোধে লেখার টেবিল ছাড়িয়া পার্শ্বস্থিত পাথরের টেবিলে লাফাইয়া চড়িয়া লেজে ভর করিয়া বসিল।

"চোখের ভিতর পূর্বোক্ত পাখীটি ঠোক্‌রাইয়া দেওয়ায় তাঁহাকে পনের দিন চোখ বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। রাগিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে যখন দেখিলেন সে উপস্থিত নাই, তখন ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন. 'আহা, তাড়াতে বললেই কি তাড়াতে হয়। যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়।' ডাকিয়া আনিতে হইল না, সে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।

"দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠিয়া দেখিলেন একটি শীর্ণদেহ কুকুর বারাণ্ডায় শুইয়া শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন। বলিলেন 'তোদের কি কোনও মায়াদয়া নেই! আহা, কুকুরটা এইরকম করে কাঁদচে' আর তোরা দরজা বন্ধ করে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছিস?" এই বলিয়া আপনার একখানি নতুন লালরঙের কম্বল আনিয়া কুকুরের গায়ের উপর তাহা চাপা দিয়া যখন দেখিলেন যে সে কতকটা সুস্থ হইয়াছে, তখন আবার ফিরিয়া গিয়া আপনার বিছানায় শয়ন করিলেন।"

কোন মানুষ তাঁহার কথায় বা আচরণে কোন ক্লেশ পাইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলে তিনি ব্যথা পাইতেন এবং তাহার যথাসম্ভব প্রতিকার করিতেন।

তাঁহার কোন কথায় কেহ হয়ত রাগ করিয়াছে এরূপ ভ্রমও তাঁহার কখন কখন হইত। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর একটি কি বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবার পরেই আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসি! আমি বোধহয় একটু হঠাৎ আসিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার সন্দেহ হয়, যে, আমি বুঝি বা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। সেইজন্য কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'বাবু মহাশয় আপনাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন'। আমি গেলে তিনি নিজের সন্দেহের কথা বলিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলাম যে তাঁহার কথা শেষ হওয়ায় ও আমার অনেক কাজ থাকায় আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম, অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি আমাদের সকলের এরূপ পূজনীয় ও ভক্তিভাজন ছিলেন, এবং সকলকে এরূপ স্নেহ করিতেন, যে. তিনি তিরস্কার করিলেও (আমাদিগকে তাহা কখনও করেন নাই) আমাদের অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া, সেদিন তিনি, অন্য কোন দিনের মত বম্‌ওয়েচ্ নামক জার্মাণ মিশনারীর বাংলা কথা বার্তা ও বাংলা কবিতা পাঠের হাস্যকর অনুকরণ করিতেছিলেন; এবং অন্যবিধ লঘু কথাবার্তা চলিতেছিল। সুতরাং তাঁহাকে যে চিনিত না, এরূপ লোকেরও সেদিনকার কথাবার্তায় কোন বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের সহিত ব্যবহারে তাঁহার শিষ্টতার ও কোমল হৃদয়ের পরিচয় এইরূপ সামান্য ঘটনাতেও পাওয়া যাইত। আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে অন্য অনেকেও এইরূপ ঘটনার বৃত্তান্ত দিতে পারিবেন।

কোনপ্রকার অহমিকা প্রকাশ তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। পরোক্ষভাবেও যাহাতে নিজের বা নিজ পরিবারের কোন বড়াই করা না হয়, সে বিষয়ে তিনি এরূপ সতর্ক ছিলেন, যে, উহা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। আমি একবার তাঁহাকে বলি, যে, তাঁহার বাল্য ও যৌবন কালে বঙ্গের সামাজিক ও অন্য নানাবিধ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু লেখেন, ত, তাহা উপাদেয় হইবে ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তাহাতে সেরূপ কিছু না লিখিবার দুটি কারণের তিনি উল্লেখ করেন। একটি এই, যে, তাঁহার স্মৃতি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, অনেক কথা ভাল করিয়া মনে নাই। দ্বিতীয় কারণ এই বলেন যে, উহা লিখিতে গেলে তাঁহাদের নিজেদের পরিবারের কথা এত বলিতে হইবে,

যে, তাহা আত্মম্ভরিতা মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ, তিনি এই দ্বিতীয় কারণটি যত গুরুতর মনে করিতেন, উহা তাহা নহে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার স্বভাবনম্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার অন্তরে যেমন একটি সহজ সরল দর্পহীন তেজস্বিতা ছিল, বাহিরের পরিচ্ছদেও তিনি তেমনি, অন্যের মতামতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিজের অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুসারে চলিতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন,

"তাঁহার আচার ব্যবহার সমস্তই প্রয়োজন অনুসারে, প্রচলিত প্রথা বলিয়া তাঁহার নিকটে কিছু নাই। চশমার যে-যে স্থান শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হয় বলিয়া তিনি চশমার সেই সেই স্থানে তুলা জড়াইয়া লইবেন। বেড়াইবার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় অসুবিধা হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্কন্ধে মোটা ফিতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া চলিবেন। চটি জুতার বুড়ো আঙ্গুলে লাগে, তিনি তজ্জন্য জুতার সেই স্থানটুকু গোল করিয়া কাটিয়া লইবেন। [তিনি শীতকালে গরম মোজার ভিতর হাত ঢুকাইয়া সুতা দিয়া মোজা ও জামার আস্তিন হাত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতেন, যেমন বাইসিকল্‌ আরোহীরা মোজা ও পাতলুন পায়ে জড়াইয়া বাঁধে; ইহাও শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতে পারিতেন।] যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, তা যে কোন বিষয়েই হউক; আহার-বিহার বসন-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সর্বত্রই তাঁহার এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেন না।"

একবার এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহাকে একটি গরম ওভার কোট্‌ উপহার দেন। তিনি উহা লইয়াছিলেন, কিন্তু গায়ে না দিয়া উহার দ্বারা তাঁহার কেদারাটি মুড়িয়া তাহাতে বসিতেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু না করার যে নিয়ম, শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধেও তিনি তাহা রক্ষা করিতেন। সকলরকম লেখাতেই তিনি বিশেষ বিবেচনা ও ওজন করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতেন। এইজন্য তাঁহার লেখায়, তাঁহার চিন্তা ও ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইত।

তিনি বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মানুষ বুঝিয়া চতুরতাপূর্বক মত বা মনের ভাব গোপন করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এইজন্য কখন

কখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হাস্যকর অবস্থা ঘটিত। একদিন মিঃ এণ্ড্রুজ ও আমি তাঁহার সহিত সন্ধ্যায় দেখা করিতে গিয়াছি। সেদিন তিনি, আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যেও অনেক সময় কেমন উচ্চ ধর্মভাব ও দার্শনিক চিন্তা লক্ষিত হয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রসংগক্রমে, খৃষ্টিয়ান মিশনারীরা যে আমাদের দেশের লোককে পুতুল পূজক বলিয়া ভুল বুঝে ও অবজ্ঞা করে, এই মর্মের নানা কথা খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন। শ্রোতা দুজনের মধ্যে একজন যে খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারে উৎসাহী, তাহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। আমরা যখন বিদায় লইয়া নিজ নিজ আবাসে চলিলাম, তখন এণ্ড্রুজ আমাকে ইংরেজীতে বলিলেন, "আজ বড়দাদার কথোপকথন খুব ইণ্টারেষ্টিং হইয়াছিল।" আমি চুপ করিয়া এই মন্তব্যের রসটুকু উপভোগ করিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের ছাপকে মোটেই মূল্যবান মনে করিতেন না; এই জন্য বহুবার আমাদের সাক্ষাতে বি-এ, এম-এ-দের সম্বন্ধে এরূপ অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যাহা শুনিলে তাঁহারা খুশি হইবেন না। তাঁহার শ্রোতাও বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগী লোক, তাহা তাঁহার মনে থাকিত না; অথবা হয়ত তাঁহার স্নেহগুণে তিনি তাঁহাকে কলংকমুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধেও তাঁহার কতকগুলি প্রতিকূল ধারণা ছিল। কিন্তু তাহার জন্য ঐরূপ যে সব মহিলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইতেন তাঁহারা তাঁহার প্রতি কম ভক্তিমতী ছিলেন না। আজকালকার মেয়েরা যে সেকেলে ভাল ভাল রান্না ভুলিয়া যাইতেছেন, এটা তাঁহার একটা অভিযোগ ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যেমন বিস্তর সত্য আখ্যানমালা সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহা হওয়া উচিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তা শক্তি বিস্ময়কর ছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা প্রভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া দৃঢ়তরভাবে বলিয়াছেন, যে ইহা এইরূপ হইতেই হইবে। আনন্দের বিষয় বস্তুতও তাহা সেইরূপই শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে।" "তাঁহার শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচর্চা সফলতা লাভের একটি প্রধান কারণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা। তাঁহার হৃদয় কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কারে কলুষিত নহে···হউক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায়, তিনি কাহারও প্রতি কোন অনুচিত

আরোপ সহ্য করেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। একদিন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করেন, যে, হিন্দুগণের শ্রীকৃষ্ণের যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অতি কুৎসিত এবং ইহা অসভ্য বর্বর জাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে। কথাটা ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পেঁছে। দিবা সার্ধ দ্বিপ্রহর, প্রখর রৌদ্র, বৃদ্ধ জ্ঞান তপস্বী ধীরপদক্ষেপে উপস্থিত হইয়া মৃদুতীব্র ভাষায় তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া উপসংহার করিলেন—'শ্রীকৃষ্ণের কুৎসিত রূপের কথা কোথায় আছে? সর্বত্রই ত তাঁহাকে 'শ্যামসুন্দর' 'মদনমোহন' বলা হইয়াছে!"

যুবা সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রকৃত আইডিয়ালিস্টের প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইঁহাদের একটি লক্ষণ এই যে, ইঁহারা যে কথাই বলুন, তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন—বাইরের লোক সামনে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি—জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি কথাবার্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কি তীব্রতা, কি তেজ প্রেরিত হইতে বাধ্য।···দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় জোরের অথবা বীর্যের ভাব আছে। এই সকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।"

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়া, বাঙালী যে তাঁহাকে ভালবাসে, ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় সুখী হইলাম। এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহে আমরা বরাবর যেমন দুঃখ অনুভব করিতাম, তেমনি ভ্রমে হাসিও পাইত স্বীকার করিতেছি।

তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে-সব অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুরাতন কথা হইলেও নূতন করিয়া প্রণিধান যোগ্য। তাহার কোন কোন অংশের তাৎপর্য এই:—

"ইতিপূর্বে আমি আর একবার ঢাকায় আসিয়াছিলাম। সে-সময়ে আমি বলিয়া গিয়াছিলাম যে ভিক্ষা দ্বারা মুক্তি আসিবে না। অদ্য মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে যে মানপত্র দিয়াছেন, তাহাতে সে কথার উল্লেখ আছে।

"আমি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, সেবা ও আত্মোৎসর্গ ব্যতীত প্রকৃত কাজ হইতে পারে না। অবিরত চেষ্টা এবং আত্মোৎসর্গের বলে নিজের দেশের উপর যে অধিকার ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই অধিকার ও শক্তি যতদিন পর্যন্ত আমরা লাভ করিতে না পারিব, ততদিন পর্যন্ত শাসকবর্গের সহিত আদান-প্রদানে মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমরা চলিতে পারিব না আর সেই আদান-প্রদানে কোনো খাঁটি লাভও আমাদের হইবে না। সম্প্রতি আমি আর একটি কথা বলিয়াছি, তাহাও মিউনিসিপ্যালিটী-প্রদত্ত মানপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি বলিয়াছি যে লুপ্ত না হইয়া যাওয়াই একটি দেশ বা জাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্বীয় অফুরন্ত ধনভাণ্ডার হইতে অপরকে কিছু কিছু দিবার ভার তাহাকে লইতে হইবে। অতীত ভারত এই কর্তব্যকে স্বীকার করিয়া, গিরি-কন্দর, সাগর প্রান্তর ভেদ করিয়া স্বীয় দানের পসরা দূরদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই ভারতের আজ এ-কথা নিশ্চয়ই বলা উচিত নহে যে, তাহার ভাণ্ডার আজ শূন্য—সে নিঃস্ব ভিখারী। অন্ততঃ আমি সে-কথা বলিবার মত হীন কখনও হইব না। 'জগতের যে যেথায় আছ, আমার কাছে এস' ভারতের এই সনাতন আহ্বানের বাণী বহন করিয়া আমি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। নিঃস্ব কৃপণ কখনও এ-আহ্বান দিতে পারে না। কিন্তু ভারতের প্রাচুর্য ও চিরন্তন আতিথেয়তার উপর আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি ভারতের নামে ভারতের পক্ষ হইতে একটি অতিথিশালা খুলিয়াছি, যে কোনো পর্যটক আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিতে পারে এবং ভারতের চির প্রবাহিত উৎসের সুধাধারা পান করিতে পারে।

"আপনারা আমাকে স্মরণ রাখিয়াছেন দেখিয়া আমি অতীব আনন্দিত হইলাম। আমার প্রতি আপনাদের যে প্রীতি আছে, সেই প্রীতির এবং আমি চলিয়া গেলে আমার স্মৃতির সহিত যদি আপনারা আমার একান্ত প্রিয় কার্যকে স্মরণ রাখেন, তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।"

আর কতকগুলি অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে, মাতৃ-ভাষার ব্যবহার না করিলে, চিন্তা ও কর্মের পরিপন্থী বিদেশী ভাষার দাসত্ব-পাশ ছিন্ন না করিলে, যে জনসাধারণের রাজনৈতিক চৈতন্য জন্মিতে পারে না, তাহার উল্লেখ করিয়া এ-বিষয়ে অতীতকালে তাঁহার মাতৃভূমির সেবার কথা বলেন।

"আমার সেইদিনের চেষ্টা হয়ত কতকটা ফলবতী হইয়াছে। মাতৃভাষা আজ দেশে স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং জনসাধারণও স্ব-স্ব অধিকার এবং কর্তব্যভার গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।"

তাহার পর তিনি শেষ বিদায়-গ্রহণ-সূচক যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ব্যথা পাইয়াছি। আমাদের হৃদয় বলিতেছে, তাঁহার অন্তিম বিদায়ের সময় এখনও আসে নাই। তিনি আগেও অনেকবার গদ্যে ও পদ্যে এরূপ বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। আটাশ বৎসর পূর্বে, ১৩০৪ সালে তিনি গাহিয়াছিলেন,

এবার চলিনু তবে
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ঢাকায় তিনি বলিয়াছেন, অস্ত-সাগরের কূল হইতে তাঁহার মিত্র, 'রবি', তাঁহাকে ডাকিতেছে। অস্তমিত-প্রায় সূর্যের সহিত নিজের এই সখ্য বন্ধনের কথাও তাঁহার মুখে নূতন নহে। তের বৎসর পূর্বে লোহিত-সাগরে ভাসমান সিটি অব লাহোর জাহাজে তিনি গাহিয়াছিলেন,

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলা শেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।

সেই 'বেলা-শেষ' এখনও আসে নাই, আমরা তাঁহাকে বিদায় দিতে প্রস্তুত হই নাই, প্রস্তুত নহি। এখনও তিনি নূতন বাণী শুনাইতেছেন; আমরা আরও শুনিতে ও আত্মার মধ্যে গ্রহণ করিতে চাই।

তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার পিতা দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁহার অগ্রজত্রয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবি ছিলেন। এবম্বিধ নানাকারণে আমরা পূর্ণ আশার সহিত সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন, আরও বহু বহু বৎসর মানব-কুলের আনন্দ ও কল্যাণের কারণ হউন। তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা হইতে এখনই ত মানব-

সমাজ এমন অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছে, যাহা তাহাদের শাশ্বত সম্পত্তি ; তাহারা আরও অনেক-কিছু পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

চৈত্র, ১৩৩২

অধ্যাপক ফর্মিকির বিদায় উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক আচার্য কার্লো ফর্মিকির বিশ্বভারতীতে কয়েকমাস কাজ করিবার জন্য আগমনের সংবাদ আমরা যথাসময়ে দিয়াছিলাম। তাঁহার কার্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি গত ২৬শে ফাল্গুন স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। তদুপলক্ষ্যে প্রথমতঃ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে বিদায়সূচক সংবর্দ্ধনা করেন। তাহাতে উভয় পক্ষের পরস্পরের সহিত হৃদয়ের যোগ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহার পর ২৫শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' গৃহে তাঁহাকে বিদায় দান উপলক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সদ্ভাবপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। উত্তরে আচার্য ফর্মিকি সাশ্রুনেত্রে ও বাষ্পভারাক্রান্ত কণ্ঠে ভারতবর্ষের প্রতি, বিশ্বভারতীর প্রতি, এবং কবির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি, জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে বিশ্বভারতী ও কবি যে প্রীতি ও সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বর্গগতা জননী শুনুন ও তাঁহাকে আশীর্বাদ করুন, ইহা বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। ভাবাবেগ সংবরণ করিয়া তিনি কিছুক্ষণ পরে তবে নিজের বক্তব্য শেষ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার মাতৃভক্তি সমবেত বাঙালী পুরুষ ও মহিলাদের মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল। অতঃপর কবি তাঁহাকে নিজের গ্রন্থ ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দেন।

আচার্য ফর্মিকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধ অনুসারে উপনিষদ্ সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি উৎকৃষ্ট এবং এদেশেই প্রকাশিত হইবে। দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধগুলির পাঠ উপলক্ষ্যে এরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই, ও আচার্য মহাশয়ের এরূপ অভ্যর্থনা করেন নাই যদ্দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশে গৌরবান্বিত হইতে পারেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। ১৩৩২ সালে এই তারিখে যে উৎসব শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল, পঞ্চ বট রোপণ ও প্রতিষ্ঠা তাহার অংগীভূত ছিল, এবং গত বৎসর সে সময়ে কলিকাতায় কোন দাংগাহাংগামাও হয় নাই। এইজন্য গত বৎসর বর্তমান বৎসরের জন্মোৎসব অপেক্ষা জনসমাগম অধিক হইয়াছিল। কিন্তু এবারের জন্মোৎসবও সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছিল এবং শান্তিনিকেতনের সকলে এবং বাহির হইতে আগত অতিথিবর্গ অনুষ্ঠানের নানা অংগ হইতে সাতিশয় আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন। দুই একদিন আগে হইতেই অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শংখধ্বনি ও নহবতের বাদ্যের সহিত জন্মোৎসবের দিবারম্ভ হয়। আম্রকুঞ্জে আলিপনার চিত্রিত একটি স্থানের চারিপার্শ্বে সকলে সমবেত হইলে কার্যারম্ভ হয়। কবির নির্দিষ্ট স্থানে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে লইয়া গিয়া বসাইবার পর শংখধ্বনির পর সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ এবং কবির রচিত গান গাওয়া হয়। তদনন্তর প্রাচীন প্রথা অনুসারে জন্মতিথির ক্রিয়াকলাপ নির্বাহিত হয়। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা ও পুরন্ধ্রীগণ কবিকে পুষ্পফলাদি নানা অর্ঘ ও উপহার একে একে দেন। অন্যবিধ উপহারও কেহ কেহ দেন। তাহার মধ্যে নিকটবর্তী বল্লভপুর গ্রামের একটি সচিত্র হস্তলিখিত বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। উহা বিশ্বভারতীর গ্রাম সংগঠণ ও পুনরুজ্জীবন বিভাগ কর্তৃক রচিত। উহা মুদ্রিত হইলে অন্যান্য অঞ্চলের গ্রামহিতৈষী কর্মীদেরও কাজে লাগিবে।

অতঃপর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সংস্কৃতে অনুষ্ঠানোপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া ইতালীয় বাণিজ্য দূতকে কিছু বলিতে আহ্বান করেন। অতিথিদিগের মধ্যে কাহাকেও কিছু বলিতে আহ্বান করিবার বন্দোবস্ত আগে হইতে করা হয় নাই বলিয়া কার্যপদ্ধতিতে উহার উল্লেখ ছিল না। তথাপি তিনি যাহা বলিলেন তাহার সময়োপযোগিতা ও আন্তরিকতা মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। ইতালীয় কন্সাল মহাশয় ইতালীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা আছে তাহা বলিলেন, নিজের হৃদয়ের ভাবও প্রকাশ করিলেন। ইতালীয় লোকেরা

কিরূপ আগ্রহের সহিত তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা বলিলেন। তাহার পর তাঁহার পত্নী ইতালীয় প্রথায় নতজানু হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদনপূর্বক একটি সুন্দর পুষ্পপাত্রে পুষ্পোপহার দিলেন। অতঃপর ফ্রান্সের বাণিজ্যদূতও রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিজের ও ফরাসী জাতীর মনোভাব আবেগের সহিত বলিলেন। তিনিও সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব-ভারতীর চৈনিক বৌদ্ধধর্ম এবং চীন ও ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক ইতালীবাসী অধ্যাপক টুচ্চী অতঃপর ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিলেন এবং ইতালীয় প্রথায় নতদেহে তাহার হস্তচুম্বন করিলেন। তদনন্তর বিশ্বভারতীর চীনদেশীয় অধ্যাপক লিম্‌ঙো চিয়াং চীন দেশে রবীন্দ্রনাথের গমনের ফল ও মূল্য এবং তথায় তাঁহার জন্মদিনে তাঁহাকে নূতন চৈনিক নামদান, প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, ও ভারত প্রবাসী চীনদিগের পক্ষ হইতে কিছু অর্থ উপহার দিলেন। অতঃপর এণ্ড্রুজ সাহেব কবিকে দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা হইতে আনীত একটি উপহার দিলেন। তিনি বলিলেন যে, কেবল আফ্রিকার ভারতীয়েরা নহে, ডাচ্‌বংশোদ্ভূত বোয়ারেরাও কবিকে ভক্তি করে, এবং তথাকার আদিম নিবাসী বান্টুরা অতীতের অজ্ঞানান্ধকার হইতে নিষ্ক্রমণ করিবার পথে ভারতবর্ষের কবির বাণী হইতে আলোক পাইতেছে। অতঃপর অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলিলেন যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পোর বন্দরের মহারাজা কবিকে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে পাঁচ হাজার টাকা উপহার পাঠাইয়াছেন। ইহার পর মান্দ্রাজ প্রবাসী আইরিশ কবি, লেখক, অধ্যাপক এবং ভারতীয় শিল্পের গুণগ্রাহক ও গুণব্যাখ্যাতা ডাঃ জেম্‌স্‌ কাজিন্স কবির ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভূমিকা যে আইরিশ কবি ইয়েট্‌স প্রণীত তাহার উল্লেখ করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডকে কবির দেশ বলিলেন। এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা বলিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য বলেন। তাহা কেহ লিখিয়া লইয়া থাকিলে পরে প্রকাশিত হইবে, যদিও রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা এরূপ রিপোর্টে রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

সন্ধ্যার পর কবির সম্প্রতি লিখিত বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর যুগের আখ্যায়িকার ছায়া অবলম্বনে রচিত একটি নাটক অভিনীত হয়। ইহা আশ্রমের বালিকাদের জন্য লিখিত হয় এবং কেবল তাহারাই ইহার অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের সাজসজ্জা অতি চমৎকার হইয়াছিল। আলোকের বন্দোবস্ত এরূপ হইয়াছিল,. যে যখন উজ্জ্বল বা মৃদু আলোক, অথবা কম বা বেশী

অন্ধকার আবশ্যক তখন সহজেই তাহা করিতে পারা গিয়াছিল। অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ নায়িকা শ্রীমতীর অভিনয় একেবারে নিখুঁত এবং স্বাভাবিক ত হইয়াছিলই, অধিকন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে, ওরূপ অভিনয় প্রত্যক্ষ করিলে মানুষ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও উন্নততর লোকে অবস্থিত হয়। সাধারণতঃ মনে হইতেছিল, যে, বালিকারা অভিনয় করিতেছে না, যে যাহা সাজিয়াছে বস্তুতই সে তাহাই। বিশেষতঃ 'শ্রীমতী'কে তাহার মুখের মাধুরী শান্তশ্রী এবং ভক্তিভাবে ভিক্ষুণী শ্রীমতীই মনে হইতেছিল। অভিনেত্রী বালিকা ভিক্ষুণী শ্রীমতীর মর্মকথা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য কবির প্রতিভার প্রভাব এরূপ আশ্চর্য অভিনয়েও ছিল। কিন্তু যাঁহারা নাটকটি শুধু পড়িবেন, অভিনয় দেখিবার সুযোগ যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা উহার রস ও উৎকর্ষ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

অভিনয়ের পর আশ্রমস্থ সকলের ও অতিথিবর্গের আহার হইয়া গেলে বায়োস্কোপ দ্বারা আশ্রমজীবনের অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি সমুদয় অংগ প্রদর্শিত হয়।

কবি নিজের এই জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথের নূতন রচনা "বৈকালী"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন রচনা "বৈকালী" ইওরোপ যাত্রার দিনে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। উহা আগামী সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইবে।

ভাদ্র, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথের সহিত শত্রুতা

এবারে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইতালিতে উক্ত দেশের রাষ্ট্রনেতা মুসোলিনির অতিথিরূপে অবস্থান করেন। মুসোলিনি ইয়োরোপের একজন

মহা ক্ষমতাশালী লোক ও তাঁহাকে ইতালি-সম্রাট বলিলেও চলে। এহেন ব্যক্তির অতিথি হওয়া একজন বাংগালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। মুসোলিনির শত্রু অনেক এবং রবীন্দ্রনাথের শত্রুরও অভাব নাই। এই সকল কারণে আমরা জনসাধারণকে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি সংক্রান্ত খবরাখবর বিশেষ সাবধানতার সহিত পাঠ ও বিচার করিতে অনুরোধ করি। দুইজনেরই জীবন, আদর্শ পরস্পরের সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি নানা দিক দিয়া মিথ্যার সাহায্যে দুর্নাম রটাইবার চেষ্টা হইতেছে। এচেষ্টা যাহারা করিতেছে তাহারা ভারতের বন্ধু নহে। আমাদের পক্ষে কবি ফিরিয়া আসার পূর্বে এ সকল বিষয়ে কোন মতামত পোষণ না করাই শ্রেয়।

ভাদ্র, ১৩৩৩

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ

বিগত ১৫ই মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ, নন্দিনী, গৌরগোপাল ঘোষ ও ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণের সমভিব্যহারে বোম্বাই হইতে ইউরোপে যাত্রা করেন। ৩০শে মে তারিখে তিনি নেপল্‌স্‌-এ পেঁৗছিয়াছেন। জুন মাসের ১লা মে রোমে পেঁৗছিয়া কবি মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ করেন। মুসোলিনি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। অধ্যাপক ফর্মিকি ও ডক্টর টুচ্চীকে প্রচুর পুস্তকোপহার সহিৎ শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করিয়া মুসোলিনি ভারত ও ইতালীর মধ্যে সভ্যতার আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন বলিয়া মুসোলিনিকে কবি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইতালীয় সংবাদপত্রসমূহ কবির ইতালী পরিদর্শন সম্বন্ধে সোল্লাস প্রতি-বেদন প্রকাশ করে। ফ্যাসিস্ট্ আন্দোলনের প্রধানতম মুখপত্র ট্রিবিউনা কবির সহিত সাক্ষাতের এক দীর্ঘ বিবরণ ও তাঁহার হস্তলিখিত বাণী (রোম ২রা জুন) প্রকাশ করে। সে বাণী এই :

"ইতালীর মৃত্যুহীন আত্মা অগ্নিস্নান হইতে চিরোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উত্থিত হইবে, এই স্বপ্ন আমি দেখিতেছি।"

দুই চারিখানি সংবাদপত্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রচারিত ভারতীয় জীবনের দার্শনিকত্ব সম্বন্ধে একটু প্রতিবাদ ভাব পোষণ করে। La Voce

Republican (৪ঠা জুন) পত্রিকা লেখে :—"ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গতিশীল আর ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল ও দ্বৈতবাদমূলক। ঠাকুর মহাশয়ের এই দুই সভ্যতার মিলনের যে-ধারণা তাহা সর্বৈব আকাশ কুসুম মাত্র।"

ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যাপক সেনেটর কিয়াপেলি স্বীকার করেন না যে, ইউরোপ প্রাচ্যের দর্শন গ্রহণ করিবে।—

"ঠাকুর-মহাশয় মুসোলিনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন! কী ভীষণ বৈপরীত্য : ধ্যানগত ও কর্মময়—দুইটি জীবন মূর্ত দেখিতে চাহিলে ঠাকুর ও মুসোলিনি অপেক্ষা দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার যোগ্যতর প্রতিনিধি মিলিবে না। যে দেশ জগতে তাহার পথ কাটিয়া লইবে, যে দেশকে চরিত্র শক্তি ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি লাভ করিতে হইবে এবং সেই হেতু, কল্পনাজীবীর ভাবজাত আলস্য ও ধ্যানগত কর্মহীনতা পরিত্যাগ করিয়া যে দেশকে চরিত্র শক্তি ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি লাভ করিতে হইবে সেই দেশবাসী আমরা আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের বাণী আওড়াইতে পারি না।"

কবি ও তাঁহার সঙ্গীগণকে রোমের ফোরাম্, কলোসিয়ম্, কারাকালা বাথ্স্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান সমূহ দেখানো হয়।

৭ই জুন তারিখে রোমে কবিকে রোমবাসীর পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা করা হয়। ইতালীর ইন্টেলেক্চুয়্যাল ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে ৮ই জুন তারিখে কবি "শিল্পকলার অর্থ" (Meaning of Art) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

সেনেটর লুৎসাত্তি কর্তৃক পরিচালিত শান্তি উদ্যান (Gardens of Peace) নামক বিদ্যালয় কবি পরিদর্শন করেন। ইহা কবির শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শে পরিচালিত ; ইহা দেখিয়া কবি অত্যন্ত প্রীত হন।

১০ই জুন তারিখে রোম বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে বিপুল অভ্যর্থনা করে। ইহাতে রেক্টর্ অধ্যাপক ডেল্ ভেকিও ও অধ্যাপক ফর্মিকি ভারতবর্ষের দূত কবিকে সাদর বক্তৃতায় অভিনন্দিত করেন। ডক্টর ভেরা চের্তা নামে সংস্কৃত পরীক্ষার উপাধিপ্রাপ্তা এক ছাত্রী কবিকে মাল্য ভূষিত করেন। কবি উত্তরে বলেন—"বন্ধুগণ, ভারতের যুবক চিত্তের প্রেমোপহার আমি আপনাদের জন্য আনিয়াছি। আশা করি, আপনারা আমাকে তাহার উপযুক্ত বাহক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও কবি বলিয়া অন্তরে আমি যুবক, এবং

এইজন্য ভারতের যুবকদের প্রতিনিধি হইবার দাবি রাখি। আমরা পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন জাতি; আমাদের স্বার্থ বিভিন্ন, সুতরাং সে স্থানে আমাদের মিলন হইবে না। কিন্তু আমাদের স্বার্থ ব্যাপারের উর্ধে এমন এক জগৎ আছে যেখানে আমাদের আশা বাসনা সমান, কৃতিত্ব ও লাভ সমান; সেই জগৎই সমস্ত মনুষ্য জাতির সত্য মিলনভূমি (আনন্দ ধ্বনি)। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাস্তবিক মিলিয়াছে। আজ আমাদের এই পরস্পর মিলনে মানুষের আধ্যাত্মিক মিলন আমরা বোধ করিতেছি। আশা করি, আপনারা আমাকে একজন দৈবাৎ আগত পরিদর্শক বলিয়া মনে রাখিবেন না। আমাকে মনে রাখিবেন প্রাচীন প্রাচ্যের দূতরূপে, যৌবনশীল মানুষের কবি রূপে। ভবিষ্যতে সত্য ও প্রেমের তীর্থযাত্রায় যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের জন্য যুবক রোমের চিত্তে অতিথি আবাস স্থাপন করিয়া যাইতে যদি আমি সক্ষম হই তাহা হইলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিব (প্রচুর হর্ষধ্বনি)।"

ভাদ্র, ১৩৩৩

রোমে বিশ্বভারতীর কার্য

ইতালীর শিক্ষাবিভাগের কর্তাগণ, পণ্ডিতগণ ও ছাত্রগণ বিশ্বভারতী ও ইতালীর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পণ্ডিত ও ছাত্র আদান প্রদানের জন্য প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতীয় বিদ্যা শিক্ষার্থী শান্তি-নিকেতনে আগত কোন ইতালীর ছাত্রকে কবি আগামী অক্টোবর (১৯২৬) হইতে, পরবর্তী বৎসরের জন্য মাসে মাসে ৫০ টাকার বৃত্তি দিতে রাজী হইয়াছেন।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সস্ত্রীক রোমে গিয়া কবির সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা শেষে তিনি প্রস্তাব করেন যে রোমে বিশ্বভারতীর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হউক। এই প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। ঠাকুর সভা (Tagore Circle) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতেও শ্রোতৃবৃন্দ চেষ্টা করেন। শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল ঘোষ এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবার ভার লন। শ্রীনিকেতন কৃষি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিবার ইচ্ছায় সমবায় জাত কৃষি প্রণালী

বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ইণ্টারন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ এগ্রিকালচারে যোগ দেন।

ইহার পর কবি সদলবলে ফ্লোরেন্স যাত্রা করেন এবং সেখানে নিজের বিদ্যালয় (শান্তিনিকেতন) সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক প্যাভোলিনি শ্রোতৃবৃন্দের সুবিধার জন্য কবির বক্তৃতা ইতালীয় ভাষায় অনূদিত করেন। টিউরিন্ হইয়া রবীন্দ্রনাথ সুইজারল্যাণ্ডের ভিলন্‌এন্‌ভএ গমন করেন। সেখানে বিশ্রাম লাভার্থ ১২দিন (২২শে জুন হইতে ৪ঠা জুলাই) শান্তিপূর্ণ হোটেল বাইরনে রমাঁ রলাঁর সহিত বাস করেন। এইখানেই তিনি জর্জ ডুহামেল্, আগস্ট ফোরেল্, মর্মেল মার্টিনেট, অধ্যাপক ফেরিএর, চালস বৌডুইন প্রভৃতি মধ্য ইওরোপের লেখক ও বিদ্বজ্জনদের সহিত আন্তর্জাতিক ব্যাপারের আলোচনা করেন। সার জেম্‌স্ ফ্রেজার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

একদল যুবক গায়ক জেনেভা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সংগীতগানে প্রীত করে।

কবি তাহার পর ভিয়েনা গমন করেন। পরে তিনি দুইটি বক্তৃতা করেন। একটি লুৎসার্ণ-এ ও অপরটি ৎসুরিখ্-এ। তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণতন্ত্র পরিদর্শন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

আশ্বিন, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতালী ভ্রমণ

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতালী হইয়া আসিয়াছিলেন। ইতালীবাসীরা তখন তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করেন। ফ্লোরেন্স টিউরিন প্রভৃতি নগরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি এইসকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই; ইতালীতে পদার্পণ করার অল্পদিনের মধ্যে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসে তাঁহার পুনরায় ইতালী যাওয়ার কথাবার্তা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাহেতু তখনও তাঁহার যাওয়া ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে ইতালীর বর্তমান কর্ণধার বেনিটো মুসোলিনি রোমের অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির হাতে বিশ্বভারতীকে বহু সংখ্যক মূল্যবান ইতালিয়ান গ্রন্থ উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন ; কার্লোফর্মিকি বিশ্বভারতীতে কিছুকাল অধ্যাপনা করিতে আসেন। কিছুদিন পরে মুসোলিনি ডাক্তার জিউসেপ্পে টুচ্চি নামক অন্য একজন পণ্ডিতকে বিশ্বভারতীকে একটি নিখিল জাগতিক শিক্ষা ও মিলন কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবার সহায়তা করিবার জন্য পাঠান। ১৯২৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদ্বয়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ইতালী যাত্রার ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে ইতালিয়ন গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সাহায্য করিবেন বলিয়া উক্ত কর্মসচিবগণকে জানান। ইতালিয়ন জাহাজ নেপল্‌সের ক্যাপ্টেন ইতালিয়ন রাজসরকারের ভবিষ্যত অতিথি বিশ্বভারতীর দলকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন।

ইঁহারা যখন নেপল্‌স-এ পৌঁছিলেন তখন বেনিটো মুসোলিনি কবিকে ইতালী সরকারের তরফ হইতে অতিথি স্বরূপ রোমে অবস্থান করিবার জন্য যথার্থ নিমন্ত্রণ করেন ; কবি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। নেপল্‌স হইতে স্পেশাল ট্রেনে করিয়া কবিকে রোমে লইয়া যাওয়া হয় ; সেখানে রোমের বিশিষ্ট কর্মচারী ও অন্যান্য দেশের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদ্বয় কবির সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহাদের প্রেরিত সংবাদে বুঝা যায় যে, ইতালিয়ন রাজসরকার কবিকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন ও যে ভাবে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করেন তাহা রাজারাজড়াদের ভাগ্যেই ঘটে। বস্তুতঃ ইতিপূর্বে কোনো ভারতবাসীকে কোনো দেশে এরূপ সম্মান দেখানো হয় নাই। কবি যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন তখন ইতালীর রাজ-সরকারের অতিথিরূপে সেখানে যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। বিশ্বভারতী কর্ম-সচিবগণের প্রেরিত সংবাদ হইতে এইটুকু জানা যায় যে কবির মনোভাব পরিবর্তন যে কোন কারণেই ঘটুক না কেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে ইতালীতে পরিচিত করিবার পক্ষে মুসোলিনি কর্তৃক এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ভালই হইয়াছিল।

রোমে পদার্পণ করিবার পর দিন মুসোলিনির সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। মুসোলিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইতালিয়ান

ভাষায় অনূদিত আপনার সমস্ত বইগুলি পড়িয়াছেন বলিয়া যাঁহারা গর্ব করেন আমি তাঁহাদের একজন—আমিও আপনার একজন ভক্ত।" ডাঃ টুচ্চিকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণের জন্য ও বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে বহুমূল্য গ্রন্থমালা উপহার দেওয়ার জন্য কবি বিশ্বভারতীর তরফ হইতে মুসোলিনিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ভারতীয় ও ইতালীয় শিক্ষার্থীদের ও পণ্ডিতদের পরস্পর জ্ঞানের আদান-প্রদানের একটা ব্যবস্থা করিবার কথাও কবি সেদিন উল্লেখ করেন।

ইতালীর সংবাদপত্র সমূহও রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে। প্রায় সকল কাগজেই বড় বড় হরফে বিশেষ বিশেষ স্থলে তাঁহার সম্বন্ধে সংবাদ বাহির হইতে থাকে। কবি নেপ্‌লসের ইল মেজচ্ছোজোর্ণো নামক কাগজের সংবাদদাতাকে বলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে বহু বিষয়ে ইতালীই অনেকটা তাঁহার আদর্শানুযায়ী। ইতালীর গৌরবময় অতীত ও বর্ত্তমান তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। রোমের ত্রিবুনা নামক কাগজের সংবাদ-দাতাকেও তিনি এই ইতালী প্রীতির কথা জ্ঞাপন করিয়া ভারতবর্ষ ও ইতালীর ভবিষ্যত সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমার বিশ্বাস এই দুই জাতি পরস্পরের সহিত প্রীতি সূত্রে মিলিত হইবে ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। আমাদের জাতীয় উন্নতিতে তোমরা সাহায্য কর—ভারতবর্ষের আত্মার গভীরতার মধ্যে তোমরাও অনেক কিছু শিখিবার বিষয় পাইবে।" তিনি বলেন যে, তিনি ইতালীর এক মহান ভবিষ্যতের ছবি দেখিতে পাইতেছেন। "ত্রিবুনা" ইতালী সম্বন্ধে কবির উদ্দেশ্য ও মতের প্রভূত প্রশংসা করিয়া বলেন, "মুখে মুখে ও লেখনীর সাহায্যে কবির বাণী এশিয়ার সুদূর প্রান্তর অবধি ছড়াইয়া পড়িবে। যে শুভ কামনা এই বাণীতে আছে আমরা তাহা সমর্থন করি। আমাদের বিশ্বাস, কবির স্বপ্ন সফল হইবে।"

কবি ইতালীর জনসাধারণের নিকট ভারতবর্ষের প্রকৃতির অপূর্ব বর্ণনা প্রদান করেন। এই চমৎকার বর্ণনা ভঙ্গীতে সুদূর ভারতবর্ষ বিদেশী ইতালী-য়নদের কাছে জীবন্ত হইয়া উঠে; তাহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করিয়া তোলে। তিনি বলেন, "দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের বুকে কাল-বৈশাখীর রুদ্রলীলা আপনারা দেখেন নাই গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সহসা একদিন কালবৈশাখী নৃত্য সুরু হয়—দূরে দিকচক্রবালে সীমান্ত পর্যন্ত অনন্ত নীলাকাশ

কালোমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঘূর্ণী হাওয়ার ধূলিবালি মাতামতি করে। প্রবল বর্ষণ সুরু হয়······আমাদের তরুণেরা সেই ঝড়ের মাতনে পথে বাহির হয়—বাতাসের সহিত তাহারা দৌড়ের পাল্লা দেয়। আমাদের প্রান্তর সীমাহীন—দিগন্তব্যাপী ; উর্ধে নীলাকাশ ও নিম্নে বিস্তীর্ণ প্রান্তর—তাহাতে সবুজের আভাস কচিৎ দেখা যায়। বসন্ত সেখানে লঘুপদক্ষেপে ধীরে ধীরে আসে—পলাশের লালে প্রকৃতিদেবী রক্তিম হইয়া উঠেন।" রবীন্দ্রনাথের বাণী ও ব্যক্তিত্ব ইতালীয়নদের মনে গভীরভাবে অংকিত হইয়া যায়। তাহাদের একজন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম এক অসাধারণ মানুষ। তাঁহার রূপ ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে এমন একটা বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে, যাহাতে সহস্রের মধ্যেও তাঁকে চেনা যায়। তাঁহার হৃদয় উদার ; তাঁহার উদার প্রাণ ও গভীর সৌন্দর্যানুরাগের প্রেরণায় নিখিল জগতকে ভালবাসিবার ও বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পাইয়াছেন।" একজন সংবাদপত্রসেবী তাঁহাকে এ্যাসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও অভিমত ইতালীর সকলকে সমান আকর্ষণ করিয়াছিল বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার প্রতি ইতালীর এতটা সম্মান প্রদর্শন একদল সমালোচক পছন্দ করেন নাই। কিন্তু এই বিরুদ্ধবাদীরা সংখ্যায় নগণ্য। এ্যালেকস্যান্দ্রো কিয়াম্পেল্লি নামক একজন বৃদ্ধ ইতিহাসাধ্যাপক ও সেনেটার ইল্ মেসাজেরো নামক কাগজে লিখিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতা কর্ম ও গতি (প্রাণ) কেই বড় করিয়া দেখে সুতরাং প্রাচ্যের শান্তিপ্রিয়তা পাশ্চাত্যের গতিশীলতার সহিত খাপখাওয়ানো কঠিন। ভারতের অন্যতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধীর ভবিষ্যৎ বাণী সত্ত্বেও শুধু এই শান্তিবাদের ফলে আজও ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিল না।" যদিও এই উক্তির সত্যতা বিচারের বিষয় ও ঐতিহাসিক মহাশয়কে আমরা বলিতে পারি যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা পরাধীনতার সহিত কোন জাতির জীবনদর্শনের কোন যোগ দেখানো কঠিন কারণ পোল্যাণ্ড, গ্রীস, সার্ভিয়া বুলগেরিয়া পরাধীন এবং ইতালীও কিছুদিন আগে পর্যন্ত পরাধীন ছিল অথচ তাহারা প্রাচ্যের শান্তিবাদ মানে না। কিন্তু এই প্রতিবাদ করিয়া ফল নাই। ইঁহার কথায় আমরা এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের উল্লেখ করিতে গিয়াও কোনো কোনো বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হীনতার কথা ভুলিতে পারেন না।

ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে রোম ও তৎসন্নিকটবর্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ পরিদর্শন করিবার ব্যবস্থা ও সুবিধা করিয়া দিয়া যথেষ্ট অতিথিপরায়ণতা দেখাইয়াছেন। এই ভ্রমণের সময় প্রত্নতত্ত্ববিদ লুল্লী নামক একটি যুবক ইহাদের সংগী ছিলেন। কবি ক্যাপিটোলাইন হিল, ফোরাম, কোলোসিয়াম্, কারাকাল্লার স্নানাগার প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। রোমের জনসাধারণের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে সম্মান দেখান। রোম নগরীর পক্ষ হইতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ক্যাপিটোলে একটি বিরাট অভ্যর্থনা সভা হয়। সেখানে ইতালীর অনেক বিশিষ্ট ও গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ৮ই জুন কবি ইউনিওনে ইণ্টেলেকচুয়ালে ইতালিয়ান সংঘের ব্যবস্থায় আর্টের অর্থ বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কুইরীনাল থিয়েটারে এই বক্তৃতা দেওয়া হয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ এবং রোমের অভিজাত বংশীয়গণ প্রায় সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন: উপস্থিত লোকদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্য—দি অনারেবল মুসোলিনি, ইতালির প্রধানমন্ত্রী; দি অনারেবল সালান্দ্রা, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী; দি অনারেবল গ্র্যাণ্ডি; কাউণ্ট ডি আনকোরা প্রভৃতি। রোম বিশ্ববিদ্যালয় পরে কবিকে অভ্যর্থনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ডেল ভেক্কিও কবিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আজ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরম শুভদিন; বর্তমান যুগের মনীষীকুলের মধ্যে একজন পবিত্র, উদার ও যুগপ্রবর্তক মহাপ্রাণ আজ এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন; হে রবীন্দ্রনাথ, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছ এবং তোমার সোনার ভারতে আমাদের প্রেরিত সহাধ্যাপক টুচ্চিকে তোমরা যে সম্মান ও প্রীতি দেখাইয়াছ তাহার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

"তুমি রোমে অপরিচিত বিদেশী নও। কারণ অন্তরে অন্তরে রোম তোমাকে চিনিয়াছে। রোম নিখিল-মানব-চিত্তের সন্ধান জানিয়াছে। সুতরাং বিশ্বমানবের কোন প্রতিনিধি তাহার কাছে অপরিচিত নহে। নিখিলের সুখে দুঃখে আন্দোলিত তোমার কবিতা কেবলমাত্র হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে, তাহা আজ সমগ্র মানবজীবনের জীবনদর্শন। তোমার এই বাণী আমাদের চিত্তকেও আন্দোলিত করিয়াছে; আমাদের হৃদয়েও সাড়া তুলিয়াছে……তোমার বাণী আসলে

কর্মবাদেরই দর্শন, তোমার কবিতা কর্মবাদই প্রচার করিতেছে। তুমি যে কর্মকে বড় করিয়া দেখাইয়াছ তাহা জ্ঞান, ন্যায়পরতা ও সুসমঞ্জস প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত ; আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি আমার মনে হয়, ইহাই তোমার বাণীর অন্তর্নিহিত সত্য এবং ইহা আমাদেরও অন্তর্গূঢ় আদর্শ।" রবীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য ভাষায় এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেন। সভায় উপস্থিত প্রত্যেকে ভারতবর্ষ ও ইতালীর মধ্যে এক অভিনব প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন। এই ভাবে ভার্জিল, ডান্টে ও টাসো ; লিওনার্ডো, মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফেলের দেশে (ভারতের ও ইতালীর যোগ-সূত্র গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিয়া) রবীন্দ্রনাথের প্রবাস-বাস সমাপ্ত হয়।

আশ্বিন, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথের ইতালী যাত্রার উদ্দেশ্য

গত বৎসর ইতালীতে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন তাহা রক্ষার্থই তিনি এবার ইতালী গিয়াছিলেন। ইতালী রাজ-সরকারের এই আমন্ত্রণ হঠাৎ আসে নাই এবং পূর্ব হইতে এ বিষয়ে কোনও রূপ বন্দোবস্ত ছিল না। যথাবিধি ও যথাকালে এই নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। আমাদের ধারণা ছিল যে বেনিটো মুসোলিনির নেতৃত্বাধীনে ইতালীতে নিছক জাতি-সর্বস্ব শাসনতন্ত্র (narrow nationalism) প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই ইতালী রাজসরকারের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। কারণ তাঁহার আন্তর্জাতিক সেবা ও কর্মপ্রচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার বিশ্বমানবতা ক্ষুণ্ণ হইবে। আমাদের যতদূর মনে পড়ে যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন যে ইতালীর শাসনকর্তাদের তরফ হইতে কোন নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিবেন না। কেমন করিয়া বিশ্বভারতীর কর্ম-সচিববৃন্দ তাঁহাকে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণে প্রবর্তিত করেন আমরা তাহা অবগত নই। সম্ভবতঃ তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, এইরূপ করিলে বিশ্বভারতীর প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হইবে। আমাদের মনে তখন নানা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারিলেও রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রীচতুষ্টয়ের (অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি, জিত্তসেপ্পে টুচ্চি ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) বুদ্ধিশক্তির উপর আস্থা

স্থাপন করিয়া আশ্বস্ত ছিলাম ও আশা করিয়াছিলাম যে, ইতালীর মত এক প্রবল শক্তিশালী জাতির সহিত সখ্যতা বন্ধন স্থাপিত হইলে বিশ্বভারতীর তথা ভারতবর্ষের অনেক সুবিধার সম্ভাবনা আছে, আমরা প্রতিদিন সংবাদ পত্রের স্তম্ভে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের কথা যতই পাঠ করিতে লাগিলাম, যতই দেখিলাম বিশ্বভারতীকে সর্বত্র একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলা হইতেছে ও পৃথিবীর সর্বত্র শাখা-বিশ্বভারতী স্থাপিত করিবার জল্পনা হইতেছে, তখন আমাদের আশা বাড়িয়া গেল ; কবির সহযাত্রীদের উপর প্রভূত বিশ্বাস স্থাপিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ ইতালীতে বিপুল সম্মান ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন, যদিও এখনও এদিক ওদিক দুই একজন প্রজাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রবাদী, সাম্রাজ্যতন্ত্র -পরায়ণ “খুনে” মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দিয়াছে। পরাধীন জাতির একজন যে বর্তমানে পৃথিবীর প্রতাপ-শালী উন্নতিশীল এক জাতির মনে এতটা প্রীতি জাগাইতে সক্ষম হইবে ইউরোপ তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ইতালীর হৃদয় জয় করিলেন। ইতালী দ্বিধাশূন্য চিত্তে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। ইহা হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগের নিদর্শন। বৃথা তোষামোদ নহে। কিম্বা প্রীতির ভাব দেখাইবার ভাণমাত্র নহে। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সহিত যুদ্ধকালে যে জাতি লোকবল অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ইতালীর সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ, সেই জাতির সহিত মিথ্যা প্রীতির ভাব দেখাইয়া কোন লাভ নাই। এই সখ্য-বন্ধন এক অতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী, বহুদিন যাবত নিগৃহীত, পরাধীন ও পরশোষিত জাতির অপর এক পরপদানত দেশের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতালীকে বর্তমান স্বাধীন অবস্থায় উপনীত হইতে যে অন্ধকার, রক্তস্রোত ও হানাহানির ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে তাহার বেদনা ও ব্যথা এখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই বলিয়া অনুরূপ অবস্থা সম্পন্ন ভারতের প্রতি ইতালীর এই প্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তরুণ ভারতের বার্তাবহরূপে ইতালীতে গিয়াছিলেন। ইতালীর তরুণদল তাঁহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বমানবতার প্রচারকের সহিত একজন ফ্যাসিস্টের মিলন সম্ভব কিনা আমরা তাহার বিচারে অক্ষম ; কিন্তু আমরা

এই মিলনের মধ্যে ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের মিলনের ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তন

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠিটি মিঃ সি. এফ্. এণ্ড্রুজকে লিখিত। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ট দল ও তাহাদের রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা নাকি কবিকে শুধু ইতালী রাজতন্ত্রের ভাল দিকটাই দেখাইয়া কবির উপর এক নীচ চাল চালিয়াছেন, ইত্যাদি। কবির সহযাত্রী বিশ্বভারতীর কর্মাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রেরিত ভারতবর্ষ ও ইতালীর প্রীতিবন্ধন ইত্যাদির সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদের পর এই সমালোচনা পড়িয়া আমরা আশ্চর্য হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি হইতে বুঝা যায় যে, ফ্যাসিস্ট দল নানা উপায়ে কবিকে ধাপ্পা দিয়াছেন। ইতালীতে পদার্পণ করিবার পর মুহূর্ত হইতেই তাঁহারা তাঁহাকে এরূপ চরকি ঘোরান ঘোরাইয়াছেন যে, তিনি ফ্যাসিস্ট দলের দুর্নীতি ইত্যাদির কথা ভাবিবার বা দেখিবার অবসর মাত্র পান নাই। ফ্যাসিস্ট কাগজে তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অভিমতগুলিকে ফলাও করিয়া দেখাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সম্ভবতঃ ইতালীর বাহিরে গিয়া ভিন্নদেশীয় লোকদের মুখে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ জানিয়াছেন ও ইতালীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসমূহের অনুবাদ পড়িয়া তাহাদের মিথ্যা ভাষণের বহর দেখিয়াছেন।

কবি যে ভাবেই ইতালী সম্বন্ধে সত্য খবর জানিতে পারিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার পক্ষে এই সকল সত্য পূর্ব হইতেই অনুসন্ধান করিয়া ইতালী ভ্রমণকালে তদ্দেশীয় গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। আমাদের দেশেরও ইহাতে মঙ্গল হইত । কারণে যে, কবি পূর্বে ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ও পরে তাঁহাদিগের সমালোচনা করিয়া ইতালীয়দিগের মনে যে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে কোন প্রকারেই লাভ জনক হইতে পারে না। যে অতিথি ও যে আতিথ্য

দান করে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে আদর্শ তাহাও ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইহাও না হইলেই ভাল হইত।

কবি বর্তমানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইয়োরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সকল খবরাখবর লইয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হওয়া সম্ভব নহে। কোন্ দেশের কোন্ রাষ্ট্রনেতা কিভাবে নিজ দেশের উন্নতি বা অবনতি সাধন করিতেছেন তাহারও হিসাব রাখা কবির পক্ষে সম্ভব নহে। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি ভুলক্রমে সংকীর্ণচেতা কোন রাষ্ট্রনেতার আতিথ্য গ্রহণ করেন ও তাঁহার সম্বন্ধে সখ্য ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কোন মত প্রকাশ করেন তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না যে কবি উক্ত রাষ্ট্রনেতার বিষয়ে সেই এক মতই চিরকাল পোষণ করিবেন বা করিতে বাধ্য। আমাদের দেশে কোন কোন বড় রাজকর্মচারী বহুকাল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের "নিমক" খাইয়া ও উক্ত গভর্ণমেণ্টের সমর্থন করিয়া অবশেষে তাঁহাদিগের বিষয় নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। তাহার জন্য আমরা এই সকল রাজকর্মচারীর প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা করি নাই। কবি যদি বিদেশে কোন ধূর্ত রাষ্ট্ররথীর চক্রান্তে পড়িয়া ভুল বুঝিয়া কোন কথা বলেন এবং পরে যদি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভিন্নমত প্রচার করেন, তাহাতে দোষের কিছুই নাই। কিন্তু যদি তিনি বা তাঁহার কর্মসচিবগণ উন্মুক্তচক্ষু অবস্থায় সংকীর্ণ স্বদেশবাদের চরম উদাহরণ ইতালীর প্রভু মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ উন্নত ও উদার-বিশ্ব-প্রেমবাদীর অনুপযুক্ত কার্য করেন ও দ্বিতীয়তঃ যে কোন কারণ দেখাইয়া তীব্র সমালোচনায় সেই মুসোলিনির আতিথেয়তার প্রতিদান করেন, তাহা হইলে অন্তত একথা বলিতে হয় যে, ব্যাপারটি সকল দিক্ হইতে দেখিলে আদর্শরূপে সম্পন্ন হয় নাই। দার্শনিক কবি সকল বাহ্যিক অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন ; তাঁহাকে কাহারও আতিথেয়তা গ্রহণ করা বা না করা বিষয়ে আধুনিক রাষ্ট্রজগতের সকল অবস্থা বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আশা করা আমাদের পক্ষে দুরাশা হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ কর্মসচিবদ্বয়, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (যাঁহারা যুবক, বর্তমান জগতের সকল অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ, ইয়োরোপ-আমেরিকার বহু মনীষীর সহিত পত্রালাপে তৎপর এবং সুচিন্তা ও সুব্যবস্থায় বিচক্ষণ তাঁহারা) কি বলিয়া কবিকে ইতালীর স্বেচ্ছাচারী নেতা ও মানব-স্বাধীনতার আদর্শের

বিরুদ্ধাচারী মুসোলিনির গৃহে অতিথিরূপে লইয়া গেলেন ? মুসোলিনির কার্যকলাপ যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্যে ভাল হউক বা মন্দ হউক, একথা সত্য যে, মুসোলিনির মতামত কবির মতামতের প্রায় সম্পূর্ণ উল্টা। কবিকে এই মুসোলিনির অতিথি করিয়া লইয়া যাওয়া উপরোক্ত বুদ্ধিমান যুবকদ্বয়ের পক্ষে কখনও উচিত হয় নাই। মুসোলিনি শব্দের অর্থ কি, তাহা তাঁহারা জানিতেন (কবি না জানিলেও) এবং ইতালীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সখ্য স্থাপনের প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা ইহাদিগের সেই মনোভাবেরই পরিচয় পাই যে-পরিচয় আমরা তাঁহাদিগের বিশ্বভারতীর সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টার মধ্যে পাইয়াছিলাম। কবি রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষানীতির আজন্ম সমালোচক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যখন বিশ্বভারতীর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হয় তখন আমরা সে চেষ্টার মধ্যে compromise বা আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া লাভের চেষ্টার পরিচয় পাই। এই অল্প লাভের আশা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহান্ ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত নয়। কারণ যে কবি, যে মহাপুরুষ স্থান, কাল ও পাত্রের সকল প্রলোভন ও অত্যাচার প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া দীর্ঘ পঞ্চাশ বর্ষাধিককাল নিজের জীবনের আদর্শের গতি শ্রেয়ের পথে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কদাপি ক্ষুদ্র সুবিধার চেষ্টায় আদর্শকে বলিদান দিতে পারেন না। যে অদূরদর্শিতার ও আদর্শ নিষ্ঠার অভাবের পরিচয় আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয় ঘটিত ব্যাপারে প্রথম পাই আজ কবির কর্মসচিবদিগের ইতালীয় "এ্যাডভেনচারে" আমরা তাহারই পরিচয় দ্বিতীয় দফায় পাইলাম।

দরিদ্র ভারত যদি কোনদিন জগতকে কোন সত্য বাণী শুনাইয়া থাকে তাহা হইল সে বাণী উত্থিত হইয়াছিল গভীর অরণ্যবাসী নিঃসম্পদ রিক্তভূষণ ঋষির কণ্ঠ হইতে। তাহার পশ্চাতে ছিল নীরব নিরাড়ম্বর সাধনা। কবি রবীন্দ্র নাথের জীবনে ও তাঁহার শান্তিনিকেতনে আমরা এই প্রাচীন যুগের কর্মী দিগেরই জীবন ও কার্যের ছায়া এখন অবধি দেখিয়াছি। ইহাই তাঁহার বিশ্ব-ভারতীতে আরও গভীররূপে ব্যক্ত হইবে বলিয়াই আমাদিগের আশা। ভগবান কবি ও বিশ্বভারতীকে "ফরেন পলিসি" "ডিপ্লোম্যাসি" ও "হাইফাইন্যান্সের" কবল হইতে রক্ষা করুন। তাঁহার অনুচরদিগের মধ্যে এসকল দিকে আকাঙ্ক্ষা যাহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের স্থান "স্বরাজ পার্টি'তে," বিশ্বভারতীতে নহে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

আত্মীয় বিচ্ছেদে মানুষ যেরূপ ব্যথা পাইয়া থাকে সেইরূপ একান্ত আন্তরিক বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী আশ্রমের কর্মী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার গত ৩রা নভেম্বর কলিকাতা নগরীতে ৪১ বৎসর বয়সে অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি বালককে লইয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন সন্তোষচন্দ্র তাহাদের অন্যতম। এদেশের শিক্ষার পর তিনি আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গো পালন প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। দেশে ফিরিয়া তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি গোশালা স্থাপন করেন ও কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সেই সংগে অধ্যাপনাও তিনি করিতেন। পরে তিনি সুরুল শ্রীনিকেতনে এই সকল কার্যপরিচালনা করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ও এইখানে অনাথ বালকদিগকে সকল কার্যে স্বাবলম্বী হইতে ও সাধারণ শিক্ষার সংগে নানা অর্থকরী বিদ্যা প্রাণ দিয়া শিখাইতে লাগিয়া ছিলেন।

সন্তোষচন্দ্র জীবনে আশ্রমের শিক্ষাকে নানাভাবে সার্থক করিয়াছিলেন। অতিথি সেবা ও ভদ্রতা তাঁহার ভূষণস্বরূপ ছিল। বিশ্বভারতী যুগের পূর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল, তখনকার দিনে আশ্রমের উৎসবাদি ব্যাপারে এমন কোনো অতিথি বোধ হয় যান নাই, যিনি সন্তোষচন্দ্রের আতিথ্য ও সেবায় মুগ্ধ হন নাই। রাত্রি হউক, দিন হউক, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়, শরীর ভাল থাকুক বা না থাকুক অতিথির সেবায় তিনি চির জাগ্রত ছিলেন। শীতের রাত্রি দ্বিপ্রহরেও নিজে গরুর গাড়ী হাঁকাইয়া অতিথিদের ষ্টেশনে পেঁছাইয়া দিয়াছেন, পাছে তাহাদের ট্রেন ফেল হইয়া যায় তাই তিনি রাত জাগিয়া যথা কালে তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছেন। কে কোথায় বেড়াইতে যাইবে, কে কি খাইবে, কোথায় ঘুমাইবে সকলকার সকল প্রয়োজন তিনি দেখিয়া

বেড়াইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে সে আতিথ্য ও সেবার ছবি আর দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ।

ভদ্রতায় তাঁহার দোসর কম মিলিত। তাঁহার আচারে ব্যবহারে কথায় বার্তায় ভদ্রতায় আদর্শ হইতে কোনো চ্যুতি কখনও দেখা যাইত না।

আশ্রমবাসী ও আশ্রমবন্ধু সকলকে আত্মীয় করিয়া তুলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এ বিষয়ে বিশ্ব ভারতীর আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

গুরু ও গুরুস্থানীয়দের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা আদর্শ স্থানীয় ছিল। তাহাতে কোনো খাদ ছিল না।

তিনি গোঁড়া হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিলেও স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অতি উদার মত পোষণ করিতেন। সকল নারীরই যে কোনো না কোনো অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, ইহা ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্বভারতীর সেবাধর্মের প্রাণস্বরূপ সন্তোষচন্দ্রের অকাল প্রয়াণে তাহার যে ক্ষতি হইল তাহা কোনদিন পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

তাঁহার শোকার্ত মাতা পত্নী ভগ্নীগণ ও শিশু পুত্রদের এই শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই দেশে ফিরিতেছেন। এবার তাঁহাকে ইয়োরোপে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কবি অধিকাংশ স্থলে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি এইবার দেশে ফিরিয়া কিছুকাল শান্তিতে নিজ কার্য করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এবার বৈজ্ঞানিক জগৎ জয় করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। আগামী ৩০ শে নভেম্বর তাঁহার অষ্ট ষষ্ঠিতম জন্মদিন। আমরা বিজ্ঞানাচার্য বসু মহাশয়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথ

আশ্বিন (১৩৩৩) সবুজপত্রে 'প্রবাসী' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা সমগ্র কিম্বা আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করা প্রবাসীর পক্ষে শোভন হইবে না। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করাও ভদ্রতা ও বন্ধুত্বের রীতি বিরুদ্ধ, সুতরাং এ প্রসংগে আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রবাসীর আজন্ম সম্বন্ধের কথাই বলিব। প্রবাসীর সাহিত্যিক আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ভিতর একটা যোগ থাকাতে এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে প্রবাসীর সম্পাদক তাঁহাকে অতি প্রিয়জনরূপে বহুকাল শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখাতে প্রবাসী কোনো দিন রবীন্দ্রনাথকে লেখকমাত্র কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকমাত্ররূপে দেখিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীর আত্মীয় স্বরূপ। অর্থ ও রচনার আদান প্রদান এ সম্বন্ধের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি করিতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে প্রবাসী কিছু পাইয়াছে বলিয়া মনে করেনা। তাঁহার অক্ষয় লেখনী প্রসূত অমূল্য রচনাকে সে বন্ধুত্বের উপহাররূপেই গণ্য করিয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে যৎসামান্য সাহায্য করিতে পাইয়া বন্ধুজনোচিত আনন্দই লাভ করিয়াছে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন

পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মধ্যে জার্মানীতেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। জার্মান ভাষাতে তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক অনূদিত হইয়াছে ও এইগুলির বহুল প্রচার হইতেছে। জার্মানীর বহুলোকে রবীন্দ্র নাথের 'সাধনা' বহিখানিকে 'জীবন-বেদ' স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকেন। যুদ্ধ সমাপ্তির অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ যখন জার্মানী গিয়া ছিলেন তখন তথাকার জনসাধারণে তাঁহাকে যে বিপুল সম্মান দেখাইয়াছিল তাহার তুলনা হয়

না। তাঁহার এইবারের অভিযানও অন্যদিক দিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ভন্ হিণ্ডেনবার্গ ও ডাঃ আইনস্টাইনের মত লোকেও প্রাচ্য কবির মনীষীর প্রতি অবনত মস্তকে অর্ঘ নিবেদন করিয়াছেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও ভারতের ঋষিকবির এই পরস্পর সাক্ষাৎ—ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও কবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মনীষা অধঃপতিত ভারতবর্ষকে জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে।

পৌষ, ১৩৩৩

রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ

আশ্বিনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আমাদিগকে মৌখিক বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কবির এইবার ইতালী যাত্রার বিরোধী ছিলেন। কবি স্বয়ংও আমাদিগকে মৌখিক এই কথা বলিয়াছেন।

মাঘ, ১৩৩৩

বিশ্বভারতী পুনর্দর্শন

ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিন অনুপস্থিত থাকিবার পর কয়েকদিন পূর্বে শান্তিনিকেতন গিয়াছিলাম। নূতন যাহা দেখিলাম, তাহাই বলিতেছি। ছাত্রদের থাকিবার জন্য একটি নূতন পাকা বাড়ী নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে তাহাদের থাকিবার সুবিধা হইয়াছে। একজন অধ্যাপক নূতন আসিয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, এম্-এ। তিনি পূর্বে বিহারের একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর তিনি তথাকার অধ্যাপকতা ত্যাগ করেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এবং দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেশে দর্শন শিক্ষার পর অকসফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে দর্শনের চর্চা করেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার আগমনে পুষ্ট হইয়াছে। ভিয়েনা হইতে কুমারী লিজা ফন্ পট নাম্নী এক মহিলা আসিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে কোন কোন বিষয় শিখাইতেছেন।

ফাল্গুন, ১৩৩৩

শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসব

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। ইহা বোলপুরের নিকটস্থ সুরুল গ্রামে স্থিত। ইহার দ্বারা সুরুল ও নিকটবর্তী অন্য অনেক গ্রামের অনেক উপকার হইতেছে। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান। গ্রামগুলি না বাঁচিলে বাংলা উৎসন্ন যাইবে। গ্রামগুলিকে নূতন ও আনন্দময় জীবন দিতে হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। আবার, তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে গ্রামের লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ এবং পরস্পরের সহযোগী করিতে হইবে, জ্ঞান দিতে হইবে, চাষের উন্নতি করিতে হইবে, এবং তন্তুবায় চর্মকার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকদের শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শ্রীনিকেতনের কর্মীরা, কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারা নহে, পরন্তু কাজ করিয়া ও কাজ করিতে শিখাইয়া এই সমুদয় দিকে গ্রামবাসী-দিগকে স্বয়ং নিজের হিত নিজে করিতে সমর্থ করিতেছেন। এইজন্য ইহার কাজের উন্নতি, বিস্তৃতি, স্থায়িত্ব ও সাফল্য সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেদের জমিদারীতে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা কিছু কিছু করিয়াছেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহি। কিন্তু শ্রীনিকেতনের কাজ সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে। এইজন্য বলিতে পারি, এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন, যে, তিনি কবি হইলেও কাজের লোক, এবং তাঁহার এই কাজ গ্রাম পুনর্গঠনের রাজনৈতিক ধুয়া উঠিবার পূর্বে আরব্ধ হইয়া কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই কাজের প্রধান সহায় আমেরিকার মিসেস স্ট্রেট (এক্ষণে মিসেস এলম্‌হার্স্ট) এবং মিস্টার এলম্‌হার্স্ট ধন্যবাদার্হ।

চৈত্র, ১৩৩৩

অকসফোর্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সম্মান

রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দিয়া সম্মান করিতে চাহিলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তথাপি সংবাদ হিসাবে

লিখিতেছি, যে, ইউরোপ ভ্রমণকালে জ্ঞাত হইয়াছিলাম, যে ইংরেজ 'রাজকবি' রবার্ট ব্রিজেস জানিতে চাহিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ অকসফোর্ডের সাহিত্যাচার্য উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কিনা। সম্মানার্থ প্রদত্ত অকসফোর্ডের উপাধি কিন্তু তথায় গিয়া লইতে হয়। তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের গত নবেম্বর মাসে আবার বিলাত যাওয়া আবশ্যক হইত। সম্ভবতঃ বিলাত যাইবার তাঁহার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না, ভারতে শীঘ্র ফিরিবার প্রয়োজন ছিল ও স্বাস্থ্যও ভাল না বলিয়া তিনি নবেম্বরে সে দেশে না গিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। এইজন্য অকসফোর্ড তাঁকে প্রস্তাবিত উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

রবীন্দ্রনাথের নূতন সম্মান

আমরা পাশকরা বাঙালীরা মনে মনে এই সন্তোষটুকু লাভ করিতে পারিতাম, যে রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হউন, তাঁহার মনে মনে নিশ্চয়ই এই দুঃখটা আছে, যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এবার তাঁহার সে দুঃখ দূর হইল, এবং আমাদের লুক্কায়িত উল্লাস চূর্ণ হইল। কাগজে দেখিলাম, সম্প্রতি প্রবর্তক সঙ্গের উৎসবে তাঁহাকে যে অভিনন্দিত করা হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে তিনি নিতান্ত মন্দ ছেলে নন—পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম হইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, এবং দ্বিতীয় শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই খবরটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা কি কি বিষয়ে হইয়াছিল এবং পরীক্ষক কে কে হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্তগণ কৌতূহলী হইবেন।

প্রবর্তক সংঘ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন অভিনন্দন-রীতি অন্যত্র অনুসৃত হইবে কি না তাহাও অনুমানের বিষয় হইবে।

আষাঢ়, ১৩৩৪

রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যাত্রা

কিছুদিন পূর্বে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অনেক কাগজে এই সংবাদ বাহির হয়, যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডচ গবর্ণমেণ্ট জাভা দ্বীপে আগমন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত লোককে ডচ গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ করা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু ডচ জাতি শাসক শোষক সাম্রাজ্যাধিপতি জাতি এবং জাভাতে গত বৎসর বিদ্রোহও হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আদর্শের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মানবিক আদর্শের কোন মিল নাই। এইজন্য এ বিষয়ে ঠিক খবর জানিবার নিমিত্ত আমরা রবীন্দ্রনাথকে শিলঙে চিঠি লিখি। জানিতে পারি, যে, ডচ গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ ও তাঁহার তাহা গ্রহণের সংবাদ মিথ্যা। প্রকৃত সংবাদ যাহা তাহা আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজে ছাপিয়াছি। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, যাঁহারা আগে ভুল সংবাদ ছাপিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ভ্রম সংশোধন করেন নাই। একমাত্র ঢাকার ঈষ্ট বেঙ্গল টাইমস্ মডার্ণ রিভিউয়ে মুদ্রিত ঠিক খবর ছাপিয়াছেন। প্রকৃত সংবাদ নীচে দিতেছি।

বলী দ্বীপে হিন্দু সভ্যতা আলোচনার জন্য কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তথায় লইয়া যাইবার অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। সেখান হইতে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও সে সম্বন্ধে তথায় গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করিবারও তাঁহার ইচ্ছা আছে। তিনি নিজে বোধ হয় সেখানে অল্প দিনই থাকিবেন; সম্ভব হইলে কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রাখিয়া দিয়া আসিবেন। কাজটিকে তিনি গুরুতর প্রয়োজনীয় মনে করেন। জাভা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সেখান হইতে যাঁহারা এই বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছেন, তাঁহারা পুরাতত্ত্ববিৎ; আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পাইলে তাঁহাদের সন্ধান কার্যের সুবিধা হইতে পারিবে।

রবীন্দ্রনাথ যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিবেন, তাহাতে বাংলা দেশের এবং জগতের সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক লাভ হইবে। এইজন্য, তাঁহার বিদেশ

ভ্রমণের অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও, তাহা বাঞ্ছনীয়। বলী দ্বীপের হিন্দু সভ্যতা আলোচনা, তথা হইতে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও তথায় সে সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবে। যাঁহাদের-এ বিষয়ে অনুরাগ, বিদ্যাবত্তা, কার্যতৎপরতা এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ বিচার করিবার শক্তি আছে, এরূপ লোক অপ্রাপ্য না হইলেও খুব সহজে প্রাপ্য নহে। আশা করি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অন্ততঃ দুই এক জন লোকও পাইয়াছেন।

তিনি যে নিজে বেশী দিন বাহিরে থাকিবেন না, ইহাও ভাল খবর। কারণ, বিশ্বভারতীর বিধিব্যবস্থা প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও, আমাদের দেশের অন্য অনেক কাজের মত ইহারও সাফল্য এখনও ইহার প্রতিষ্ঠাতার মনোযোগ এবং কর্মক্ষেত্রে উপাস্থিতর উপর নির্ভর করে। তিনি ইহার প্রাণ, এবং তাঁহাতে কর্মিষ্ঠতা, বিদ্যাবত্তা, মনস্বিতা, কবিপ্রতিভা, সাত্বিকতা ও মানবপ্রেমের একত্র সমাবেশ বশতঃ তিনি ইহার সকল কার্য ও চেষ্টার ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে সমর্থ। অধিকন্তু আমরা জানি, ইহার অধ্যাপক ও ছাত্রেরা তাঁহার সান্নিধ্যের আনন্দ ও উপকার হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকিতে চান না।

শ্রাবণ, ১৩৩৪

বিশ্বভারতীতে নিজামের দান

বিশ্বভারতীতে নিজামের একলক্ষ টাকা দান সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন :—

"বোলপুর বিশ্বভারতীতে হায়দ্রাবাদের নিজামের এক লক্ষ টাকা দানের সংবাদে আমরা খুব সুখী হইতে পারি নাই। শুনিতেছি যে, নিজাম নাকি এই সর্তে দান করিয়াছেন যে, ঐ টাকায় বিশ্বভারতীতে "মুসলমান সভ্যতা" শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ তাহার ফলে বিশ্ব-ভারতীতে মুসলমান অধ্যাপক ও মুসলমান ছাত্রেরাও হয়ত প্রবেশ[illegible] করিবে। নিজাম সমস্ত ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য একরূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং খাজা হাসান নিজামী এই ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। 'বিশ্বভারতী'তে এই লক্ষ টাকা দান

যে, মুসলমান ধর্ম প্রচারেরই একটি অঙ্গ নহে, তাহা কে বলিবে? বিশ্ব ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার পরিচালকগণ এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?"

নিজামের ইসলাম ধর্ম প্রচারের উৎসাহ আছে, ইহা সত্য; কিন্তু তিনি ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যেই বিশ্বভারতীতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি না। তিনি কি সর্তে টাকা দান করিয়াছেন, তাহা আমরা এখনও জানি না। যখন জানিতে পারিব, তখন প্রয়োজন হইলে আলোচনা করিব। এখন পর্যন্ত যাহা জানি তাহা এই। ইউরোপের অনেক লোক সংস্কৃত ও পালি শিখিয়া ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য সাহিত্যের চর্চা করেন কিন্তু তাঁহারা হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ হইয়া যান না। ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা আরবী ও ফারসী শিখিয়া ইস্‌লামিক সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করেন, তাঁহারা মুসলমান হইয়া যান না। বিশ্ব-ভারতীতে ইস্‌লামিক সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি চর্চার জন্য নিজাম টাকা দিয়াছেন। এইরূপ চর্চা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়। সরকারী টাকায় হয়।

আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের সব ধর্মসম্প্রদায় পরস্পরের ভাল যাহা আছে তাহা জানিতে পারিলে পরস্পরকে ঠিক্ বুঝিবার ও শ্রদ্ধা করিবার সুবিধা হইবে। এই কারণে কেহ যদি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হায়দ্রাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সভ্যতার চর্চার ব্যবস্থা করাইতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

বিশ্বভারতীতে বিদেশী ও দেশী খৃষ্টিয়ান অধ্যাপক আগে ছিলেন এবং এখনও আছেন, কিন্তু কেহ খৃষ্টিয়ান হন নাই। মৌলানা জিয়াউদ্দীন নামক একজন মুসলমান অধ্যাপকও আগে ছিলেন। এখন বোধ হয় নাই। মুসলমান ছাত্রও বরাবরই দু-একজন ছিল, এখনও হয়ত আছে।

বিশ্বভারতীতে মিশরের রাজার দান

মিশরের রাজা ফুয়াদ বিশ্বভারতীকে অনেকগুলি ভাল ভাল আরবী বহি দিয়াছেন। ইহার সদ্ব্যবহার হইলে সুখের বিষয় হইবে। রামমোহন রায় বেশ

ভাল আরবী জানিতেন, কিন্তু তিনি মুসলমান হইয়া যান নাই। হিন্দু সমাজ ভুক্ত অন্য অনেক বাঙালীও বেশ আরবী জানেন।

শ্রাবণ, ১৩৩৪

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্যে মালয় উপদ্বীপ শ্যাম কাম্বোজ যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপ যাইতেছেন, তাহা পাঠকেরা অবগত আছেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বর্ধনার নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে এক সভার অধিবেশন হয়। বৃহত্তর ভারত পরিষদের যে কাজ, সেরূপ কাজ করিবার সংকল্প প্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হয়;—পরিষদের ও ইন্‌স্টি-উটের সভার সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলেন যে, দশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এমন একজন শিক্ষিত যুবক জুটাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন যিনি যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপের ভাষা শিখিয়া তথায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার ইতিহাস রচনার সাহায্য করিতে পারিবেন। অতএব পরিষদই যে তাঁহার সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহা যথাযোগ্য কাজ হইয়াছিল। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তাঁহাকে বৃহত্তর ভারতের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন কার্যে পুরোধা বলিয়াছেন—চীন জাপানে ভ্রমণ করিয়া তিনি এই কাজের সূত্রপাত আগেই করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কার্যত: যাহা ছিলেন, বৃহত্তর ভারত পরিষদের সভ্যত্ব স্বীকার করিয়া নামেও সেই পুরোধা পদবী গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন।

সভারম্ভে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবির কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া ও মস্তকে ধান্যদূর্বা ছুঁয়াইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন ও তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দেন। তাহার পর তিনি একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি নীচু গলায় কথা বলাতে বৃহৎ হলে তাঁহার কথা শুনা যায় নাই, সুতরাং কোন কাগজে তাঁহার বক্তৃতা বাহির হয় নাই। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখান, কত কত বাঙালী ধর্মোপদেষ্টা স্বদেশের মায়া কাটাইয়াও স্বদেশের হিত সাধনার্থ দেশে থাকিবার প্রবল কারণ সত্ত্বেও তিব্বৎ মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় কবির সংস্কৃত প্রশস্তি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ীও স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন। পনের শত বৎসর পূর্বে কুমারজীব চীনে গিয়া চীন ভাষায় যে সব কবিতা রচনা করেন, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাহার একটি চীন অক্ষরে লিখিয়া ইংরেজী অনুবাদ সহ কবিকে উপহার দেন। অতঃপর অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ইংরেজীতে কেন বলিবেন বাংলায় তাহার কারণ দেখাইয়া, ইংরেজী বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহাতে তিনি কবিকে পূর্বতন ঋষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনা-জীবিত একমাত্র ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। এই বক্তৃতা ইংরেজী বহু দৈনিকে বাহির হইয়াছে। ইহার পর প্রবাসী-সম্পাদক কিছু বলিবার পর কবি অভিনন্দনের উত্তর দেন। এই উত্তর বর্তমান সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত তল্লিখিত প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। কবির বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রচলিত রীতি অনুসারে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষ্যে কয়েকটি সুচিন্তিত কথা বলেন। সর্বশেষে কবি বৃহত্তর ভারত পরিষদের যুবা কর্মী-দিগকে সস্নেহ আশীর্বাদ করেন।

শ্রাবণ, ১৩৩৪

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ যাত্রা

২৭শে আষাঢ় ১২ই জুলাই রবীন্দ্রনাথ হাওড়া ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়াছেন। ট্রেন ছাড়িবার আগে ও ছাড়িবামাত্র সিনেমার জন্য ছবি লওয়া হইয়াছে। ২৯শে আষাঢ় তিনি মাদ্রাজ হইতে একটি ফ্রেঞ্চ জাহাজে সিংগাপুর যাইবেন। সেখানে পেঁছিতে ছয় দিন লাগিবে। তাঁহার সংগে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্বভারতী কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর এবং চিত্রবিদ্যাশিক্ষার্থী শ্রীমান ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা যাইতেছেন। হল্যাণ্ড দেশের সংগীতজ্ঞ শান্তিনিকেতন প্রবাসী ডাঃ বাকে এবং তাঁহার পত্নী আগেই রওনা হইয়াছিলেন। তাঁহারা রেংগুনে বসিয়া তথাকার বিখ্যাত প্যাগোডা (বৌদ্ধ মন্দির) প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ফিরিবার মুখে সংগীতের আনন্দ রেংগুনবাসী বন্ধুদিগকে দিবার অংগীকার করিয়া গিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সাতষট্টি বৎসর অতিক্রম করিয়া আটষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী সম্মিলনী তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে তাঁহার জন্মোৎসবের আয়োজন করেন। কবির ইউরোপ যাত্রার কালে তাঁহাতে ভক্তি ও প্রীতিমান সকলকে তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার কথা শুনিবার ও তাঁহাকে প্রণাম করিবার সুযোগ দিয়া সম্মিলনী তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছিল, যদিও শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে ও কবির জীবনের নানা স্মৃতির সহিত জড়িত নানা পদার্থের মধ্যে তাঁহার জন্মোৎসবের যে বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়, কলিকাতায় তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। বহুসংখ্যক ভদ্র-মহিলা ও ভদ্রলোক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বিদেশীও কয়েক জন ছিলেন। উৎসব প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে শঙ্খ-ধ্বনি বেদ গান স্বস্তিবাচন অর্ঘাভিহরণ তুলাদান প্রশস্তিপাঠ ও শান্তি পাঠ সহকারে নিষ্পন্ন হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পৌরোহিত্য করেন। অনেকগুলি গান গীত হইয়াছিল। তুলাদান কবির উপযুক্ত ভাবে হইয়াছিল। তুলাদণ্ডে তাঁহার নিজের পরিমাণ স্বলিখিত পুস্তক তৌল করিয়া যোগ্য পাত্রে তাহার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কবি স্বয়ং কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন এবং মৌখিক কিছু বলেন।

আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি, এবং তাঁহার সমুদয় শুভ চেষ্টা ফলবতী হউক, এই প্রার্থনা করিতেছি।

আষাঢ়, ১৩৩৫

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন

ইহা সাতিশয় দুঃখের বিষয়, যে, রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতা বশতঃ কোলোম্বো পর্যন্ত গিয়া ইউরোপ অভিমুখে আর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার হিবার্ট লেকচ্যার্স দেওয়া আপাততঃ স্থগিত রহিল।

তাঁহার চিঠি হইতে জানিলাম, যে, যদি তাঁহাকে ফিরিবার পথে কোথাও বিশ্রাম করিতে না হয়, তাহা হইলে তিনি আগামী ২রা আষাঢ় কলিকাতা পেঁছিবেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘ বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইয়া উঠুন, অগণিত হৃদয় হইতে এই প্রার্থনা স্বতঃ উত্থিত হইবে।

তাঁহার চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন, স্থির হইয়া থাকা ভিন্ন তাঁহার অসুস্থতার অন্য ঔষধ নাই। এ অবস্থায় তাঁহার পরিচিত ও অপরিচিত সকলে তাঁহাকে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম হইতে, এবং তাঁহার উপর ছোট বড় সব রকম দাবী হইতে নিষ্কৃতি দিলে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে, এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ও মানবের কল্যাণ হইবে।

শ্রাবণ, ১৩৩৫

বিশ্বভারতী

আমরা সম্প্রতি শান্তিনিকেতন গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আসিয়াছে, আরও আসিতেছে। গ্রন্থাগারে অনেক নূতন বহি আসিয়াছে। অনেকে বিনামূল্যে হিন্দী বহি উপহার পাঠাইতেছেন। বিলাতে আইন অনুসারে কয়েকটি বড় লাইব্রেরীতে প্রত্যেক মুদ্রিত বহি একখানি করিয়া পাঠাইতে হয়। বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ যদি নিজেদের উপর অলিখিত আইন জারী করিয়া তাঁহাদের একখানি বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত বহি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তাহা সুরক্ষিত ও পঠিত হইবে। এখন লাইব্রেরী গৃহের কেবল নীচের তলায় পুস্তক রাখা হয়। উপরের তলায় কলাভবন অবস্থিত। কিন্তু কলাভবনের নূতন বাড়ী নির্মিত হইতেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইবে। তখন লাইব্রেরী ভবনের সমস্ত স্থান পুস্তক রাখিবার জন্য পাওয়া যাইবে।

কলাভবনের শিক্ষালয়, গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম এবং ছাত্রদের থাকিবার জায়গা একই জায়গায় কিন্তু আলাদা আলাদা নির্মিত হইতেছে। কলাভবনে আগে আগে প্রধানতঃ ছবি আঁকিতে শিখান হইত; কিছুদিন হইতে মূর্তি-গঠনও শিখান হইতেছে। তাহাতে কাহারও কাহারও বেশ দক্ষতা দেখা যাইতেছে।

পিয়ার্সন হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ও নূতন ডাকঘর নির্মিত হইতেছে।

ছাত্রীরা এখন যে বাড়ীতে থাকে, তাহা উৎকৃষ্ট এবং তাহার প্রশস্ত খেলিবার জায়গাও আছে। তাহাদের জন্য নূতন উৎকৃষ্টতর বাড়ী প্রস্তুত হইবে। তাহা হইয়া গেলে বর্তমান ছাত্রীনিবাস অধিক বয়স্ক ছাত্রদের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট হইবে শুনিলাম।

ভাদ্র, ১৩৩৫

বিশ্বভারতীতে বর্ষা উৎসব

কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যে সকল উৎসব প্রচলিত আছে, তাহার কোন-কোনটি ঋতু উৎসব। যেমন হোলী বসন্তের উৎসব। এই রূপ অনেক উৎসবে মানুষের সহিত বাহ্য প্রকৃতির যোগ এখন আর অনুভূত ও রক্ষিত হয় না; সেগুলি এখন অনেক স্থলে প্রাণহীন বাহ্য ক্রিয়াকলাপে পর্যবসিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে-সব ঋতু-উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহা কেবল বাহ্য ক্রিয়াকলাপে পর্যবসিত হয় নাই। শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর স্পর্শ অনুভব ও মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নূতন বেশ ধারণ করেন, এবং আকাশে আলোর ও রঙের খেলা ও নানা দৃশ্য ও ধ্বনির মধ্য দিয়া মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। আমরা সকলেই তাঁহার সেই প্রকাশ অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু কবি তাহা বাহিরে ও অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া গানে কবিতায় গল্পে প্রকাশ করেন। এই ঋতু উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনে প্রাণহীন মনে হয় না। তথায় নিপুণ শিল্পীরা থাকায় উৎসব ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রগুলি এরূপ সুসজ্জিত হয়, যে, অন্যত্র অনেক অর্থ-ব্যয় ও আড়ম্বরেও তাহা সম্ভবপর নহে।

এবার বর্ষা-উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, ধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও দর্শকেরা সমবেত হইবার পর ছাত্রীনিবাস হইতে ছাত্রীরা সুন্দর সুরুচিসঙ্গত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গান করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুজন ছাত্র একটি পত্র পুষ্পে শোভিত ডুলিতে একটি বৃক্ষশিশুকে

বহন করিয়া আনিলেন। তাহার পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পঠিত হইল :—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্ ।
ধন্যা মহীরুহা যেভ্যো নিরাশা যান্তি নার্থিন : ॥ ১ ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভি : ।
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥ ২ ॥
ছায়ামন্যস্য কুর্ব্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপে ।
ফল্যান্যপি পরার্থায় বৃক্ষাঃ সৎপুরুষা ইব ॥ ৩
হেতবঃ সম্পদাং লোকে কেতবো ধরণীশ্রিয় :
জীবাতবোহত্র জীবানাং জীবন্তু তরবোহক্ষতাঃ ॥ ৪ ॥

১। বৃক্ষদের জন্ম শ্রেষ্ঠ। সকল জীব ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। বৃক্ষগণই ধন্য! যাচকেরা ইহাদের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না।

২। পত্র, পুষ্প ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, রস, ক্ষার, সার, অঙ্কুর, এই সকলের দ্বারা ইহারা লোকের কাম্যবস্তু দান করে।

৩। সাধু ব্যক্তির ন্যায় ইহারা স্বয়ং আতপে অবস্থান করিয়াও অন্যকে ছায়া দান করে। ইহাদের ফলগুলিও পরের জন্য।

৪। সংসারে সকল সম্পদের হেতু, ভূমিলক্ষ্মীর কেতুস্বরূপ ও জীবগণের জীবনৌষধস্বরূপ এই তরুগণ অক্ষত হইয়া বাঁচিয়া থাকুক।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোমের পক্ষ হইতে তাহাদের নিম্নমুদ্রিত প্রার্থনাগুলি পরে পরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং যে যে বালিকা ক্ষিতি অপ প্রভৃতি সাজিয়াছিল, তাহারা তাহার পুনরাবৃত্তি করিল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন, হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে!
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চির-সখ্যে।

অন্তরে থাক কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক পত্রী
তোমার অন্ন সত্রে ॥

অপ্‌

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে
বনের সৌভাগ্য দিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে ॥

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক ;
এ নব তরুতে তব শুভ দৃষ্টি হোক।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি
থাক তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি ॥

মরুৎ

হে পবন কবো নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সংগীত দিয়ো এরে ভিক্ষা
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে,
পল্লব-হিল্লোল শিক্ষা ॥

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎ পর্ণে।
তরু-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য॥

ইহার পর বৃক্ষশিশুকে ভূমিতে রোপণ করা হইল। সর্বশেষে এই মাংগলিক কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন :—

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক, হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধা-সিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণ কামনা
শ্রাবণ বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো ;
মোদের প্রাংগণে ফেলো ছায়া : পথের কংকর ঢাকো
কুসুম বর্ষণে ; আমাদের বৈতালিক বিহংগমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো ; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা-গীতিকায়,
সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ-বীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হোতে
প্রাণ-মাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।

শতবর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণ মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক্ মৃত্যুহীন !
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব পরিমলে ॥

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর সকলে একটি তাঁবুর নীচে ও সম্মুখে সমবেত হইলেন। তখন কবি তাঁহার সেই দিনই সেই উপলক্ষ্যে রচিত একটি সময়োপযোগী গল্প পড়িলেন। তাহা একটি বালকের কাহিনী যে উদ্ভিদের সাহিত আত্মীয়তা অনুভব করিত। রাস্তার মাঝখানে জাত তাহার স্নেহপালিত একটি শিমুল গাছ পরিবারস্থ এমন লোকেরা কাটিয়া ফেলে যাহারা দরদী ছিল না। তাহাতে বালকটির কাকীমা দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। ইহা ইতিহাস নহে, কিন্তু আমরা পরে কবির মুখে শুনিতে পাই, যে, বাল্যকালে উদ্ভিদজীবনের প্রতি তাঁহার হৃদয়মনের ভাব ঐ বালকটির মত ছিল।

ইহার পর বাদ্য সহকারে বর্ষার উপযোগী কয়েকটি বাংলা ও একটি হিন্দী গান গীত হয়। পরদিন ৬ই শ্রাবণ সুরুল গ্রামে স্থিত শ্রীনিকেতনে হল চালন উৎসব হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, যে, পুরাকালে ইহা সীতা যজ্ঞ নামে অভিহিত হইত। একটি সুন্দর সামিয়ানার নীচে অনুষ্ঠানের স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। কতকখানি জমির ঘাস চাঁছিয়া ফেলিয়া তাহা আল্পনায় ও রঙে সুশোভিত করিয়া হলচালনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিন জোড়া সুপুষ্ট চিত্রিত বলদ ও একটি সুশোভিত লাঙল কৃষকেরা সম্মুখে রাখিয়াছিল।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ একটি গান করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলেন :—

অক্ষৈর্মা দীব্য কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।

তত্র গাবঃ-কিতব তত্র জায়া
তন্মে বিচষ্টে সবিতায় মর্য : ॥

ঋগ্বেদ, ১০, ৩৫, ১৩।

দ্যূতক্রীড়া করিও না, কৃষিই কর। তাহা দ্বারা যে বিত্ত পাও তাহাই বহু মনে করিয়া আনন্দিত হও। হে দ্যূতকর, তাহাতেই তোমার গাভীসমূহ, তাহাতেই তোমার স্ত্রী। এই সবিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাই আমাকে বলিতেছেন।

ইহার পর বলীবর্দ সম্বর্ধনা হইল। বলদগুলিকে ফুলের মালা পরাইয়া তাহাদের নানা সুখাদ্য তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণসহকারে হলযোজনা করা হইল ;—

সীরা যুঞ্জন্তি কবযো যুগা বিতন্বতে পৃথক।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়া

দেবগণের অনুগ্রহে জ্ঞানশালী মেধাবিগণ যুগ (জোয়াল) গুলি বিস্তৃত করিয়া হল সমূহ যোজনা করিতেছেন।

ইহার পর চিত্রিত ভূমিখণ্ড কর্ষিত হইল। প্রথমে পুরোহিত শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পাঠ করিলেন ;—

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং
কৃত যোনৌ বপতেহ বীজম।
গিরা চ শ্রুষ্টি, সভরা অসন্ নো
নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥

(কৃষকগণ,) তোমরা যুগসমূহ বিস্তৃত কর, হল সমূহ যোজনা কর, এই নির্মিত ক্ষেত্রে বীজ বপন কর। গানের দ্বারা আমাদের অন্নসমূহ পুষ্ট হইয়া উঠুক। ইহা পক্ব হউক, এবং দাত্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া আমাদের নিকটে আগমন করুক।

শুনং সুফালা বিকৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ।
শুনাসীরা হবিষা তোয়মানা
সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তনাস্মে ॥

যজুর্বেদ, ১২, ৬৯

সুন্দর ফালগুলি ভূমিকে সুখে কর্ষণ করুক ! হলধারিগণ বলিবর্দের সহিত সুখে আগাইয়া চলুন ! বায়ু ও সূর্য জল দ্বারা (ভূমিকে) সেচন করিয়া আমাদের জন্য ওষধি সমূহকে সুফল-যুক্ত করুন !

ঘৃতেন সীতা মধুনা সমজ্যতাং ।
বিশ্বে দে'বৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ ।
উর্জস্বতা পয়সা পিন্বমানা
স্মান সীতে পয়সাভ্যা ববৃৎস্ব ॥

বাজসনেয়িসংহিতা, ১২-৬৭-৬০

বিশ্বদেব ও মরুদ্গণের অনুজ্ঞায় সীতা (হলের রেখ) মধুর জলে সংসিক্ত হউক ! হে সীতা, তুমি জলে পূর্ণ হইয়া অন্নবতী হইয়া আমাদের অনুকূল হও !

অতঃপর প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও পরে শ্রীনিকেতনের কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু হলচালন দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিলেন ।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করিলেন । ইহা কেহ লিখিয়া রাখিলে ভাল হইত । ভূমির সহিত যোগ স্থাপন করিয়া মানুষ যে কেবল দৈহিক পুষ্টি ও বাহ্য সম্পদ লাভ করে তাহা নহে, তাহার অন্তরাত্মাও যে প্রকৃতির স্পর্শে কেমন নানা প্রকারে শ্রীসম্পদ পুষ্টি লাভ করে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন । মানুষ কেবল যে ভূমি হইতে সম্পদ আহরণ করিবে, তাহা নহে, নিজের জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা তাহাকে পুষ্টও করিবে । সর্বশেষে "অচলায়তন" নাটকের গান "আমরা চাষ করি আনন্দে" গীত হয় ।

আশ্বিন, ১৩৩৫

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান

ভাদ্রের প্রবাসীতে বিশ্বভারতীতে বর্ষা-উৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত লিখিয়াছি । এই অনুষ্ঠানের কোন অংশের ফটোগ্রাফ লওয়া হয় নাই । ইহা হইয়া যাইবার কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তুলি দিয়া স্মৃতি হইতে ইহার একটি নকসা আঁকিয়া পাঠান । তাহার প্রতিলিপি এখানে দিতেছি । অনুষ্ঠানক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক ছাত্র-ছাত্রী ও দর্শকেরা সমবেত

হইবার পর যখন ছাত্রীনিবাস হইতে ছাত্রীরা সুন্দর সুরুচিসঙ্গত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নানা অর্ঘ লইয়া গান করিতে করিতে তথায় আসেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে দুজন ছাত্র পত্রপুষ্পে শোভিত একটি ডুলিতে একটি বৃক্ষশিশুকে বহন করিয়া আনেন, ইহা অনুষ্ঠানের সেই অংশের ছবি।

আশ্বিন, ১৩৩৫

শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব

বর্ষা-উৎসবের অঙ্গস্বরূপ শ্রাবণ মাসে সুরুল গ্রামে স্থিত শ্রীনিকেতনে যে হলচালন উৎসব হয়, ভাদ্রের প্রবাসীতে তাহারও বর্ণনা আছে। এই অনুষ্ঠানে কয়েকটি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। কোনটিই সুস্পষ্ট হয় নাই। তথাপি উৎসবের দৃশ্যের কতকটা ধারণা জন্মাইবার জন্য এখানে দুখানি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি দিতেছি। একটিতে দৃষ্ট হইবে, রবীন্দ্রনাথ উৎসবের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া পুস্তক হইতে তাঁহার একটি গান গাইতেছেন। অন্যটিতে দেখা যাইবে, তিনি হলচালন আরম্ভ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু উৎসবের কিছুদিন পরে তুলি দিয়া উহার যে একটি ছবি আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিলিপি স্বতন্ত্র ছাপিয়া এই মাসের প্রবাসীর সহিত দিলাম। যাহাতে ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়িয়া না যায় উহা এইরূপ শক্ত কাগজে ছাপা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে ছিদ্র শ্রেণীর বরাবর ছিঁড়িয়া উহা বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন।

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গল্প

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা প্রবাসীর পরবর্তী এক সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে।

কার্তিক, ১৩৩৫

দুটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মারফতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ যে দুই ব্যক্তি ও বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য জানাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রবাসীতে কিছু বাহির হয় নাই। মডার্ণ রিভিউয়ের এক পত্রলেখকের চিঠিতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু অমিয়বাবুর চিঠিখানি বাংলায় লেখা এবং প্রবাসীর জন্য অভিপ্রেত বলিয়া তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি। ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিউতে বাহির হইবে।

সম্পাদক 'প্রবাসী' সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন :—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার তাঁহার সম্বন্ধে মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত মন্তব্য পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে কবি তাঁহার বক্তব্য আপনাকে জানাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন তাহা নিয়ে লিখিলাম—

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়ের সহিত আমার আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গ বাংলায় প্রবাসীতে এবং ইংরাজীতে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসীতে উক্ত প্রসঙ্গের আলোচনার ভূমিকায় আমাকে লিখিতে হইয়াছিল যে আলোচনার ভাষা সম্পূর্ণ আমার নিজের।* ইংরাজী অনুবাদে এই ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমি বাদ দিয়াছিলাম, এই কারণে উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের নাম থাকাতে ঐ লেখার বাংলা ও ইংরাজী তাঁহারই রচনা বলিয়া সাধারণের ধারণা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এজন্য দিলীপকুমারের কোন দায়িত্ব নাই। যখন এই লেখাগুলি কোন গ্রন্থ বা পত্রিকায় তিনি নিজে প্রকাশ করিবেন তখন লেখকের নাম তিনি প্রকাশ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের গায়কদের মধ্যে সর্বোচ্চ খ্যাতি পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। পুরুষানুক্রমে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের

* ঐ আলোচনার প্রশ্নগুলি ছাড়া শুধু ভাষা কেন আর সবই কবির, দিলীপবাবুর প্রশ্ন উপলক্ষ্য মাত্র ; ইহা সুস্পষ্ট হইলেও মনে রাখা ভাল।—

প্রবাসীর সম্পাদক।

চর্চা করিয়া পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। শ্রীযুক্ত ভা টখণ্ডে মহাশয় সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতায় ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া আমি মনে করি—ইঁহার যোগ্যতার প্রশংসাবাদ করিবার উপলক্ষ্যে অন্য কোন গীতিবিশারদের মান খর্ব করার আমি অনুমোদন করি না।"

ইতি, ৬ই অক্টোবর ১৯২৮

ভবদীয়—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

দিলীপবাবু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশের উপলক্ষ্যটি পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য আমাদিগকে কিছু লিখিতে হইতেছে।

ইংরাজী বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের বৈশাখ (এপ্রিল) সংখ্যায় The Function of Women's Shakti in Society" নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটির নামের নীচেই লেখা আছে "By Dilip Kumar Roy"। কিয়দংশ দিলীপবাবুর রচনা বলিয়া ষ্টার নামক কাগজের জুলাই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশিত মূল বাংলা প্রবন্ধটি দিলীপবাবুর রচনা নহে। এজন্য প্রবন্ধটিতে লেখক হিসাবে দিলীপবাবুর নাম প্রকাশ ঠিক হয় নাই। মডার্ণ রিভিউর একজন পত্র লেখক এই মনে করিয়া দিলীপবাবুর উপর কটাক্ষ করিয়াছেন যে, 'ভুলের' জন্য দিলীপবাবুই দায়ী, কারণ বাস্তবিক দায়ী কে তাহা তাঁহার জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশের জন্য দিলীপবাবু প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন দায়িত্ব হয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিম্বা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ষ্টারে উহার কিয়দংশের দিলীপবাবুর রচনা বলিয়া পুনর্মুদ্রণে দিলীপবাবুর কোন দায়িত্ব ছিল কিনা জানি না। যাহা হউক, ইহা সুস্পষ্ট যে এপ্রিল মাস হইতে এ পর্যন্ত দিলীপবাবু ঐ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির রচয়িতা বলিয়া প্রশংসা সম্ভোগ বিনা আপত্তিতে করিয়া আসিতেছেন এবং মডার্ণ রিভিউর পত্র লেখক কটাক্ষ না করিলে আরও অনির্দিষ্ট কিছুদিন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা সম্ভোগ করিয়াই চলিতেন। গ্রন্থাকারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সময় তিনি অবশ্য প্রকৃত লেখকের নাম প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থ প্রকাশে এখনও কত বিলম্ব আছে তাহা তিনিই জানেন। যে প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে, তাহা এতদিন আত্মসাৎ করা কি ঠিক হইয়াছে? যে নিন্দা তাঁহার প্রাপ্য নহে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা ত তিনি খুব ক্ষিপ্র হস্তে করিয়াছেন;

প্রশংসা সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবস্থা কেন? আমাদিগকে অনেকে অতিরিক্ত দোষদর্শী মনে করিতে পারেন। সেরূপ অখ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা আমাদের নাই। দিলীপবাবুই খুঁৎ ধরিতে বাধ্য করিয়াছেন। কারণ মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশের জন্য তিনি যে প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে তিনি প্রশংসা সম্বন্ধে নিজের নির্লোভতার প্রমাণস্বরূপ লিখিয়াছেন যে তাঁহাকে লোকে ডক্টর অব মিউজিক এবং ব্যাচিলার অব মিউজিক বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার ওরূপ উপাধি নাই। আলোচ্য ক্ষেত্রে এবম্বিধ নির্লোভতা তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সত্বর প্রদর্শন করেন নাই। তাহার কারণ কি ইহা হইতে পারে না, যে প্রবন্ধটির লেখকত্ব আপনা হইতে দাবী করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন 'তরুণের' মনে কষ্ট দিবেন না, এইরূপ একটি আশা ছিল?

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য, গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে। বাংলা দেশের বিদ্যালয় সকলে সংগীত শিখাইবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হওয়ায় শিক্ষা কি রীতিতে কাহার দ্বারা হইবে এই আলোচনা উপলক্ষ্যে প্রধানতঃ দিলীপবাবু ও তাঁহার অনুচর সহচরদের দ্বারা গোপেশ্বর বাবুকে খর্ব করিবার চেষ্টা দৈনিক কাগজে হইয়াছে। সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে মডার্ণ রিভিউর পত্র লেখক অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত সংগীতজ্ঞ ও সংগীত স্রষ্টা এক্ষণে গোপেশ্বরবাবুর ন্যায্য প্রশংসা করায় আশা করি ন্যায় পরায়ণ সংগীত রসিকেরা সন্তুষ্ট হইবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "শ্রীযুক্ত ভাটখণ্ডে মহাশয় সংগীত শাস্ত্রজ্ঞতায় ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি—ইঁহার যোগ্যতার প্রশংসাবাদ করিবার উপলক্ষ্যে অন্য কোন গীতিবিশারদের মান খর্ব করার আমি অনুমোদন করি না।" মডার্ণ রিভিউর পত্রলেখকও এইরূপ কথা ঐ পত্রিকায় লিখিয়াছেন, যথা "Bhatkhande is no doubt great; but let not those who have also served die unsung and unlamented because a blind man does not sing of them."

পৌষ ১৩৩৫

আচার্য বসুর সপ্ততিতম জন্ম দিবসের উৎসব ঃ

…"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুকে যে কবিতা দ্বারা আজ অভিনন্দিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রথম অভিনন্দন নহে। মানুষ কীর্ত্তিমান হইবার পর তাঁহার প্রশংসা ও তাঁহাতে বিশ্বাস ঘোষণা অনেকেই করে। কিন্তু কবি একত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন জগদীশচন্দ্র এখনকার মত বিখ্যাত হন নাই, তখন লিখিয়াছিলেন :—

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে,
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদ-ধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে !
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধু পার।
আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদ খানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ !
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

যে কবির কণ্ঠ দিয়া ক্ষীণ মাতৃস্বর নিঃসৃত হইয়াছিল তিনি ত এখন অজ্ঞাত অখ্যাত নহেনই—তখনও ছিলেন না—এবং সেই ক্ষীণ মাতৃস্বরের প্রতিধ্বনি আজ দেশ বিদেশে উঠিতেছে।

বৈশাখ, ১৩৩৬

মালয়ে রবীন্দ্রনাথ

(আলোচনা)

চৈত্রের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটা পুরাতন তর্কের পুনরুল্লেখ করিয়া আমার প্রতি কতকগুলি অযথা কটূক্তি করিয়াছেন। মালয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি লইয়া আমি Forward পড়িয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই তাঁহার কটূক্তির বিষয়। কিন্তু বোধ হয় তাহার লেখনী কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কায়—তিনি আমার নামটি করেন নাই।

এ বিষয় সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিবার স্বাধীনতা আমার এখন নাই। কাজেই তাঁর বক্তব্য বিষয়টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও মতামত আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। কিন্তু একথা আমি স্বীকার করিতেছি যে, টেলিগ্রাফে কবির উক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সুনীতিবাবুর বর্ণিত বিবরণ হইতে ভিন্ন—এবং তন্মূলে আমি যে কথা বলিয়াছিলাম তার সব কথা সংগত হয় নাই। সেজন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

আর একটা কথা। সুনীতিবাবু বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চামড়া বাঁচাইবার জন্য" কিংবা লাটসাহেবের আতিথেয়তার লোভে তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন, এই কথা আমি বলিয়াছিলাম। অনুগ্রহ পূর্বক আমার পত্রখানি আদ্যোপান্ত যত্ন করিয়া পাঠ করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি বাস্তবিক একথা বলি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা ও তাঁহার আন্তরিকতার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। কিন্তু স্থানকাল হিসাবে তাঁর কথাটা সংগত হয় নাই এবং ইহা হইতে লোকে সহজেই বলিবে যে, তিনি একথা কেবল to save his skin বলিয়াছেন। আমার এই অভিপ্রায় আমি যথাজ্ঞান সরল ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম এবং ইংরেজী ভাষায় আমার অপরিসর জ্ঞান অনুসারে আমার কথার দ্বারা ইহাই প্রকাশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অবশ্য সুনীতিবাবুর মত ইংরেজীতে এম-এ আমি নই এবং আমার ভাষাজ্ঞানের ত্রুটি থাকিতে পারে।

বিচার্য বিষয়ের সংগে আমার সাহিত্যিক জীবনের কোনও সম্পর্ক না

থাকিলেও তাহা লইয়া সুনীতিবাবু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কটূক্তি করিয়াছেন। তাঁর এ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার উত্তরে কোনও কথা বলিয়া আমি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয়ে আলোচনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু আমার বিবেচনায় এরূপ কটূক্তি সুনীতি বা সুরুচি দুয়ের একটারও পরিচয় দেয়না। ভাষাতত্ত্বে আমার অধিকার নাই, কিন্তু শুনিয়াছি সুনীতিবাবু সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ইতরের ভাষা ও ভাবে তাঁর এতটা দখল হইয়াছে তাহা জানিতাম না।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তর

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় যখন নরেশবাবুর চিঠির প্রতিবাদ প্রকাশ করেন, তখন নরেশবাবু নিজের ভুল দেখেন নাই। Better late than never.

নরেনশবাবুর শ্লীলতা অশ্লীলতা, ভদ্র-ইতর সম্বন্ধে যে রুচি ও ধারণা তাহা আমাদিগের অনেকের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সুতরাং তাঁহার চিঠির শেষ বাক্যে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ দেখিনা। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ, ১৩৩৬

রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশ

আগেই বলিয়াছি, আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের অপমান উপলক্ষ্য করিয়া কোন কোন সাংবাদিক তাঁহাকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিতেছেন। তাহার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক, এবং উত্তর দিলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। কেবল এইটুকু মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের কাহারও চেয়ে স্বদেশকে কম ভালবাসেন না, স্বদেশের অপমান কম অনুভব করেন না এবং স্বদেশের কল্যাণের জন্য ও

গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত কম পরিশ্রম করেন নাই এবং এখনও কম করিতেছেন না। সকলের কার্যপ্রণালী এক নহে। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে লেখনী ও বাগ্‌যন্ত্র পরিচালনা স্বদেশের সেবার একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। রাজনীতিক্ষেত্রেও কবির বাণী বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ লোককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বমানব প্রভৃতি কথা উপলক্ষ্য করিয়াও কবিকে অনেকে কটু ও অশিষ্ট কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন নহে বলিয়া সমস্ত মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর আন্তরিক কথা বলিবার ও লিখিবার অধিকার আমাদের জাতির কাহারও নাই, ইহা স্বীকার করি না। আমরাও মানবজাতির অন্তর্গত। যাহা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তাহা আমাদেরও মংগলজনক। বিশ্বমৈত্রী স্বাধীনতা লাভের এবং স্বাধীনতা রক্ষার একটি উপায়। সকল জাতির পক্ষে হিতকর আধ্যাত্মিক কথা বলিবার অধিকার যদি পরাধীন দেশের কোন লোকের না থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় যে সব লোক বৈজ্ঞানিক বা অন্য গবেষণা করেন, তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যের ফল বিশ্বমানব পাইতে পারে বলিয়া সেই কারণে তাঁহাদেরও সত্যানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক গৎ আওড়ান উচিত।

কবি যে বিশ্বের কথা ভাবেন বলেন, বিদেশ যান, তাহার বিরোধী আমরা নহি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের মত লোকের উপর, শুধু বংগের, ভারতের, এশিয়ার নহে, সমগ্র পৃথিবীর লোকের দাবী আছে। কিন্তু তিনি পৃথিবীর লোককে যে বাণী শুনাইতে চান, শান্তিনিকেতন বহুবৎসর হইতে তাহার স. াকেন্দ্র হইয়া আছে। বৃহৎ যজ্ঞে অনেককে নিমন্ত্রণ করিলে রন্ধনশালার চুল্লীতে ইন্ধন যোগাইবার ব্যবস্থা চাই। এই কারণে কবির স্বদেশে ও শান্তিনিকেতনে আরও দীর্ঘকাল অবস্থিতি বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাঁহার কাজ তাঁহার জীবিত কালের সংগে সংগেই শেষ হইলে চলিবে না। পরেও যাহাতে তাঁহার আদর্শের অনুসরণ ও বিকাশ চলে, তাহার ব্যবস্থা চাই, কর্মী চাই। কর্মী সৃষ্টি করা অবশ্য একা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে ; কিন্তু কর্মী গঠন কার্যে ভগবান্ কবির মত উপযুক্ত মানুষের সহযোগিতা চান।

বিশ্বভারতীর জন্য কন্সটিটিউশ্যন প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবেনা। নিয়মাবলী প্রাণহীন যন্ত্র মাত্র। তাহাকে প্রাণবান্ করিতে হইলে মানুষ চাই, মানুষ গড়িয়া উঠা চাই।

বিশ্বভারতীর কাজ নানা বিভাগে বিভক্ত। এই সব বিভাগের কর্মীদের মধ্যে যোগ্য, চরিত্রবান, কর্মঠ লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি সব বিভাগের কাজের সমজদার গুণগ্রাহী, যাঁহাকে সব বিভাগের লোক মানেন এবং যিনি সকলের অনুরাগভাজন বলিয়া যাঁহার দ্বারা সকলের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার ভাব উদ্বোধিত হইয়া সকল বিভাগের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য ও আদান প্রদান স্থাপিত হইতে পারে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এইরূপ সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারেন। শান্তিনিকেতনে বাস করেন না, বিশ্বভারতীর বাহিরের এমন কোনও লোকও তাঁহার মত একাজের যোগ্য নহেন। অবশ্য তাঁহার অনুপস্থিতির সময় এরূপ একজন লোক চাই বটে, এবং জগতের অলংঘনীয় নিয়মে তাঁহার তিরোভাবের পর এই প্রয়োজন আরও অনুভূত হইবে। বর্তমান সময়েও কবির অনুরাগী প্রকৃত সহকর্মী চাই। তিনি অসাধারণ শক্তিমান্ পুরুষ। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরাও নিঃসংগভাবে একা তাঁদের মহৎ কাজ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, যোগ্য অনুরাগী সহচর অনুচর দিগের সাহায্যে করিয়াছেন। এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্য স্বদেশে কবির অধিক সময় যাপন করা আবশ্যক, যদি এরূপ লোক তিনি পান, তাহা হইলে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যে, কার্যালয়যন্ত্র বা কোন মনুষ্য সমষ্টি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় প্রতিরোধনীতি এইরূপ লোকের সম্বন্ধে অবলম্বন করিতেছেন কিনা।

আরও একটি কারণে তাঁর শান্তিনিকেতনে থাকা আবশ্যক। সেখানে যেরূপ যোগ্য অধ্যাপক আছেন, তাঁহাদের অনেকের সমতুল্য লোক অন্যত্র একান্ত দুর্লভ নহে। অনেকে যে সব কারণে নিজ নিজ সন্তানদিগকে শিক্ষার জন্য তথায় প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে প্রধান কারণ একটি এই যে, তাহারা কবির সংস্পর্শে আসিবে। তাঁহার সাক্ষাৎ প্রভাব অনুভব করিবার অধিকার তাহাদের আছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা ও যশের উদ্ভব হয় তাঁহার প্রভাবে। এখনও তিনি আগেকার মত শান্তিনিকেতনের জন্য খাটিবেন, এরূপ আশা কেহ করেন না। কিন্তু তিনি সেখানে থাকিলে ও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যাওয়া আসা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

কাগজে দেখিলাম, তিনি কোন পাশ্চাত্য লেখকের নিকট বলিয়াছেন, তিনি

এইরূপ একটি নারীবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন এখনও হৃদয়ে পোষণ করেন যেখানে নারীপ্রকৃতির বিকাশ নারীর বিশেষত্ব অনুসারে হইবে। ইহা অতি মহৎ কল্পনা। আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহার বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ কামনা করিতেছি। ইহার জন্য কবির স্বদেশবাস বাঞ্ছনীয়। বিদেশে তাঁহার খ্যাতি এখন এরূপ হইয়াছে, যে, তিনি দেশে থাকিয়াও ভাল কিছু লিখিলে তাহার প্রভাব নানা দেশে ব্যাপ্ত হইতে পারে। অবশ্য, কোথাও তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহারও পৃথক ফলবত্তা আছে। কিন্তু কাহারও পক্ষে ত সর্বত্র যাওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং যাহা সম্ভব তাহাকেই পর্যাপ্ত মানবসেবা মনে করিতে হইবে।

শ্রাবণ, ১৩৩৬

আমেরিকায় প্রাচ্যের অপমান

কানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। ঐ দেশের ভ্যাংকুবর শহর ইউনাইটেড স্টেটস ও কানাডার সীমান্তে অবস্থিত। কানাডা হইতে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসে প্রবেশ করিতে হইল ভ্যাংকুবর একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে সব প্রবেশার্থীদের পরীক্ষা হয়। এশিয়ার কোন জাতির লোককে ইউনাইটেড স্টেটসে পৌরঅধিকার বিশিষ্ট স্থায়ী বাসিন্দা হইবার জন্য ঢুকিতে দেওয়া হয় না। ইউরোপীয় জাতি-সকলের লোকদের ঢুকিবার ও পৌর অধিকার পাইবার বাধা নাই। কিন্তু কোন্ ইউরোপীয় দেশের কতজন মানুষকে প্রতি বৎসর ঢুকিতে দেয়া হইবে, তাহার সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে।

আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস্ আমেরিকা মহাদেশের সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও ধনী দেশ বলিয়া তাহাকেই সংক্ষেপে আমেরিকা বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ কানাডায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানেও এশিয়াবাসীদের প্রবেশের ও পৌর অধিকার লাভের বাধা আছে। কিন্তু কবি সেখানে কোন রূঢ় ব্যবহার পান নাই। কানাডার কাজ সারিয়া ভ্যাংকুবরের পথে তিনি যখন আমেরিকা প্রবেশ করিতে যান, তখন সেই শহরে যাত্রী-পরীক্ষা-গৃহে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ও রূঢ় ব্যবহার করে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।

কবি ইহাকে প্রাচ্যের প্রতি আমেরিকার দুর্ব্যবহার মনে করিয়াছেন। ইহা যে এশিয়ার অপমান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উপলক্ষ্যে কোন কোন খবরের কাগজ কবিকে নানা উপদেশ দিয়াছেন কোন কোন উপদেশ হইতে মনে হয়, কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা আছে যে ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়াই ভারতবর্ষের লোককে এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হয়। এই ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। সম্পূর্ণ সত্য নহে বলিতেছি এইজন্য, যে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের লোকদিগকেও স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পৌর অধিকার লাভের জন্য আমেরিকায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না। স্বাধীন পরাধীন, এশিয়ার সব দেশের লোকের সম্বন্ধেই এক নিয়ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে যে প্রকার অপমান করা হইয়াছে, জাপানের কোন বিখ্যাত লোককে ত সেরূপ অপমান করা হয় না? কখনও হইয়াছে কিনা মনে পড়িতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষেরও সব বিখ্যাত লোক আমেরিকান যাত্রী পরীক্ষক কর্মচারীর দ্বারা অপমানিত হন নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পূর্বে যখন আমেরিকা গিয়াছিলেন, তখন অপমানিত হন নাই। সম্প্রতি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমেরিকা প্রবেশের সময় অপমানিত হন নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যে আইনটা আছে তাহাই চূড়ান্ত অপমানকর; ব্যক্তিগতভাবে কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার হইলে তাহাতে অপমান বিশেষ কিছু বাড়ে না, শিষ্ট ব্যবহার হইলেও বিশেষ কিছু কমে না। এই অপমান সমুদয় এশিয়ার, শুধু ভারতবর্ষের নহে।

অনেকে বলিতেছেন, আমেরিকা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, আমেরিকানদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার আমাদের আছে এবং তাহা করা উচিত। অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ অপমান করা ক্রুদ্ধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাহা কর্তব্য কিনা এবং সুবিবেচনার কাজ হইবে কিনা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে কিছু পৌরুষের অভিনয় না করা ভাল। কারণ, কর্তব্য যাহাই হউক, তাহা করিবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই, স্বরাজ লব্ধ হইলে ক্ষমতা জন্মিবে। তখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কেন প্রাচ্যের সম্বন্ধে আমেরিকার অপমানকর ব্যবস্থার প্রতিশোধস্বরূপ আমেরিকার সম্বন্ধে নিজের দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা করে নাই। এখন স্বরাজলাভের চেষ্টাই

রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত। স্বরাজ পাইবার পরেও প্রতিশোধনীতি অবলম্বন অপেক্ষা চরিত্রে জ্ঞানে ও কর্মে সুমহৎ হওয়া দ্বারা প্রাচ্য অধিক ফল পাইবেন।

রাগের মাথায় সমগ্র আমেরিকান জাতিকে গালাগালি দেওয়াও ঠিক নয়। স্বাধীন দেশেও তথাকার গভর্ণমেণ্ট ও তথাকার অধিবাসিবর্গ সমার্থক নহে। অনেক স্থলেই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক দেশে সকলের চেয়ে স্বার্থপর, এবং দুর্বল বিদেশী জাতিদিগকে সকলের চেয়ে শোষণেচ্ছু ও লুণ্ঠনেচ্ছু লোকেরাই রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী ও পরিচালক হয়। আমেরিকার লোকদের মধ্যে যাহারা প্রাচ্যের অপমানের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারা সংখ্যায় বেশী হইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমেরিকার সব অধিবাসী নয়, শ্রেষ্ঠ অধিবাসীও নহে। আমেরিকায় এমন লোক বিস্তর আছেন, যাঁহারা সকল জাতির প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানকর আইন রদ করিতে চেষ্টিত আছেন।

আমেরিকার লোকদের এই শ্রেষ্ঠ অংশের অনেকে রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোন কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অন্তর্ভূত। সেইজন্য তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন, খ্যাতি বা সম্মানের জন্য নহে। তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান ইউরোপের নানা দেশে এবং চীন, জাপান শ্যাম প্রভৃতি স্বাধীন প্রাচ্য দেশে যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে।

যে দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাচ্য মনীষী অপমানিত, সে দেশেরও কতক লোক প্রাচ্য কোনও মনীষীর কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা অকর্তব্য নহে। কিন্তু যে সব আমেরিকান প্রাচ্যের উপদেষ্টাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের আগে হইতে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে উপদেষ্টাদিগের কোন প্রকার অসুবিধা ও অপমান না হয়। রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা এবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ বন্দোবস্ত না করায় অপরাধী হইয়াছেন।

ভাদ্র, ১৩৩৬

বিশ্বভারতীতে বর্ষামঙ্গল

বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে গত ২৫শে শ্রাবণ বিশ্বভারতীর সুরুলস্থিত শ্রীনিকেতনে সীতাযজ্ঞ বা হলকর্ষণ উৎসব সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হল-চালন করেন। পরদিন শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব সম্পন্ন হয়।

কার্তিক, ১৩৩৬

"রাজধর্ম"

রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রকাশিত 'পরিত্রাণ' নাটকে মহারাজা প্রতাপাদিত্য একস্থানে বলিতেছেন—"রাজ্য-রক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করিনে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিংবা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।"

এই 'রাজধর্ম' বর্তমান খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও এদেশে আচরিত হইয়া থাকে। বঙ্গের অনেক কর্মীকে সন্দেহে, কিংবা পরে তাহাদের দ্বারা অপরাধ হইতে পারে মনে করিয়া, বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতে কাহারও কাহারও প্রাণহানি বা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির দ্বারা স্বাস্থ্যনাশ ও আয়ু-হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু 'রাজধর্ম' ত সুরক্ষিত আছে।

অন্যত্র প্রতাপাদিত্য বলিতেছেন—

"অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম পালন করতে হয়।"

তিনি পুনর্বার বলিতেছেন—

"যারা মুখের ভাব দেখে, আর হায় হায় আহা উহু করতে করতে রাজ্য শাসন করে, তারা রাজা হবার যোগ্য নয়।"

অনেকের একটা বড় ভুল ধারণা আছে যে, আমাদের দেশটা সেকালে বড়ই সেকেলে ছিল—অন্ততঃ রাজনীতি বিষয়ে। কিন্তু দেখা যাইতেছে প্রতাপাদিত্যের রাজধর্ম বিংশ শতাব্দীতেও খুব আপ-টু-ডেট ও নব্য বিবেচিত

হইবে। একালেও মুমূর্ষু যতীন্দ্রনাথ দাস ও ভিক্ষু বিজয় এবং মৃতপ্রায় অন্য প্রায়োপবেশকদের অবস্থা দেখিয়া রাজ-পুরুষেরা "হায় হায় আহা উহু" করিতে করিতে রাজ্যশাসন করেন নাই, করিতেছেন না।

"হয়না যেটা সেটাও হবে"

প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের মাধবপুরের প্রজাদিগকে বৈরাগী ধনঞ্জয় খাজনা দিতে বারণ করেন। তাহাতে প্রতাপ বলেন—

"দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্চো? (প্রজাদের প্রতি) দেখ্‌ বেটারা, আমি বলছি তোরা সব মাধবপুর ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।" তাহাতে বৈরাগী গান ধরিলেন—

"রইলো বলে রাখ্‌লে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
(তোমার) টানাটানি টিকবে না ভাই
রবার যেটা সেটাই রবে
যা খুসি তাই করতে পারো—
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে!
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবচো হবে তুমিই যা চাও
জগৎটাকে তুমিই নাচাও
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে,
হয় না যেটা সেটাও হবে।"

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে প্রবল পরাক্রান্ত অনেক ব্যক্তির ভাগ্যবিপর্যয়

হইয়াছিল। তাহাতেও বিংশ শতাব্দীর প্রবল পরাক্রান্ত অনেকের চোখ ফুটে নাই। ইউরোপের অধিকাংশ এরূপ লোকের গত মহাযুদ্ধের সময় বা পরে দশান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এখনও কিন্তু কত দেশের রাজশক্তি ভাবিতেছে, তাহারা যা চায় তাহাই হইবে, তাহারাই জগৎটাকে নাচায়। কিন্তু "হয়না যেটা সেটা'ও হবে।"

কারাগার ও আশ্রম

ইংরাজীতে এই মর্মের একটি কবিতা আছে, "পাষাণ প্রাচীরের বেড় কারাগার নহে, শান্ত ও নিরপরাধ চিত্ত তাহাকে তপোবন মনে করে।"

লাহোরের কারাগারে যতীন্দ্রনাথ দাস যে ভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া উপবাসের দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন, তাহাতে কবির ঐ কথাগুলি মনে পড়ে। লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত লাহোরের 'পীপ্‌ল' নামক সাপ্তাহিকে লিখিত হইয়াছে :—

Few things in recent years have stirred the popular imagination even half as much as has the martyrdom of Jatin Das. His lofty character, his stern resolve, his youthful years, his immense suffering and more immense cheerfulness with which he bore it, his calmness in the face of death, his serenity in circumstances in which those of maturer years would become ruffled, his dignified—but unobtrusive—attitude that bewitched all that came in contact with him, all these combined have given the world a noble albeit a tragic romance that deserves to form for a considerable time to come the subject of song and story.

রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীও কারাগারে বাস সম্বন্ধে গাহিয়াছেন—

"ওরে শিকল, তোমার অঙ্গ ধরে
দিয়েছি ঝঙ্কার!

(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে করে খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌লো বেলা
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার।
তোমার পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারারাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।"

ভয় ভাঙা

চূড়ান্ত বিপদে মানুষ যেমন অভিভূত হইতে পারে, শান্তিও তেমনি হইতে পারে। কিন্তু ইহার আর একটা দিক্ আছে, যাহা বীরচিত্ত সাহসী লোকেরা দেখিতে পান, সেই দিকটির কথা "পরিত্রাণ" নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর একটি গানের শেষে পাওয়া যায়।

"সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি
দুঃখে যে-সুখ থাকে বাকি
কেই-বা সে সুখ নাড়বে?
যে পড়েচে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েচে তলায় এসে,
ভয় মিটেচে বেঁচেচে সে,
তারে কে আর পাড়বে।"

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র দার্শনিক সাধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'সাধনা' তিনি কিছুকাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। ছোটগল্প লেখায় এবং নানাবিধ প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অতি নিরহংকার অমায়িক সরল ও সাধু স্বভাবের লোক ছিলেন। নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠানে তিনি পরিশ্রম দ্বারা সহায়তা করিতেন।

শ্রাবণ, ১৩৩৭

কনফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (?) প্রভৃতির মত :—

দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর এক বন্ধু লণ্ডন হইতে তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, লর্ড আরুইনের বক্তৃতার বিষয় অবগত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিসটার এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বলিয়াছেন, যে, লণ্ডনের কনফারেন্সে ভারতীয়দের এখন সহযোগিতা করা উচিত। স্যার তেজ বাহাদুরের কোন্ বন্ধু তার করিয়াছেন জানা দরকার এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত কিরূপে জানিলেন তাহাও জানা দরকার। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের মত কি রূপ হইবে, অনুমান করিতে পারিতেছি না। কয়েক দিন হইল এণ্ড্রুজ সাহেব আমাদিগকে বিলাত হইতে তারযোগে জানান—

"I have always advocated Independence not Dominion Status."

"আমি বরাবর পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থন করিয়া আসিতেছি ডোমীনিয়ন স্টেটাসের নহে"। সুতরাং তিনি যে হঠাৎ বড় লাটের "ধরি মাছ না ছুঁই পানী" বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহার ভারতহিতৈষণা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমিক

ইংরেজ ; এই কারণে তাঁহার প্রত্যেক মতের অনুসরণ কোনও ভারতীয় কর্তব্য বলিয়া মনে না করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ বোধ হইতেছে। কিছু দিন আগে দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গেল রবিবাবু প্যারিসে বলিয়াছেন তিনি রোজ ২।৩ খানা ছবি আঁকিতেছেন, কবিতা লিখিতেছেন না, রাজনীতিতে তাঁহার অরুচি বাড়িতেছে, ইত্যাদি। অথচ তিনি এরূপ কোন কথাই কাহাকেও বলেন নাই। এ বিষয়ে তাহার নিজের চিঠি স্বচক্ষে পড়িয়া এ কথা লিখিতেছি। সুতরাং স্যার তেজ বাহাদুরের অপ্রকাশিত-নামা বন্ধু যাহা তার করিয়াছেন, রবিবাবুর সম্বন্ধে তাহা সত্য না হইতে পারে। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন নাই এবং দেশের সব অবস্থাও যাঁহারা দূর হইতে জানিতে পরিতেছেন না, তাঁহারা খুব মহৎ হইলেও নির্দিষ্ট কোন একটি পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ তাঁহারা দিতে অসমর্থ, এবং দিলেও সংগ্রামলিপ্ত লোকেরা তাহার অনুসরণ করা অকর্তব্য মনে করিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের ইহা ভাল করিয়া জানিবার বুঝিবার কথা। এই জন্য মনে হইতেছে স্যার তেজ বাহাদুরের বন্ধু কবির সম্বন্ধে হয়ত ঠিক খবর পান নাই, ও দেন নাই। অবশ্য নানা কারণে কবির বিবেচনার ভুলও ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি কথার উল্লেখ করিতেছি। কবির আধুনিক দুটি বিলাতী লেখায় লর্ড আরুইনের এবং ইংরাজ জাতির যে প্রশংসা আছে, তাহা তাঁহার মতে সত্য হই 'ও আমাদের বিবেচনায় ঠিক প্রাসঙ্গিক নহে এবং এরূপ প্রশংসা দ্বারা তাঁহার ইংরেজ দমন নীতির প্রতিবাদ নিন্দাবাদ ও সমালোচনার জোর কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে বলিয়াছেন ভারতবর্ষ ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন সাম্রাজ্যশাসক জাতির অধীন হইলে অত্যাচার আরও অনেক বেশী হইত, এই অপ্রাসঙ্গিক কথার দ্বারাও তাঁহার সমালোচনা দুর্বল হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতে পারেন, "আমি সত্য কথা লিখিয়াছি"। তিনি সাম্রাজ্য-স্থাপক সব জাতির সব কীর্তি পড়িয়াছেন কিনা, জানি না ; কিন্তু কি হইলে কি হইত সেরূপ অনুমান তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির অনুমান হইলেও তাহার মূল্য বেশী নয়।

দেশে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে যাহার খবর বিদেশে প্রকাশিত হওয়া দূরে যাক্ ভারতবর্ষেরই খবরের কাগজে বাহির হইতেছে না। সুতরাং বিদেশ প্রবাসী ভারতীয়দিগের খুব বুঝিয়া সুঝিয়া হিসাব করিয়া কথা বলা উচিত।

শ্রাবণ, ১৩৩৭

শান্তিনিকেতনে কারু-সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছবি আঁকা ছাড়া অন্য নানা রকম শিল্পও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে শিখান হয়। এখানে শিক্ষা পাইয়া শিল্পীরা দেশের সর্বত্র জ্ঞান বিস্তার করুন ইহা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত সব ভাল ছাত্র অন্যত্র চলিয়া গেলে মৌচাকটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য শান্তি-নিকেতন কারু-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রীত হইয়াছি। সর্বসাধারণ যদি সংঘের সভ্যদিগকে কাজ দেন ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন, তাহা হইলে কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মতো অল্প আয়েই সন্তুষ্ট হইয়া অনেক ভালো শিল্পী শান্তিনিকেতনেই থাকিতে পারিবেন। কারু-সংঘ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা নীচে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যাইবে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পীগণ এই সংঘ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সংবাদ দিয়া সকলেই অল্প আয়াসে নিজ নিজ প্রয়োজন মত শিল্পদ্রব্য বা তাহার নূতন ডিজাইন করাইয়া লইতে পারিবেন। বর্তমানে নিম্নলিখিত কারু শিল্প সমূহের আয়োজন আছে :—

ছবি, জলবর্ণ (Water colour), তৈলবর্ণ (Oil colour), বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন (Book illustration and poster) ;

মূর্তি—(Designs and portraits in clay, terra-cota and plaster of Paris) ;

সূচী শিল্প (Embroidery) ;

বাটিকের কাজ (Battique work on handkerchiefs, hand bags, table cloths and door curtains) ;

প্রাচীর চিত্র (Fresco) ;

বাসন ও গহনার নূতন ডিজাইন ;

দারুশিল্পের ডিজাইন (Furniture) ;

এতদ্ভিন্ন গৃহসজ্জার জন্য সকল রকম শিল্পদ্রব্যের ডিজাইন উপযুক্ত মূল্যে উপযুক্ত সময়ে করিয়া দেওয়া হয়।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা :

সম্পাদক, কারুসংঘ, কলাভবন, শান্তিনিকেতন পোঃ।

শ্রাবণ, ১৩৩৭

বিশ্বভারতীর রিপোর্ট

বিশ্বভারতীর ১৯২৯ সালের রিপোর্ট পড়িয়া বুঝা যায় কাজ ভালই চলিতেছে। কলেজ বিভাগে ছাত্রছাত্রী ঐ সালে বাড়িয়াছিল।

এ সালে সর্বত্র কমিয়াছে। কিন্তু বিশ্বভারতীতে বাড়িতেও পারে, কারণ, সেখানে পিকেটিং নাই। যাঁহারা নিজেদের প্রকৃত উন্নতির এবং ভবিষ্যতে মানবের সেবার জন্য সদ্য সদ্য দেশের কাজে প্রবৃত্ত না হইয়া জ্ঞানার্জনে কিছু কাল ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহারাও দেশের কাজে ব্যাপৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মত স্বদেশপ্রেমিক।

শ্রীনিকেতনের কাজ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। নূতন যে বিস্তৃত ভূখণ্ড লওয়া হইয়াছে তাহাতে চাষ হইলে ক্রমে ক্রমে শ্রীনিকেতন স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে।

বিশ্বভারতীতে সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সংগীত চিত্রাদি ললিতকলা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নিকটবর্তী অনেক গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। বস্তুত : বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা ভালো করিয়া হইলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব জীবনের অন্তর ও বাহিরের সহিত যেরূপ সর্বাঙ্গীন সংস্পর্শ স্থাপিত হইবে ভারতের অন্য কোন বিদ্যাপীঠে তাহা নাই। এখনও বিজ্ঞান ছাড়া অন্য সব দিকে সংস্পর্শ আছে।

ছাত্রীদের শিক্ষার ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যকর ও জনকোলাহল হইতে দূরবর্তী খোলা মাঠে ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারা অসংকোচে চলাফিরা করিতে পারে ; এবং সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সংগীত চিত্রাঙ্কন মূর্তিগঠন সূচীশিল্প নানাবিধ গৃহকর্ম প্রভৃতি শিখিতে পারে। তাহার জন্য অতিরিক্ত বেতন দিতে হয় না।

বিশ্বভারতীর আগেকার ব্যবস্থা হইতে দুইটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। নিকটবর্তী কোন কোন গ্রামের বালক বালিকাদিগকে এখনও তাহাদের বিদ্যালয়ে

শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আগে যেমন শান্তিনিকেতনের ছাত্ররাও পড়াইত এখন তাহা হয় না। পড়ান এখনও হয়তো ভালই হয় কিন্তু শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সহিত গ্রামের প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অতিথিশালায় যাহারা আসেন তাঁহাদের আদর যত্ন করিবার কতকটা ভার আগে ছাত্রদের উপর থাকায় তাহাতে ছাত্রদের উপকার হইত। এখন বন্দোবস্ত অন্যবিধ। এই উভয় প্রভেদে আগেকার চেয়ে ছাত্ররা পড়িবার সময় বেশী পায় কিনা জানিনা, কিন্তু সম্ভবতঃ হৃদয় মন বড় হইবার সুযোগ কিছু কমিয়াছে। এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

ভাদ্র, ১৩৩৭

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রদর্শিত হয়। তথাকার বিখ্যাত চিত্র সমালোচকেরা সেগুলির খুব প্রশংসা করেন। তাহার পর ছবিগুলি ইংলণ্ডের বার্মিংহাম শহরে প্রদর্শিত হয়। অতঃপর চিত্র গুলি জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে প্রদর্শিত হইতেছে। সেখানে প্রশংসা হইবে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা সকল দেশের সকল সময়েই বিরল। বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া এরূপ প্রশংসালাভ কয়জনের ভাগ্যে পৃথিবীতে ঘটিয়াছে?

শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল"

রবীন্দ্রনাথ এই বর্ষায় বিদেশে থাকিলেও শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গলের উৎসব হইয়াছিল। তিনি থাকিলে নূতন গান রচনা করিতেন, নূতন গল্প লিখিতেন। তাহা হইতে এবং তাঁহার উপস্থিতি হইতে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা আনন্দ ও প্রেরণা পাইত। এবার তাঁহার পূর্বরচিত গান শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় গীত হয়।

বৃক্ষরোপণ বর্ষামঙ্গলের অন্তর্গত একটি অনুষ্ঠান। কলেজের ছাত্রনিবাস

হইতে সংগীত সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া একটি আমলকির চারা পুষ্পপত্রে সজ্জিত ডুলিতে করিয়া তাহার মাথায় ছাতা ধরিয়া ছাত্রীদের আবাস শ্রীভবনের সম্মুখে আনা হয়। সেখানে সেটি রোপিত হয়। তাহার পূর্বে ছাত্র ও ছাত্রীরা গান করে, পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী অনুষ্ঠানের উপযোগী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃক্ষরোপণে সাহায্য করেন।

সন্ধ্যার পর কবির বাসগৃহ উত্তরায়ণের প্রাংগণে আবৃত্তি, কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীত হয়, এবং দুটি ছোট বালিকা সংগীতানুযায়ী অংগভংগী সহকারে একটি গান করে—

উদ্ভিদ সমূহ নানা প্রকারে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। মানুষ অরণ্যানী ও উদ্যান হইতে নির্মল আনন্দ লাভ করে। মানুষের অনেক আগে পৃথিবীতে উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। উদ্ভিদের সংগে মানুষের হৃদয়ের যোগ আছে বলিলে তাহা অনেকের কাছে কবিকল্পনা বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু কবিকল্পনা মাত্রই অলীক নহে। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে যেখানে শকুন্তলার প্রিয় লতিকাটির নিকট হইতে বিদায় লইবার বর্ণনা আছে তখন হইতে এ পর্যন্ত কত কবিই না নানা উদ্ভিদের সাহচর্যে শান্তি ও সান্ত্বনা পাইয়াছেন। উদ্ভিদ রাজ্য হইতে আহার্য পরিধেয় বাসগৃহ যানবাহন ও ঔষধের উপাদান সংগ্রহ ত করা যায়ই—এরূপ এমন কিছুও পাওয়া যায় যাহার মূল্য আরও অধিক।

আশ্বিন, ১৩৩৭

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ

ইউরোপের নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা করিতেছেন তাহা সবিশেষে আদৃত হইতেছে। হইবারই কথা। বার্লিনে তাঁহার অংকিত চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইবার পর তাহার মধ্যে পাঁচখানি ছবি জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার পর ক্রীত হইয়াছে। কবির এতদিনে জেনিভা পৌঁছিবার কথা। বৎসরের অন্য সময়ও জেনিভায় পৃথিবীর সব মহাদেশ ও দেশের লোক থাকে। এই সেপ্টেম্বর মাসে লীগ অব নেশন্সের মহাসভার অধিবেশন হওয়ায় তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়ে। এমন সময়ে তাঁহার জেনিভায় উপস্থিতি ভারতবর্ষের পক্ষে হিতকর হইবে।

কার্তিক, ১৩৩৭

বিশ্বভারতীতে উৎসব

সম্প্রতি বিশ্বভারতীতে হলকর্ষণ উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎকৃষ্ট বলদের জন্য ও চাষের জন্য কয়েকজন চাষীকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগের জন্য যে বিস্তৃত ভূখণ্ড ক্রয় করা হইয়াছে তাহার মধ্যে পাঁচখানি সাঁওতাল গ্রাম পড়িয়াছে। এই সব গ্রামের পুরুষ ও নারী উৎসবে যোগ দিয়াছিল। উৎসবান্তে বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে সাঁওতাল কৃষকদিগকে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।

বার বৎসর পূর্বে প্রসাদ নামক একটি বালক শান্তিনিকেতনের নিকটবর্ত্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রামে অনুন্নত শ্রেণীর বালকদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। তাহার নামে সেটি এখনও চলিতেছে। একটি বালিকা বিদ্যালয়ও ঐ গ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। উভয় বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্পাদক যে প্রতিবেদন পাঠ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ভুবনডাঙ্গা গ্রামে, যে সব নারী ইস্কুলে আসিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার ভারও বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা লইয়াছেন। তা ছাড়া, বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের পল্লীসেবাসংঘ গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানা কাজ করেন ও করান, রোগীর চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করেন, ছেলেদের খেলার আয়োজন করেন, এবং অন্যান্য উপায়ে পল্লীবাসীদের সহিত সহৃদয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

কোন পত্রিকা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে হইলে সেই পত্রিকার নাম উল্লেখ করিয়া তাহা করাই রীতি। কিন্তু কখন কখন কোন কোন সম্পাদক তাহা করেন

না মডার্ণ রিভিউ বা প্রবাসী হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া তাহার নাম না করিতে কাহাকেও কাহাকেও দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ রুশিয়া দেখিয়া আসিয়া তাহার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা জানিতে সকল পাঠকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য তাঁহার বক্তব্য যত বেশী লোকে পড়ে, ততই ভাল। প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত এবং পরে প্রকাশিতব্য তাঁহার চিঠিগুলির কোন কোন অংশ কোন সম্পাদক নিজের কাগজে উদ্ধৃত করিতে বা অনুবাদ করিয়া দিতে চাহিলে তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, শর্ত কেবল এই যে, প্রত্যেক সংখ্যায় উদ্ধৃত প্রত্যেক চিঠির অংশের **শিরোদেশেই** ছাপিয়া দিতে হইবে **"প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত।"** অনুবাদ সম্বন্ধেও শর্ত এই।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭

শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শিক্ষা

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত এস্, তাকাগাকি জাপানী ব্যায়াম ও কুস্তি জুজুৎসু শিক্ষা দিয়া থাকেন। জাপানে এই ব্যায়াম শিক্ষা দিবার যত খুব বিখ্যাত শিক্ষক আছেন তিনি তাহার মধ্যে একজন। শান্তিনিকেতনে অনেক ছাত্র ও ছাত্রী এবং অন্য কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। বালিকা ও বালকদের মধ্যে অনেক ইতিমধ্যেই জুজুৎসু শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী শিক্ষকের ছাত্র ছাত্রীরা এই বিদ্যা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন করা হয়। জাপানী শিক্ষক শ্রীযুক্ত তাকাগাকির দুই জন জাপানী বন্ধুও কুস্তিতে যোগদান করেন। তাঁহারাও এ বিষয়ে ওস্তাদ।

যথানিয়মে জুজুৎসু অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ও শরীর বলিষ্ঠ হয়, এবং আততায়ীর কোন কোন প্রকার আক্রমণ হইতে জুজুৎসু দ্বারা বেশ আত্মরক্ষা করা যায়। এই জন্য যাহারা জুজুৎসু জানে তাহাদের সাহস ও মনের স্থৈর্য বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশের পালোয়ান ও কুস্তিগীররা যে প্রকার মল্লযুদ্ধ করে এবং যত প্রকার প্যাঁচ জানে ও ব্যবহার করে, তাহার সহিত জুজুৎসুর নানা প্যাঁচের কিরূপ সাদৃশ্য ও প্রভেদ আছে তাহা কোন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ

চর্চা করিলে বলিতে পারিবেন, এবং জুজুৎসু হইতে আমাদের দেশী রীতির কিছু উন্নতি হইতে পারে কিনা তাহাও স্থির করিতে পারিবেন।

মাঘ, ১৩৩৭

সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য ও চিন্তার অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সাহিত্য-সমালোচনা ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আজকাল বাংলা কোন মাসিক কাগজেই ভাল করিয়া সাহিত্য সমালোচনা হয় না। তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন লেখা পড়িলে তাহা বুঝা যায়। ইহা আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে, যদি প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদ "সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ" বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ পান। রবীন্দ্র পরিষদ সর্বোৎকৃষ্ট দুটি প্রবন্ধের জন্য যথাক্রমে সুবর্ণ পদক এবং রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বহি পুরস্কার দিবেন। "যে কোন কলেজের ছাত্র ও রিসার্চ স্টুডেন্ট এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন।" প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ দিন ২৯শে মাঘ, পাঠাইবার ঠিকানা— অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১০৪ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কিংবা রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক, স্টুডেন্টস কমনরুম, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

ফাল্গুন, ১৩৩৭

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব

বিশ্বভারতীর যে বিভাগে কৃষির, পল্লীস্বাস্থ্যের ও নানাবিধ গ্রাম্য কুটীরশিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে এবং পল্লীগ্রামগুলিকে আবার শ্রীসম্পন্ন ও আনন্দময় করিবার প্রযত্ন হইতেছে, তাহা সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতনে অবস্থিত। গত ২৫, ২৬ ও ২৭শে মাঘ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনিকেতনের উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা বসিয়াছিল এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের প্রদর্শনীও বসিয়াছিল। প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্মী

ও ছাত্রেরা নানাবিধ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

বয়ণ বিভাগে যত রকম ধুতি শাড়ী ছিটের কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সতরঞ্চ, গালিচা, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কি প্রকারে আসন, গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে দেখান হয়। তুলা পাঁজ করিবার, টানা দিবার ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী দেখান হইয়াছিল। পল্লীগ্রামসকলের উন্নতি বিধানের জন্য যত প্রকার কাজ করা হইতেছে, রঙীন ছবির সাহায্যে তাহা বুঝান হয়। এইরূপ ষাটটি ছবি প্রদর্শনীর চালার দেওয়ালে ঝুলান ছিল। পল্লী সংগঠন বিভাগের ব্রতী বালকদের নানা প্রকার সংগ্রহ দেখান হয়। বহুবিধ বন্য ও উদ্যানজাত ফুল না... ব্যবহার সহ সংগৃহীত হইয়াছে দেখিলাম। ইহা উদ্ভিদ বিদ্যাবিৎ' চিকিৎসক, কবি, উদ্যান-রচনাকারী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের কাজে লাগিবে এবং অন্যেরাও ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন। আর একটি সংগ্রহও বেশ ভাল এবং তাহা লাভজনকও হইতে পারে। একটি বড় মোটা কাগজের খাতার পাতায় অনেক রকমের কাপড়ের নমুনার টুকরা, দাম, উৎপত্তিস্থান প্রভৃতি সহ আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রতী বালকদের তৈরী কাঠের জিনিস, আসন, ঝাড়ন, তাহাদের অঙ্কিত বীরভূম জেলার মানচিত্র ও তাহাতে মেলার ও তীর্থের স্থান প্রভৃতির সমাবেশ, এবং বীরভূম জেলার নানাবিধ তথ্যপূর্ণ হস্তলিখিত পুস্তক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের দ্বারা উৎপন্ন নানাবিধ তরকারীও বেশ হইয়াছিল।

পল্লী বিভাগের মহিলা সমিতির নানা প্রকার সূচের কাজ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইরূপ কাজ করিয়া কয়েকজন অন্তঃপুরিকা উপার্জন করিতেছেন। কাজগুলি সুন্দর বলিয়া অনেক বিক্রীও হইয়াছিল।

কর্মকার বিভাগে গৃহস্থালীর জন্য আবশ্যক নূতন রকমের লোহার চুল্লী প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল। এই বিভাগে গ্রামের দশজন ছেলে শিক্ষা পাইতেছে।

গালার তৈরী অনেকগুলি জিনিষ এবং লাক্ষালিপ্ত (lacquered) কাঠের বাক্স, টেবিল, আয়নার ফ্রেম প্রভৃতি খুব সুন্দর হইয়াছে। শ্রীনিকেতনের কর্মকার বিভাগে সুন্দর চামড়া কষ হইতেছে এবং চামড়ার মনিব্যাগ, চেয়ারের গদি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

নূতন নূতন ডিজাইনে বাঁধা পুস্তকও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এবারকার ব্রতী বালকদের বার্ষিক সম্মিলনীতে বীরভূম জেলার মোট ১২টি দলের ৩০০ জন বালক যোগ দিয়াছিল। তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে প্রতিযোগিতা করিয়াছিল এবং যোগ্যতম বালকেরা পুরস্কার পাইয়াছিল। (১) সংগ্রহ ও তথ্য সংগ্রহ—(ক) ফুল, (খ) নানা প্রকার কাপড়ের নমুনা, (গ) বীরভূম জেলার তথ্য। (২) হাতের কাজ—(ক) বয়ন, (খ) কাঠের কাজ। (৩) খেলাধুলা—(ক) ড্রিল (আদেশগুলি সব বাংলায় দেওয়া হয়), (খ) তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ, (গ) সন্তরণ, (ঘ) বাধা অতিক্রম করিয়া দৌড়, (ঙ) অন্যান্য খেলা, (চ) টেকো দ্বারা সূতাকাটা।

ইহা ছাড়া শ্রীনিকেতনের ব্রতী বালকেরা লাঠি ও ছোরা খেলা, পোল ও আইরিশ ড্রিল, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি দেখাইয়াছিল। এবৎসর ব্রতী বালকদের প্রতিযোগিতায় শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্রের দল মোটের উপর সর্বপ্রথম হওয়ায় ব্রতী বালকদিগের পতাকা লাভ করে। ২৫শে মাঘ রাত্রে শ্রীনিকেতনের ব্রতী বালকদল রবীন্দ্রনাথের "মুকুট" নাটক অভিনয় করিয়া সমবেত জনগণকে পরিতৃপ্ত করে।

চৈত্র, ১৩৩৭

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনের উৎসব

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। সেই উপলক্ষ্যে উৎসব করিবার আয়োজন হইতেছে। এই জয়ন্তী উৎসব সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত চিঠিখানি পাইয়াছি,—

যথাযোগ্য সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

আগামী ১৩৩৮ সনের ২৫শে বৈশাখ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে সুচারুভাবে একটি জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ইহাতে কবি এবং তাঁহার অনুষ্ঠানের সহিত প্রীতিযুক্ত সহৃদয়বর্গের শুভেচ্ছা ও সহযোগ লাভ করিব, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

এই সময় বিশেষভাবে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক, কর্মী অথবা যাঁহারা

যে কোনো ভাবে মনে মনে আশ্রমের সঙ্গে যোগযুক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের বর্তমান ঠিকানা জানাইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের ঠিকানা এবং জন্মোৎসব সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

ইতি—১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭ সন।
নিবেদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	শ্রীপ্রমোদারঞ্জন ঘোষ
শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ
শ্রীনেপালচন্দ্র রায়	শ্রীহেমবালা সেন

শ্রীআশা অধিকারী

যাঁহাদের উদ্দেশে এই চিঠি লিখিত হইয়াছে, আশাকরি তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট নিজ নিজ ঠিকানা পাঠাইয়া দিবেন। অন্য কিছু জানাইবার ও জানিবার প্রয়োজন থাকিলেও তাঁহাকেই চিঠি লিখিলেই চলিবে।

পরে জানা গেল, কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতনে অবশ্য ২৫শে বৈশাখই হইবে। সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার জয়ন্তী উৎসব ১০ই শ্রাবণ রবিবার ২৬শে জুলাই হইবে।

২৫শে বৈশাখ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষ্যে বন্ধ থাকিবে। তখন শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মাতিশয্য এবং জলের দুষ্প্রাপ্যতাও ঘটিবার সম্ভাবনা। এইজন্য জয়ন্তী উৎসব কমিটি ১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) হইবে স্থির করিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। একখানিতে বাংলা ও অন্যান্য কোন কোন ভারতীয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে। তৎসম্বন্ধে কমিটি, যে সকল লেখকের নাম ও ঠিকানা জানেন তাঁহাদিগকে নিম্নমুদ্রিত চিঠিখানি পাঠাইয়াছেন,—

রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা
শান্তিনিকেতন

সবিনয় নিবেদন—

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব সমাগত প্রায়। আশ্রম বাসীদের ইচ্ছা তাঁহার এই জয়ন্তী-উৎসবটি আশ্রমে ভালরূপে সম্পন্ন হয়। আমরা জানি আপনি কবির একজন বিশিষ্ট অনুরাগী। আমাদের দেশে ও বিশ্বজগতে কবির দান সম্বন্ধে আপনি যে-কোনো দিক্ হইতে যদি কোনো লেখা এই উপলক্ষ্যে আমাদিগকে দেন, তবে আমরা অতিশয় অনুগৃহীত হইব। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে এই মহাকবির ভাব কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এই উপলক্ষ্যে তাহার একটা সংগ্রহ করিতে আমরা ইচ্ছা করিয়াছি। রচনা মাতৃ-ভাষায় অথবা ইংরাজীতে—যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, আপনি লিখিতে পারেন। আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে লেখাটি "শ্রীযুক্তা আশা অধিকারী, শান্তিনিকেতন"—এই ঠিকানায় পেঁছানো প্রয়োজন। ইতি শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩৭ সন।

ভবদীয়

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শ্রীনেপালচন্দ্র রায় শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শ্রীপ্রমোদারঞ্জন ঘোষ
শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ

অন্য একখানি বহিতে ইংরেজী ও অন্য কোন কোন পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি এবং বহুবর্ণে মুদ্রিত কয়েকখানি ছবি থাকিবে। সুবিখ্যাত ফরাসীলেখক রমঁ্যা রলাঁ তাঁহার এতদ্বিষয়ক চিঠিতে "গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর" (Golden Book of Tagore) নাম দিয়া প্রস্তাবিত এই বহিটির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরোধ পত্রটি ফরাসী ভাষায় তাঁহারই লেখা; ইংরেজীটি তাহার অনুবাদ। তাঁহার রচিত একটি কাব্যাংশ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। বহিটি সম্বন্ধে অনেক লেখকের ও চিত্র-শিল্পীর নিকট নিম্নমুদ্রিত অনুরোধপত্র প্রেরিত হইয়াছে। অনুরোধপত্রের পরিবর্তে কাহাকেও কাহাকেও মৌখিক বা স্বতন্ত্র পত্র দ্বারা অনুরোধও করা হইয়াছে। কবিকে যাঁহারা ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, এরূপ সমুদয় লেখক ও শিল্পীর নাম ও ঠিকানা কমিটির জানা না থাকায় হয়ত সকলের নিকট অনুরোধপত্রটি যায় নাই।

TAGORE BIRTHDAY CELEBRATION : 1931

"Golden Book of Tagore".

On the 8th May next Rabindranath Tagore completes his seventieth year. This occassion ought to bring together his friends all over the world round him—friends whose lives have been lighted up, broadened, ennobled by his own life. He has been for us the living symbol of the Spirit, of Light and of Harmory—the great free bird which soars in the midst of tempests—the song of Eternity which Ariel strikes on his golden harp, rising above the sea of unloosened passions.

But his art has never remained indifferent to human misery and struggles. He is the "Great Sentinel". In tragic hours, he is the clear-eyed and bold watchman of his own people and of the world.

In the name of thousands whom his melodious voice has nourished with faith, hope and beauty, we invite his poet, artist, scholar and other friends to come forwa and present to him on his seventieth birthday a sheaf of their spiritual fruits and flowers. As a token of gratitude, therefore everyone might offer him a twig from his own garden—a poem, an essay, a chapter of a book, a piece of scientific research, a drawing, a thought etc.

For all that we are and we have created have had their roots and branches bathed in the Great Ganges of Poetry and Love.

Jagadis Chunder Bose
Mohandas Karamchand Gandhi

Romain Rolland
Albert Einstein
Costis Palamas

All contributions are to be sent to—

MR. RAMANANDA CHATTERJEE
SANTINIKETAN, BENGAL, INDIA

চৈত্র, ১৩৩৭

শান্তিনিকেতনে গান্ধী পুণ্যাহ

মহাত্মা গান্ধী অনেক বৎসর পূর্বে কিছু দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তখন এখানকার ছাত্রদিগকে সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে তিনি বলেন। তাঁহার এখানে অবস্থিতির সশ্রদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ছাত্র ও ছাত্রীরা বৎসরে একটি দিন বিশেষ ভাবে যাপন করেন। এবার ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সেই দিন পড়িয়াছিল। এই দিন আশ্রমের সমুদয় ভৃত্য ছুটি পায় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের সমুদয় কাজ নিজে করে। মেথরের কাজও ছাত্রেরা করে। রন্ধন পরিবেষণ প্রভৃতি কাজও তাহারা করে। আশ্রমে অনেক দেশের, প্রদেশের, ধর্মের ও জাতির ছোট বড় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ একত্র ভোজন করিয়া থাকেন শুধু গান্ধী দিবসে নয়, অন্য সময়েও। এখন এখানে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোক ছাড়া আমেরিকা, জাপান, চীন, তিব্বৎ, সিংহল, হাঙ্গেরী, ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের লোক আছেন। হিন্দু ছাড়া এখানে জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, পারসী ও মুসলমান আছেন। যেখানে ছাত্রীরা থাকেন তাহার নাম শ্রীভবন। সেখানে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে একটি বিবাহিতা মুসলমান বালিকা আছেন এবং একটি পারসী, একটি সিংহলী ও একটি জাপানী মেয়ে আছেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জীবন নানা সাধনায় ও কর্মে পরিপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ মানবদিগের মধ্যে এই অক্লান্তকর্মীর স্থান কোথায় তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্বদেশে ও বিদেশে অনেকে করিয়াছেন। আমরা তাহা করা অনাবশ্যক মনে করি। অন্যেরা আবশ্যক মনে করিলেও, তাহা করিবার মত জ্ঞান ও শক্তি আমাদের নাই।

তাঁহার প্রতিভা কোন্ বিষয়ে কত উচ্চ শ্রেণীর তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, মানব চরিত্রের জ্ঞানে ও বিশ্লেষণে, সাহিত্যের নানা বিভাগে সৃষ্টির কার্যে, গান রচনায়, সুরের সৃষ্টিতে ও কণ্ঠসঙ্গীতে চিত্রাঙ্কনে ও স্থাপত্যে, অভিনয়ে ও নৃত্যকলায়, রাজনীতির সার অংশের জ্ঞানে, শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে ও তাহার অনুসরণে দার্শনিক তত্ত্বের মর্মোদ্ভেদে, আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জীবনকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্ব বৈচিত্র্যের সহিত সকল দিক দিয়া সমঞ্জসীভূত করিবার সাধনায়, তাঁহার যে অসামান্য ও বহুমুখী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অতীত ও বর্তমান কালের অন্য কোন মানুষে একাধারে তাহা দেখা গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহার দ্বারা আমরা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিতেছি না; তাঁহার কোন অসম্পূর্ণতা নাই, তাহাও বলিতেছি না। এক একটি বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা প্রতিভাশীল ও শক্তিমান অন্য অনেকে ছিলেন ও আছেন। আমরা কেবল এই বলিতেছি যে তাঁহার মতো বিচিত্রশক্তিমান পুরুষ বিরল।

কালে আমরা তাঁহার সামসাময়িক। অন্যরূপ নৈকট্যও তাঁহার সহিত আমাদের কাহারো কাহারো আছে। এই জন্য আমরা কেহ বা তাঁহাকে অযথা বড় করিয়া দেখিতে পারি, কেহ বা অযথা ছোট মনে করিতে পারি; তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ভবিষ্যতের মানুষেরা লাভ করিতে ও দিতে পারিবে। তাঁহার চরিত ও ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের ও ভারতের বাহিরের পৃথিবীর কতখানি কল্যাণ ও আনন্দের কারণীভূত তাহাও এখনও সংক্ষেপে বলিবার নহে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাহা বিবৃত হইবে।

নানা দেশ হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনের টেলিগ্রাম হইতে বুঝা যায় বিদেশে তাঁহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

কবির সপ্ততি বৎসর পূর্তির উৎসব

সবিনয় নিবেদন—

অদ্য ২৫ শে বৈশাখ ১৩৩৮ (শুক্রবার, ৮ই মে, ১৯৩১) কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে এই শুভঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা এবং একটি আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

ঐ সংবর্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ (শনিবার, ১৬ই মে ১৯৩১) সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট গৃহে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে।

এই সভায় আপনার উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়। ইতি কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু	শ্রীজলধর সেন
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	✓মুজীবর রহমান
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	আনন্দজী হরিদাস
শ্রীকামিনী রায়	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	✓এস খোদাবক্স
বাসন্তী দেবী	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
শ্রীঅবলা বসু	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)
শ্রীসরলা রায়	সরলা দেবী
শ্রীনীলরতন সরকার	মালুক সিং বেদী
শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী	হরিরাম গোয়েংকা

আবুল কালাম আজাদ
ঘনশ্যামদাস বিরলা
ডেভিড এজরা
শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
সুচারু দেবী (ময়ূরভঞ্জ)
শ্রীমন্মথনাথ রায়চৌধুরী (সন্তোষ)
শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু
শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়
খাজা নাজিমউদ্দিন
শ্রীযদুনাথ সরকার
গগনবিহারী এল মেহতা
শিবানন্দ (বেলুড়)
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
ফস, কলিকাতার লর্ড বিশপ
আর্থার মূর
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী
শ্রীহৃষীকেশ লাহা
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার)
ডাবলু এস্ আরকুহার্ট
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়
শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়
এ কে ফজলুল হক
এইচ এ গিডনী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পদম্‌রাজ জৈন
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন
হাসান সুরাবর্দী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়
শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ই সি বেনথল
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়
শ্রীশরৎকুমার রায় (দিঘাপতিয়া)
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
নন্দলাল পুরী
ওংকার মল জাতিয়া
জাহাংগীর কয়াজী
শ্রীসরোজিনী দে
গুরুদিৎ সিং
এ এফ্ এম্ আব্দুল আলি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

"বর্ষপঞ্জী"

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে ও অন্য কোথাও কোথাও উৎসব হইয়াছে। এখন কবির জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার ও কাজের তারিখ এবং তাঁহার কোন্ বহি কখন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানিবার কৌতূহল অনেকেরই হইবে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে এই সব তথ্য লিখিত আছে। উহা প্রবাসী কার্যালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত সাড়ে চারি আনা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

"কবি পরিচিতি"

সম্প্রতি একটি সময়োপযোগী বহি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র পরিষদ কতৃক প্রকাশিত "কবি পরিচিতি"। নামটি কবি নিজে দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে তাঁহার একটি কবিতা, একটি প্রতিভাষণের অনুলিখন এবং প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় সোমনাথ মৈত্র, রাধারানী দত্ত, নীহাররঞ্জন রায় এবং গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের সাতটি প্রবন্ধ আছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

"রাশিয়ার চিঠি"

আর একটি অন্য রকমের সময়োপযোগী পুস্তক রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব দিবসে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসীতে কবির রুশিয়া সম্বন্ধে যতগুলি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার অপর কয়েকটি লেখা একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া সবগুলি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। রুশিয়া সম্বন্ধে নানাকথা জানিবার কৌতূহল অনেকেরই

আছে, যাঁহারা প্রবাসী পড়েন না তাঁহারা এই পুস্তকে প্রত্যক্ষদর্শী কবির ঐ চিঠিগুলি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। আর যাঁহারা প্রবাসী পড়েন তাঁহাদেরও চিঠিগুলি আবার এক জায়গায় পড়িবার ও রাখিবার সুবিধা হইল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

বক্সা দুর্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী*

(নির্বাসনের বন্দীদের কবি বন্দনা)

[বক্সা দুর্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। নানা অসুবিধা ও বিঘ্নের ভিতর দিয়া উৎসবকে মনের মত সুন্দর করিতে পারা না গেলেও যতটা সম্ভব ভালোই হইয়াছিল।

উৎসবক্ষেত্রে মঞ্চটি ভারতীয় রীতিতে সুন্দররূপে সাজান হয়। মঞ্চের সম্মুখে দুইধারে কদলী বৃক্ষ ও মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া আলপনা দেওয়া হয় এবং সামনের দিকে একসারী প্রদীপ দেওয়া হয়। সর্বপ্রথমে ঐকতানবাদনের পর কবির উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। মঞ্চের উপর রবীন্দ্রনাথের এই উপলক্ষ্যে অংকিত ছবি অতি সুন্দর করিয়া সাজান হয়, এবং অভিনন্দন পাঠান্তে উক্ত চিত্রের কাছে উহা উপস্থাপিত করা হয়। অতঃপর "জনগণ মন অধিনায়ক" গানটি মিলিতকণ্ঠে গীত হয়। সর্বশেষে "শেষ বর্ষণ" অভিনীত হয়।]

অভিনন্দন পত্র

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণকমলে—

ওগো কবি,

"আমরা তোমায় করি গো নমস্কার।"

সুদূর অতীতের যে পুণ্যপ্রভাতক্ষণে তোমার আবির্ভাব আজ বাংলার সীমান্তে নির্বাসনে বসিয়া, আমরা বন্দীদল তোমার সেই জন্মক্ষণটিকে বন্দনা করি। আর স্মরণ করি বিরাট মহাকালকে যিনি সেই ক্ষণটির দ্বারপথ উন্মুক্ত করিয়া এই দেশের মাটির পানে তোমাকে অংগুলি ইংগিতে পথ দেখাইয়াছেন।

যেদিন জ্যোতির্ময় আলোক দেবতা তমসাতীরে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিলেন, আলোকবহ্নির আত্মপ্রকাশই তো সেদিনকার একমাত্র সত্য নয়।

* এই অংশটি বিবিধ প্রবন্ধ থেকে গৃহীত নয়। ঐ শিরোনামেই আলাদা প্রবন্ধ।

সেই একের প্রকাশে সুপ্তির অন্ধকার তটে তটে বিচিত্র বহুও যে আপনাকে জানিয়া, জানাইয়া উঠিয়াছে। হে মর্ত্যের রবি, তোমার আকাশবিহারী বন্ধুর সংগে তোমার যে পরম সাদৃশ্য আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তুমি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছ ;—তাই ত বিস্মৃতির অখ্যাত প্রদেশে আমাদের মাঝে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

হে ঐশ্বর্যবান তোমার মাঝে জাতি আপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়াছে।

হে ধ্যানী তোমার চোখে জাতি মহান বিশ্বমানবের স্বপ্ন দেখিয়াছে।

হে সাধক, তোমার হাতে জাতি আপনার সাধনার ধন গ্রহণ করিয়াছে।

তাই কি তুমি প্রত্যেকের পরমাত্মীয় ?

হে ঋষি, তোমার জন্মক্ষণে এই বাংলার জন্মগেহে সমগ্র জাতির জন্ম-জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। অজাত আমরা সেদিন অজানা নীহারিকাপুঞ্জের মাঝে না জানিয়াও শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আজ জাগ্রত জীবনের যাত্রাপথে দাঁড়াইয়া, হে অগ্রজ, তার ঋণ শোধ করি। আমরা না আসিতে তুমি আমাদের জীবনের জয়গান গাহিয়াছ ঃ আমরা সে দান প্রণামের বিনিময়ে আজ অঞ্জলি পাতিয়া লইতেছি।

তোমার জন্মক্ষণটি পিছনের অতীতে হয়ত হারাইয়া গিয়াছে—কিন্তু আজি-কার এই স্মরণদিনে আমাদের কণ্ঠের জয়ধ্বনি সম্মুখের অগণিত মুহূর্ত-শ্রেণীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তের শেষ সীমান্ত পারে গিয়া পেঁছুক।

হে কবিগুরু ! আমরা "তোমায় করি গো নমস্কার" ; অবরুদ্ধের অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি

বক্সা দুর্গ
ভুটান-সীমান্ত
রবীন্দ্র-জয়ন্তীবাসর

গুণমুগ্ধ
সমবেত রাজবন্দী

প্রত্যভিনন্দন

বকসা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহংগ বাঁধা সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্ব স্রোতে

বন্দি বারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন।
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অংকুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কি বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী॥
"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনালো বিশ্বময়
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে
বন্দীর শৃংখলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জিলিং
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ :

শ্রাবণ, ১৩৩৮

প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসরীয় সম্বর্ধনা

ফ্রান্সে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সমিতি আছে। তাহার নাম অ্যাঁস্তিত্যু দ্য সিভিলিজাসিয়োঁ অ্যাঁদিয়েন (Institut de Civilisation Indienne)। এই সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটি সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ফরাসী এবং ভারতীয় অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের একত্র গৃহীত যেরা ফটোগ্রাফের প্রতিলিপি দিলাম। উভয় দেশের দুই এক জনকে মাত্র চিনিতে পারা যাইতেছে। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সিলভেঁ লেভিকে চেনা যাইতেছে। কাঠিয়াবাড়ের সর্দারসিংজী রাণা এবং স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভাগিনেয় বাঙালী যুবক ডাক্তার বিমলকুমার সিদ্ধান্তকে চেনাও যাইতেছে।

সভাস্থলে সমবেত অনেকে একটি কাগজে তাঁহাদের নাম রোমান, বাংলা

ও নাগরী অক্ষরে স্বাক্ষর করিয়া কবির প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের স্বাক্ষরগুলির প্রতিলিপি দিলাম। এই স্বাক্ষরগুলির প্রথমটি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর শ্রীযুক্ত শার্লেতির ও দ্বিতীয়টি বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা কম্‌তেস্ দ্য নোয়াইয়ের অন্য স্বাক্ষর-কারীদের মধ্যেও অনেক বিখ্যাত লেখক লেখিকা আছেন। স্থানাভাবে তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল না। বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ কেহ বাংলা দস্তখতগুলিতে নিজেদের আত্মীয় আত্মীয়ার হস্তাক্ষর দেখিতে পাইবেন।

শ্রাবণ, ১৩৩৮

ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রজয়ন্তী

আমরা দেখিয়া প্রীত ও উৎসাহিত হইলাম যে বঙ্গের ছাত্রী ও ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসবের আয়োজন, কবির বাণী সর্বত্র প্রচারের আয়োজন, এবং বিশ্বভারতীর প্রতি কার্যতঃ দেশব্যাপী মৈত্রী প্রদর্শনের উপায় অবলম্বন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই সংকল্প কেবল হিন্দু মুসলমান বাঙালী ছাত্রীছাত্রেরা করেন নাই, অন্য কোন কোন ছাত্রও ইহাতে যোগ দিয়াছেন।

শ্রাবণ, ১৩৩৮

সর্বসাধারণের রবীন্দ্রজয়ন্তী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটের গত ২রা জ্যৈষ্ঠের সভায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করিবার নিমিত্ত যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটির এক অধিবেশনে উহার বিবেচনার জন্য উৎসব সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। উৎসবটি সপ্তাহব্যাপী করিবার অভিপ্রায় আছে। কোন্ দিন কি করা যাইতে পারে তাহার একটু আভাস প্রস্তাবে আছে। প্রথম দিনে উদ্বোধনের অনুষ্ঠান এবং কবির রচনাবলী সম্বন্ধে বাংলায় লিখিত প্রবন্ধাটি পাঠ ও কবিতা পাঠ ; দ্বিতীয় দিনে কবির ইংরেজী গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এবং তাঁহার দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক মত, শিক্ষাকার্য, রাজনৈতিক মত, গ্রাম সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ক

কার্য সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রবন্ধাদি পাঠ। এই দিনের কাজে যোগ দিবার জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মনীষীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। ৩য় ও ৪র্থ দিবসে সংগীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সৃষ্টি সম্বন্ধে বাংলায় ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ, এবং তাঁহার রচিত নানা প্রকারের গান গাইবার ব্যবস্থা হইবে। পঞ্চম দিনে তাঁহার কোন নাটকের অভিনয় হইবে। ষষ্ঠ দিবসে তাঁহাকে বিভিন্ন সভাসমিতি কর্তৃক অভিনন্দন পত্র দ্বারা সম্বর্ধনা এবং অর্থ উপহার। সপ্তমদিবসে কবির দর্শন লাভার্থ উদ্যান সম্মিলনের আয়োজন, প্রস্তাবে এই সঙ্গে সঙ্গে একটি মেলারও আয়োজন করিবার কথা আছে। মেলার অঙ্গ হইবে (১) প্রদর্শনী (২) আমোদ প্রমোদ (৩) খেলা কুস্তী ইত্যাদি, এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য ও মনোরঞ্জক বক্তৃতাবলী। প্রদর্শনীতে রাখা হইবে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি, তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর যে সব হস্তলিপি পাওয়া যায়; তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ; ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তাঁহার গ্রন্থসমূহের অনুবাদ; বাংলা ইংরেজী ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বহি; তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ফটোগ্রাফ, তাঁহার নানা রকমের ছবি, ও নানা দেশে তাঁহার নানা বক্তৃতা ও অন্য কাজের সভাদির ছবি; নানা দেশে তাঁহাকে প্রদত্ত উপহারাবলী; কলাভবনের ছাত্রী-ছাত্রদের, শ্রীভবনের ছাত্রীদের এবং শ্রীনিকেতনের ছাত্রীছাত্রদের নানা শিল্প-কার্যের নমুনা; সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, ও প্রাচীন ও নবীন কুটীরশিল্পের নমুনা; এবং আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকর সম্প্রদায়ের অঙ্কিত ছবি। আমোদ প্রমোদের মধ্যে কথকতা, যাত্রা, কীর্তন, বাউলের গান, গম্ভীরার গান প্রভৃতি এবং রায়বেঁশের নাচ প্রভৃতি থাকিবে। খেলার মধ্যে দেশী খেলা জিউজিৎসু এবং ব্রতী বালক ও ব্রতী বালিকাদের নানা কাজ প্রদর্শন থাকিবে। বক্তৃতাগুলির মধ্যে বিশ্বভারতীর নানা বিভাগের কাজের বর্ণনা করা হইবে এবং ম্যাজিক লণ্ঠন ও সিনেমার সাহায্য লওয়া হইবে। উৎসব ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া করিবার কথা হইয়াছে।

বাংলা ও ইংরাজীতে লিখিত নানা প্রবন্ধাদি সম্বলিত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে।

সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম, সংগীত, চিত্রকলা, অভিনয়, নানা ঋতু উৎসব,

নৃত্য, গৃহধর্মে গৃহস্থালীতে বাসভবনাদি নির্মাণে শিল্প ও কলার প্রতি অভিনিবেশ, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি ও জাতিগঠন, গ্রামসংগঠন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, জগতে শান্তির, মৈত্রীর বার্তা প্রচার, প্রভৃতি নানা বিষয়ে ও দিকে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ কাজ করিয়াছেন, উৎসব উপলক্ষ্যে সকলকে তাহার কিছু আভাস দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আমাদের বিবেচনায় প্রস্তাবটি সুচিন্তিত। ইহার কোন কোন অংশে পরিবর্তন পরিবর্ধনাদি হইতে পারে ও হইবে বটে। কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী মোটের উপর এই প্রকারে সপ্তাহ ব্যাপিয়া হইলে তাহা কবির সর্বতোমুখী প্রতিভার এবং মানুষকে আনন্দ দিবার ও মানুষের কল্যাণ সাধনের বহুবিধ চেষ্টায় বিকশিত তাঁহার মানব-প্রীতির অনুরূপ হইবে।

কার্তিক, ১৩৩৮

চট্টগ্রাম ও হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

চট্টগ্রাম ও হিজলীর ভীষণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে কলিকাতার গড়ের মাঠে যে বিরাট সভা হয় তাহাতেআনুমানিক এক লক্ষ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ নিম্নে মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন :—

"প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোন অন্যায় ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

"এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর মনের পক্ষে উদভ্রান্তি জনক ; কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েচে।

"যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সংগে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে ভারতে ব্রিটিশ

শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশংকা ঘটলো। নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায়প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের পরে সেই সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

"এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশ বাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তারপক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে। কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি? একথা ভুললে চলবে না যে প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

"আমি আজ উগ্র উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে তত উর্ধে আমাদের ধিক্কার বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতেই পারবে না। একথাও মনে রাখতেই হবে যে আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে, এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিনতর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

"উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসীসকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তিদান করবে।

কার্তিক, ১৩৩৮

একখানি মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মহাভারতের সানুবাদ ও সটীক সংস্করণ সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত মত আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।—

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নীলকণ্ঠকৃত ও নিজকৃত টীকা ও বঙ্গীয় অনুবাদ সমেত মহাভারত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার সতেরো খণ্ড আমার হাতে আসিয়াছে। আদিপর্ব শেষ করিয়া সভাপর্ব আরম্ভ হইল।

এমন করিয়া মহাভারত প্রকাশ করিতে যে সাহস, সতর্কতা, পাণ্ডিত্য ও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তাহা সম্পূর্ণই আছে।

একথা বলিতে পারি পণ্ডিত মহাশয়ের এই অধ্যবসায়ে আমি নিজে তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার অল্প বয়স হইতেই মহাভারত আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের হিমালয়েরই মত যেমন উত্তুঙ্গ তেমনি সুদূর প্রসারিত।

"পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিত : পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।"

পৃথিবীর মানদণ্ডই বটে। এই একখানি গ্রন্থ নানাদিক দিয়া বিরাট মানব চরিত্রের পরিমাপ করিয়াছে। একাধারে এমন বিপুল বিচিত্র সাহিত্য আর কোন ভাষায় নাই। অন্য দেশের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে মহাভারত না পড়িলে আমাদের দেশের কাহারো শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জাভা দ্বীপে গিয়ে যখন দেখিলাম, সেখানকার সমস্ত লোক এই মহাভারতকে কেবল মন দিয়া নয় সর্বাঙ্গ দিয়া আয়ত্ত করিয়াছে, এই কাব্য তাহাদের সর্বদেশব্যাপী চিরকালের উৎসবক্ষেত্র রচনা করিয়া দিয়াছে তখন স্বদেশের কথা স্মরণ করিয়া মনে ঈর্ষা জন্মিল। আমাদের দেশেও এই কাব্য বনস্পতি আজও সতেজ আছে বটে, কিন্তু ইহার শাখায় প্রশাখায় ভারতের চিত্ত একদা যে নীড় বাঁধিয়াছিল সে যেন আজ শূন্য হইয়া আসিতেছে। মানবমনের

এতবড় আশ্রয় আর কোনো দেশে আছে বলিয়া জানি না—তবু উদাসীন ভাবে এই আবাস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতেই পারে না। জাভায় এই যে দেখিলাম একটি সমগ্র জাতিকে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার আনন্দভোজের আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে, একমাত্র মহাভারতের দ্বারা ইহা সম্ভবপর হইতে পারিল। যে দেশের বাণীতে ইহার জন্ম, সেই দেশেও যদি আমরা এই কাব্যকে বইয়ের শেলফে নির্বাসিত না করিয়া সার্বজনীন সম্পদরূপে চিত্তোৎকর্ষের ব্যবহারে গভীরভাবে গ্রহণ করিতে পারি তবে আমাদের সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে আমাদের চরিত্র বীর্যবান হইতে পারিবে।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের শুভ সংকল্প সিদ্ধ হউক একান্ত মনে এই কামনা করি। গ্রন্থ প্রকাশকার্য তিনি সমাধা করিতে পারিবেন ইহাতে আমার সংশয় নাই—বাহিরের আনুকূল্য যথোচিত পরিমাণে না পাইলেও তাঁহার লক্ষ্য স্থির থাকিবে—কিন্তু দেশের লোক তাঁহার এই কার্যটিকে যদি সম্মানের সহিত গ্রহণ না করে এবং ঔদাসীন্য দ্বারা তাঁহার কর্তব্যভারকে গুরুতর করিয়া তোলে তবে সেই অপরাধ বাঙালীর পক্ষে লজ্জার বিষয় হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ই আশ্বিন ১৩৩৮
শান্তিনিকেতন

কার্তিক, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ কবিসার্বভৌম

বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর যে অগণিত লোকসমষ্টি ও নানা প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী, তাঁহাদের সেই গুণগ্রাহিতার বাহ্য প্রকাশও আবশ্যক। এই জন্য কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ সভা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে কবি সার্বভৌম উপাধি দেওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের প্রীত হইবার আরও একটি কারণ আছে। উপাধিদানের কিছু দিন আগে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের সহিত অভিন্নাত্মা অভিন্নহৃদয় একজন দার্শনিক প্রবাসী সম্পাদকের সহিত অভিন্নাত্মা অভিন্নহৃদয় এক ব্যক্তিকে বলেন, সংস্কৃত কলেজ কবিকে 'কবি চক্রবর্তী" উপাধি দিবেন মনে করিতেছেন, এবং সে বিষয়ে

দ্বিতীয় ব্যক্তির মত জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, 'কবি সার্বভৌম' উপাধি দিলে ভাল হয়। কারণ তাঁহার কবিযশ সর্বদেশব্যপী। "কবি-চক্রবর্তী" উপাধি সম্বন্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, কবি নিজের "শেষের কবিতা" উপন্যাসে আপনাকে কৌতুকভরে "নিবারণ চক্রবর্তী" ছদ্মনাম দিয়াছেন; তাঁহাকে যে উপাধি দেওয়া হইবে, তাহাতে ঐ ছদ্মনামের প্রতিধ্বনি না-থাকাই ভালো। আমাদের অভিন্নাত্মা ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির উপক্ষেপ গৃহীত হওয়ায় তাহার আত্ম-প্রসাদের কিয়দংশ আমরাও উপভোগ করিয়াছি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

রুশীয় টেলিগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর

কয়েকদিন হইল, রুশীয়া হইতে অধ্যাপক পেট্রভ রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিই হউন, উহার কোন কোন অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের ও গ্রেট ব্রিটেন সমেত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অমঙ্গল হইবে, ঐ ব্যক্তির এই আশঙ্কায় তিনি (অর্থাৎ ঐ সর্বজন অভিভাবক) টেলিগ্রামটির কোন কোন অংশ বাদ দিয়া বাকী রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘরের মারফৎ প্রেরণ করেন। ছাঁট বাদে উহা এইরূপ :—

To

Rabindranath Tagore

Santiniketan, India

What is your explanation of gigantic growth of U. S. S. R. industry; its high tempo of development; setting up of extensive collectivized, mechanized agriculture; liquidation of illiteracy; tremendous increase in number of scientific institutions, universities, schools; and cultural upheaval of U. S. S. R. in general?

What problems will confront you in your work during next five years and what obstacles?

Please telegraph for Soviet press, Moscow Kultviaz :

Petrov V. O. K. S., Moscow

রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফে ইহার এই উত্তর দিয়াছেন :—

To Professor Petrov V. O. K. S., Moscow. Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.

Our obstacles are social and political inanity. bigotry and illiteracy.

Rabindranath Tagore.

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

হিজলীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ইংরেজী বহু দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি 'প্রবাসী'র জন্য তাঁহার বক্তব্য এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেন :—

হিজলী-কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দু-জন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র খৃষ্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্র: দরদের কারণ এই যে লেখকের মতে নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের পরে এত অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এই সব অত্যন্ত চড়া নাড়ীওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুন্ন আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে, এদের বাসা আরামের, আহার বিহার স্বাস্থ্যকর ; —এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্ট কালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করচে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন।

অধিকাংশ অপরাধেরই মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি এবং লোভ, ক্লেশ,

ক্রোধের এত দুর্দম উত্তেজনা যে তাতে সামাজিক দায়িত্ব ও কৃত কার্যের পরিণাম সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। অথচ এ রকম অপরাধ স্নায়ুপীড়া বা মানসিক বিকার থেকে উদ্ভূত হলেও আইন তার সমর্থন করে না।—করে না বলেই মানুষ আত্মসংযমের জোরে অপরাধের ঝোঁক সামলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু করুণার পীযূষকে যদি বিশেষ যত্নে কেবল সরকারী হত্যাকারীদের ভাগেই পৃথক করে জোগান দেওয়া হয় এবং যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশাস্তির আশা পোষণ করচে যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েও বিধিব্যবস্থাকে স্পর্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার করে দিল যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচার পদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েচে তাকে অপমানিত করা হবে, এবং সর্বসাধারণের মধ্যে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

পক্ষান্তরে একথা মুহূর্তের জন্যেও আশা করি নে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক যে সব গোঁড়ার দল যথারীতি প্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হবে তারা যেন ন্যায়দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়—এমনকি, যদিও বা চোখের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যে ও কাপুরুষ অত্যাচারীদের বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণে তাদের স্নায়ুপীড়ার চরমতা ঘটে থাকে। বিধর্ষিত আত্মীয়স্বজন ও নিজেদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যদি তারা কোন কঠোর দায়িত্ব কল্পনা করে নেয় তবে সেই সঙ্গে একথাও মনে স্থির রাখে যে, সেই দায়িত্বের পুরো মূল্য তাদের দিতেই হবে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা য়ুরোপীয় স্কুল মাস্টারদের যোগেই পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটিকে বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েচে এবং এও বলা বাহুল্য যে, সেই ইতিহাস রাজা প্রজা উভয়পক্ষের দ্বারা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুষ্ঠিত আইন বিগর্হিত বিভীষিকায় পরিকীর্ণ—অনতিকাল পূর্বে আয়র্লাণ্ডে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।

তথাপি বেআইনী অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সংগত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ একথাও ইতিহাস বিখ্যাত যে যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করে

ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

পরিশেষে আমি বিশেষ ভাবে গবর্নমেণ্টকে এবং সেই সংগে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডব নৃত্য এখনি শান্ত হোক। ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশকে বাধামুক্ত করে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারো পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এ রকম উভয়পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক—এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা বেড়েই চলবে, এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

পৌষ, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রীতি

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সকল মহাদেশ হইতে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি পাইতেছেন। সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁহার নিজের হৃদয়ের আত্মীয়তাবোধ নিতান্ত আধুনিক নহে। উহা তাঁহার অনেক পুরাতন কবিতাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। ১৩০৭ সালের ৩রা ফাল্গুন তিনি "প্রবাসী" শীর্ষক যে কবিতা রচনা করেন এবং যাহা এই মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়, তাহার গোড়াতেই আছে :

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই,
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া!

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া !

বিশ্বপ্রীতিব্যঞ্জক ইহা অপেক্ষাও আগেকার কবিতা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে থাকতে পারে।

পৌষ, ১৩৩৮

রবীন্দ্র জয়ন্তী

১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয়। তখন আমরা লিখিয়াছিলাম, "বর্তমান বৎসর বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া একান্ন বৎসরে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে বোলপুরে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সবান্ধবে তাঁহার জন্মোৎসব করেন, এবং তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এমন আদান প্রদান আমরা কখনও দেখি নাই।" এ বৎসর তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। এবারও তাঁহার জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এবং তাহার নানাদেশাগত ভক্তবৃন্দ আন্তরিক অনুরাগ ও বাহ্য শোভার সহিত সুসম্পন্ন করেন। তাহার কিছু বৃত্তান্ত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দিয়াছিলাম।

১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের যে জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার "জীবন স্মৃতি" গ্রন্থ বিভিন্ন অতিথিসমষ্টিকে আগাগোড়া পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। পরে উহা সেই বৎসরের ভাদ্র মাস হইতে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার তখনকার হাতের লেখা যে প্রায় এখনকার মতোই ছিল তাহা ঐ বহির পাণ্ডুলিপির প্রথম কয়েকটি পংক্তির প্রতিলিপি হইতে বুঝা যাইবে।

এবার যেমন রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতার টাউন হলে কবির সংবর্ধনার জন্য সভা হইবে ১৩১৮ সালের জন্মোৎসবেও সেইরূপ ঐ স্থানে সভা হইয়াছিল। তখন আমরা লিখিয়াছিলাম :

"স্যাল্টন নিবাসী ফ্লেচরের লেখায় এইরূপ একটি মত প্রকাশিত হইয়াছে, যে, কোন মানুষ যদি কোন জাতির সমুদয় কথা ও কাহিনী এবং গান রচনা

করিতে পান তাহা হইলে উহার আইনগুলি কে প্রণয়ন করে, তাহার খোঁজ লইবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। সোজা কথায় ইহার মানে এই দাঁড়ায় যে, লোকপ্রিয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ভবিষ্যৎ যেমন করিয়া গঠিত ও নির্ধারিত করিতে পারে আইনে তাহা পারে না। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় চরিত্রকে যে ভাবে গড়িয়াছে, কোন্ শাসনকর্ত্তা নিজের প্রভাব সেই প্রকারে তেমন স্থায়ী ভাবে বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? সুতরাং কবির সম্মান স্বাভাবিক, তাঁহার সম্বর্ধনা করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। অনেকস্থলে কবির জীবদ্দশায় সম্মান লাভ ঘটে নাই। কিন্তু বর্তমান কালে অনেক কবি জীবিত কালেই বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। নরওয়ে দেশের বিখ্যাত কবি ইবসেন যখন ১৮৯৮ খৃঃ সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করেন, তখন তাঁহার স্বদেশবাসীরা ত তাঁহাকে অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াইছিল; অধিকন্তু পৃথিবীর নানা দেশ হইতে তাঁহার নিকট উপহার এবং সাদর অভিনন্দন প্রেরিত হইয়াছিল।* 'মাছিমারা কেরানী'কে সকলে উপহাসই করিয়া থাকেন; সুতরাং আশা করি অন্ধ অনুকরণের বশবর্তী হইয়া নরওয়ের উদাহরণ হইতে কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না, যে সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইলে কোন কবিকে তাঁহার জীবিতকালে সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে"।

এখন আর এইরূপ কথা বলিবারও দরকার নাই, আমাদের সকলের সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গের কবির সত্তর বৎসর বয়সও পূর্ণ হইয়াছে।

১৩১৮ সালে ১৪ই মাঘ কলিকাতার টাউন হলে কবির যে সম্বর্ধনা হয় তাহার সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম:

"টাউন হলে এই উপলক্ষ্যে এরূপ জনতা হইয়া ছিল, যে, যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে

* On the occasion of his seventieth birthday (1898) Ibsen was the recipient of the highest orders from his own country and of congratulations and gifts from all parts of the world. A colossal bronze statue of him was erected outside the new National Theatre, Christiania, in September 1899." The Encyclopaedia Britannica, 11th edition.

আবালবৃদ্ধবণিতা—সর্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন, সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী যাঁহারা চিত্রে ও সংগীতে বাণীর বর লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিভিতে দেন নাই, যাঁহারা ব্যবহারজীবের কার্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলংকৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্প বাণিজ্যে বঙ্গে নবযুগের প্রবর্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্যে বঙ্গের অগ্রণী, তাঁহাদের স্বস্বশ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহু কৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গমাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতিভক্তিকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৃহকর্মে নারীর সহকারিতা ব্যতিরেকে আর্যের কোন ধর্মানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয় না। সমাজধর্মেও এই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে, ইহা অতি সুলক্ষণ। জাতীয় কবির সম্বর্ধনা ধর্মানুষ্ঠানেরই মত পবিত্র। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন বঙ্গের যুবকগণ, তাঁহাদের উৎসাহদীপ্ত মুখশ্রী হলের সর্বত্রই দৃষ্ট হইতে ছিল। শ্রেষ্ঠ কবিরা আমাদিগকে আশার বাণী শোনান, সেই স্বপ্নলোকের কথা বলেন যাহা ক্রমাগত মানুষের অন্তরে ও বাহিরে বাস্তবে পরিণত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বাস্তব হইয়া যাইতেছে না। সুতরাং আশা ও উৎসাহ যাহাদের প্রাণ, স্বপ্নলোকে বিচরণ যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ, সেই তরুণ বয়স্কেরা যে হাজারে হাজারে বঙ্গের কবিশিরোমণির সম্বর্ধনায় যোগ দিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।"

কুড়ি বৎসর আগেকার কবিসম্বর্ধনায় আমাদের বর্ণনার এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছিলাম, "তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য বাঙ্গালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না।" কুড়ি বৎসরে কবি আরোও কীর্তিমান এবং যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশ হইয়াছে, এখন তাঁহার যথাযোগ্য সম্বর্ধনা দুঃসাধ্য। বর্তমান পৌষ মাসের ৯ই হইতে ১৫ই পর্যন্ত তাঁহার যে সম্বর্ধনা হইবে, তাহাতে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা কি করিতে পারিবেন জানি না। প্রাকৃতিক শক্তি ও রাজশক্তির প্রভাবে দেশের দুরবস্থা হইয়াছে। সহস্রাধিক যুবক বন্দীদশায় কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদের মন দুঃখভারাক্রান্ত। অপরদিকে, বিশ বৎসর আগেকার চেয়ে

নারীসমাজে অধিকতর জাগৃতি দেখা দিয়াছে, এবং যুবকগণও কবির সম্বর্ধনায় উদ্যোগী হইয়াছেন। বাহিরের আয়োজনের ত্রুটি যাহাই থাকুক আমরা আবাল-বৃদ্ধবণিতা কবিকে অন্তরের অর্ঘ্য উপহার দিতে সমর্থ হইব আশা করিতেছি।

পৌষ, ১৩৩৮

কবির প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা

বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখাপড়া শিখিতেছিলেন, তখন প্রথমে বাংলা এবং পরে ইংরেজী রচনার অভ্যাসও অবশ্য করিয়াছিলেন। এ লেখাগুলি গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে। তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের অনেক বাংলা রচনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন কোনটির পুনর্মুদ্রণ ও স্বাধিস্ব তিনি চান না। তাঁহার ইংরেজী যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে সমস্তই প্রৌঢ় বয়সের। সেগুলির মধ্যে তিনি কোন্ কোন্টি সর্বাগ্রে লিখিয়াছিলেন, কোন্গুলিই বা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি তাহার প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা নহে। আমরা যতদূর জানি তাঁহার কবিতার স্বকৃত প্রথম ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ু প্রকাশিত পত্রিকায় হইয়াছিল। প্রথম যেগুলি ছাপা হইয়াছিল নীচে তাহার তালিকা দিতেছি।

The Far off ("সুদূর")—February 1912.

ইহার হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Sparks from the Anvil (কণিকা হইতে)—April 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Infinite Love ("অনন্ত প্রেম")—September 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Small—September 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Youth—September 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Inutile—November 1912.

Poems ("কণিকা" হইতে)—November 1918.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

এই শেষোক্ত কবিতাগুলি ১৯১২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত ছোট কবিতা গুলির সহিত একই সময়ে অনুবাদিত এবং একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজেই লিখিত।

১৯১১-র সালের শেষে কিংবা ১৯১২ গোড়ায় আমি কবিকে তাঁহার বাংলা কবিতা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ছাত্রাবস্থার পর হইতে যে ইংরেজী রচনার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে পরিহাসচ্ছলে তাহাই জানাইবার জন্য আমাকে লেখেন :—

"বিদায় দিয়েছি যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে ?"

কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। তিনি "কণিকা" হইতে কতকগুলি ছোট কবিতা অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভবনের দুতলার বৈঠকখানার একটি কামরায় আমাকে সেগুলি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে এই মর্মের কথা বলিলেন, "দেখুন তো মশায়, এগুলো চলে কি না—আপনি তো অনেকদিন ইস্কুলমাস্টারী করেচেন !" এইরূপ পরিহাস উপভোগ আমার মত অন্য কোন কোন ইস্কুলমাস্টারের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। এই অনুবাদগুলিই মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার আরও অনেক ইংরেজী কবিতা ও গদ্য রচনা মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে ছাপা হইয়াছে। সেগুলি ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরের রচনা বলিয়া তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না।

পৌষ, ১৩৩৮

নন্দলাল বসুর সম্বর্ধনা

কলাকুশল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে তাঁহার সম্বর্ধনা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা উপহার দিয়া তাহাকে প্রীতি জানাইয়াছেন তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইল, আমরা নন্দলাল বাবুর মানবিক সদ্‌গুণ, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার

হাতের নৈপুণ্য এবং শিক্ষকের কাজে তাঁহার অনুরাগ ও দক্ষতার জন্য তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

মাঘ, ১৩৩৭

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া ফ্রী প্রেসকে ইংরেজীতে যে মন্তব্য প্রেরণ করেন নীচে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

"গবর্নমেণ্ট ও মহাত্মাজীর মধ্যে পরস্পর বুঝাপড়ার কোন সুযোগ মহাত্মাজীকে না দিয়াই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে আমাদের শাসকদের মতে, ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার কাজে ব্যাপৃত দুই সহযোগীর মধ্যে অন্যতর সহযোগী ভারতবর্ষের জনগণ দৃপ্ত-অবজ্ঞা-ভরে উপেক্ষিত হইতে পারে। যাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং আমাদিগকে জগতের নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে ভারতের ভাগ্য যে দুই পক্ষের কার্য ও প্রভাবের উপর নির্ভর করে তাহাদের মধ্যে আমরা গরীয়ান—অপর যে পক্ষের ভারতবর্ষে বিদ্যমানতা চিরন্তন নহে আকস্মিক মাত্র, তাহাদের চেয়ে আমরা গরীয়ান। কিন্তু যদি আমরা মাথা খারাপ করি এবং অন্ধ আত্মঘাতী রাজনৈতিক উন্মাদ দ্বারা হঠাৎ আক্রান্তের মত আচরণ করি তাহা হইলে একটি মহৎ সুযোগ হারাইব। নৈরাশ্য হইতেই আমাদের পাওয়া উচিত শক্তিমত্তার গভীর স্থৈর্য এবং সেই নিষ্করুণ প্রতিজ্ঞা যাহা বালকোচিত ভাবোচ্ছ্বাস এবং আত্মব্যর্থতাজনক ধ্বংস-পরায়ণতা দ্বারা নিজের সম্বল অপচয় না করিয়া নীরবে নিজের সংকল্প সিদ্ধি সম্পন্ন করে। এই সেই মুহূর্ত যখন আমাদের স্বজনগণের বিরুদ্ধে আমাদের সমুদয় পুঞ্জীভূত পূর্ব সংস্কার ভুলিয়া যাওয়া উচিত; যখন, যাহারা রূঢ়তার সহিত আমাদের সাহচর্য আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাদিগেরও সংগে ভ্রাতৃপ্রেমের সহিত একযোগে কাজ করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য; যখন আমাদিগকে আমাদেরই নিজেদের নিকট হইতে আমাদের জাতির সকল অংশের সহিত সহযোগিতার প্রগাঢ় প্রেরণা দাবি অবশ্যই করিতে হইবে। ইহা সেই প্রকারের বিপত্তি যাহা কচিৎ কোন জাতির নিকট উপনীত হয়—উপনীত হয়

এরূপ সংঘাতের সহিত যাহা আমাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিপুঞ্জকে এককেন্দ্রাভিমুখ করে এবং আমাদের স্বাধীনতা গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় আমাদের সৃজনচেষ্টার প্রতিবন্ধকগুলি সংক্ষিপ্ত ও সংকুচিত করে।

"আইনকর্তাদের আদিমযুগোচিত উচ্ছৃঙ্খলতার, আমাদিগকে বলপূর্বক সেই প্রেমেই আমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা উচিত যে প্রেম এরূপ শক্তির সম্মুখেও আপনার পরাজয় মানে না যাহা সেই অবিচারিত সন্দেহের বেড়ার পশ্চাতে আত্মরক্ষার জন্য আপনাকে স্থাপন করে, যে সন্দেহ হইতে উৎপন্ন অন্ধ আতংক তাহার স্বরূপ নির্দেশে অসমর্থ। ইহাই সেই সময় যখন, সেই সব লোকেদের চেয়ে আমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব আমাদের কখনও ভুলা উচিত নয়, যে সব লোকের বাহ্যশক্তির পরিমাণ এত বেশী যে তাহা তাহাদিগকে মানবিকতা অগ্রাহ্য করাইতে পারে।"

যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহারা এই অনুবাদ অপেক্ষা মূল ইংরেজী অধিকতর সহজে বুঝিতে পারিবেন। নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন নামে পরিচিত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে সত্যাগ্রহীদিগকে কি করিতে হইবে কি করিতে হইবে না, তাহা মহাত্মাজীর পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সভার দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। যাহারা সত্যাগ্রহ করিবে না তাহাদের জন্য তাহাতে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বাহ্য কোন কোন কোন কার্য করণীয় বা অকর্তব্য, কি কার্যপ্রণালী অবলম্বনীয়, তৎসম্বন্ধে কোন নির্দেশ উপদেশ নাই। কিন্তু তাহাতে কেবল সত্যাগ্রহীদের নহে, সমগ্র জাতির অনুধাবন ও গ্রহণের যোগ্য গভীরতর বাণী আছে।

আমরা নীচে মূল ইংরেজীটিও দিতেছি।

"Mahatmaji has been arrested without having been given a chance of coming to mutual understanding with the Government. It only shows that of the two partners in the building of the history of the people of India can be superciliously ignored according to our rulers. However, the fact has to be accepted as a fact, and we must prove to the world that we are important, more important than the other factor which is merely an

accident. But if we lose our head and give vent to a sudden fit of politcal insanity, blindly suicidal, a great opportunity will be missed. The despair itself should give us the pro'ound calmness of strength, the grim determination which silently works its own fulfilment without wasting its resources in puerile emotionalism and self thwarting destructiveness. This is the moment when it should be easy for us to forget all our accumu lated prejudices against our kindreds, when we must do our best to combine our hands in brotherly love even with those who have roughly rejected our call of comradeship, when we must claim of us an intense urge of co-operation with all different parts of our nation. This is the kind of catastrophe which rarely comes to a people with a shock that brings to a focus our scattered forces and shortens the difficulties of our creative endeavour in the building of our freedom.

The primitive lawlessness of the law-makers should forcibly awaken us to our own ultimate salvation in a love which owns no defeat in the face of a power which barricades itself with an indiscriminate suspicion that its blind panic cannot define. This is the time when we must never forget our responsibility to prove ourselves morally superior to those who are physically powerful in a measure that can defy its own humanity."

মাঘ, ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চারিটি ছবির প্রতিলিপি প্রবাসীর এই সংখ্যায় দিলাম। ছবিগুলির কোন নাম কবি দেন নাই, দেওয়া যায়ও না। কারণ সেগুলির কোন বাস্তব মনুষ্য বা অপর জীব বা অপর জন্তুর প্রতিরূপ

নহে, সম্পূর্ণরূপে কবির মানসসৃষ্টি। এই সব ছবি অন্য কোন চিত্রকর বা চিত্রকর সম্প্রদায়ের ছবির মত নহে; কারণ কবি কোন চিত্রবিদ্যালয়ে বা বাড়ীতে কোন চিত্রকরের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই। লিখিবার সময় যে কাটকুট হয় সেইগুলিকে রেখাদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিবার অভ্যাস থাকায় তাহা করিতে করিতে এই সকল রেখার সংযোগে নানাবিধ ছক উৎপন্ন হইত। ইহাই তাহার চিত্রাঙ্কন অভ্যাসের উৎপত্তির ইতিহাস। তাঁহার ছবিগুলিকে তিনি তাঁহার রেখার ছন্দোবদ্ধ ('my versification in lines') বলিয়াছেন। তিনি কলম দিয়া আঁকেন, তুলি দিয়া নহে। কখন কখন কলমের বাঁটের দিকটাও ব্যবহার করেন, আঙুল দিয়াও রং দেন।

ছবির নাম দেওয়া সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীর সম্পাদককে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :—

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি; আমি কোন বিষয় ভেবে আঁকি না—দৈবক্রমে কোন অজ্ঞাত কুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব।—কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল—বিশেষত সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির, রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি, রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই, যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্য কতই আপিল বের করেন, অনামাদের জন্য করতে দোষ কি? দেখবেন যেখানে এক নামের বেশী আশা করেননি সেখানে বহু নামের দ্বারা ছবিগুলি নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপদৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, তারপরে নাম বৃষ্টি অপরের।"

কবির সমুদয় চিন্তা ও ভাব প্রকাশের জন্য তাঁহার প্রচুর শব্দসম্পদ ও যথেষ্ট লিপিনৈপুণ্য আছে। তাহা সত্ত্বেও যদি শব্দের দ্বারা ছাড়া তাঁহার অন্তরের কিছু জিনিষ রেখা ও রঙের সংযোগে উৎপন্ন রূপের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহা তাঁহা অপেক্ষা শব্দসম্পদে দরিদ্র কেহ কথার দ্বারা কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবে? শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিবার হইলে তিনি নিজেই তাহা করিতেন।

অন্য দু-একটা কথা বলি।

প্যারিসের চিত্রশাল, লুভ্রে লেওনার্দো ডা ভীঞ্চির আঁকা মোনালীজা নাম্নী মহিলার যে বিখ্যাত চিত্র আছে তাহা কিংবা তাহার প্রতিলিপি আমাদের দেশের অনেকে দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা যে নারীমূর্তিটির প্রতিলিপি এবার ছাপিয়াছি তাহার মুখের ভাব মোনালীজার রহস্যাচ্ছন্ন হাস্য আমার মনে পড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই নারীর মুখ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে বলা আরও কঠিন। ইহা কেবল হাসি নয়, কেবল কৌতুক নয় কেবল বিরাগ নয়, ব্যঙ্গ নয়।

দীর্ঘ বহুমূর্তিবিশিষ্ট ছবিটিতে কি ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উপর একই বংশীধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখান হইয়াছে? এই বাঁশী কে বাজাইতেছেন?

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথের পারস্য গমন

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে খ্রীষ্টীয়ধর্মাবলম্বী লোকদের নানা স্বাধীন দেশে গিয়াছিলেন এবং সর্বত্র আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ চীনের, জাপানের ও শ্যামের সম্বর্ধনা তিনি পাইয়াছিলেন। জাভা ধর্মবিশ্বাসে প্রধানতঃ মুসলমান হইলেও সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনা বিশিষ্ট রকম হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিদ্বীপে তিনি সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছিলেন। এবার তিনি পারস্য নৃপতির নিমন্ত্রণে পারস্য দেশে গিয়া সেখানে রাজা প্রজার সম্মিলিত বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। অন্য একটি মুসলমান দেশ ইরাকের নৃপতির নিমন্ত্রণে জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার ইরাক যাইবার কথা। পরে তুরস্ক যাইবারও কথা হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নানা দেশে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাঁহার মারফতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষের আদর্শ, ভাব, চিন্তা ও সভ্যতার যে সংস্পর্শ ও যোগ স্থাপিত হইতেছে তাহাকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

আষাঢ়, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রবধূ পারস্য ও ইরাক দেশ দেখিয়া নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সহিত আমরাও আনন্দিত হইয়াছি। ঐ দুই দেশ দেখিয়া তাঁহার মনে কি কি চিন্তা ও ভাবের উদয় হইয়াছে, কবির নিকট হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় গিয়াছিলেন। তাঁহারাও পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট হইতেও অনেক কথা জানা যাইবে।

কবি যে দুটি দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং উভয়ের রাজা দুইজনও মুসলমান। অথচ ঐ দুই দেশের রাজা ও প্রজারা তিনি মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়াছেন। তাহার কারণ দেশ দুটি স্বাধীন, এবং হিন্দুদের সহিত সেখানকার অধিবাসীদের ঐতিহাসিক কিংবা আধুনিক কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঈর্ষা নাই। দুটি মুসলমান দেশের রাজা ও প্রজার কবির প্রতি ব্যবহার হইতে মুসলমান ভারতীয়দের শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। হিন্দুরাও তাহা হইতে উপদেশ পাইতে পারেন।

প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় কবির একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। তাহার ভ্রমণ সম্পৃক্ত কয়েকখানি ছবিও আলাদা মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

আষাঢ়, ১৩৩৯

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী নানা বিভাগে বিভক্ত। ইহার শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ আদর্শের প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত। ইহার কলেজ বিভাগকে ছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী করার নিমিত্ত অনেক দিন হইতে ইহার প্রতিষ্ঠাতার আগ্রহ আছে। সম্প্রতি সেই দিকে তিনি বেশী মন দিতেছেন। অবশ্য ইহার সকল বিভাগে

ছাত্রও লওয়া হইবে। তবে বাহির হইতে কলেজ বিভাগের জন্য যত ছাত্র লওয়া হইবে, তাহারা বিশ্বভারতীর সভ্য কিংবা অন্য জানাশুনা লোকদের পরিচয় পত্র অনুসারে নির্বাচিত হইবে।

শান্তিনিকেতনের কলেজে ছাত্রীদের যত প্রকার শিক্ষার সুবিধা ও অন্য সুবিধা আছে, বাংলাদেশে অন্য কোথাও তাহা নাই। অতিরিক্ত কোন বেতন না দিয়া ছাত্রীরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় সমুদয় বিষয় ছাড়া সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, মূর্তিনির্মাণ, সাধারণ ও আলঙ্কারিক সূচিশিল্প, রন্ধনাদি নানাবিধ গৃহকর্ম, গ্রামসমূহের উন্নতি ও পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধীয় জনসেবার কাজ শুশ্রূষা প্রভৃতি শিখিতে পারে। মানসিক পরিশ্রম যাহারা করে তাহাদের খেলাধূলার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত। শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের জন্য প্রশস্ত স্যদানে তাহার সুবন্দোবস্ত আছে। ছাত্রদের খেলার জায়গা আলাদা। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণও আবশ্যক। শান্তিনিকেতন শহর হইতে দূরে, গ্রামও খুব নিকটে নহে ; এবং ইহা উচ্চ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। এইজন্য এখানে ছাত্রীরা প্রকৃতির শোভার মধ্যে মুক্ত বাতাসে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারে।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের মত নানা ভাষার ও নানা বিদ্যার মূল্যবান বহুসংখ্যক পুস্তকপূর্ণ গ্রন্থসংগ্রহ বাংলা দেশের অল্প কলেজেই আছে। এইজন্য ছাত্রছাত্রীদের নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জনের সুযোগ এখানে খুব আছে। বি. এ. পরীক্ষার পর নানা বিষয়ে মৌলিক গবেষণাও ে যুক্ত অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র ও ছাত্রীরা করিতে পারেন। বর্ণপরিচয় হইতে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একই জায়গায় একই প্রতিষ্ঠানে পাইবার বন্দোবস্ত বঙ্গে একমাত্র এখানে আছে।

আজকাল আর্থিক অসচ্ছলতা অনেকেরই হইয়াছে। সেইজন্য কর্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে, অসচ্ছল অবস্থার যে সব বালকবালিকা জ্ঞানানুরাগী ও বুদ্ধিমান, তাহাদের অন্ততঃ কয়েকজনের সাহায্যার্থ মাসিক সাত হইতে তিন টাকার কুড়িটি বৃত্তি এই বৎসর হইতে দিতে সংকল্প করিয়াছেন। বিদ্যালয় ২৩শে জুন খুলিবে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরূপে বা অন্যত্র থাকিয়াও যাঁহারা শান্তিনিকেতনের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার কাজ করিলে ইহার কাজ বরাবর ভাল রকম চলিতে পারে। এই বৎসর ইহার অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক

ধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম-এ, পি এইচ ডি (লণ্ডন) বিদ্যালয়ের কাজে বিশেষ ভাবে মন দিবেন। বিশ্বভারতীর ১৯৩১ সালের রিপোর্টে (পৃষ্ঠা ১৫) লিখিত হইয়াছে "Miss Asha Adhikari and her sister Miss Bhakti Adhikari also left in the middle of July last. Their services cannot be adequately acknowledged; they left a gap which has not been filled up."

শ্রীমতী আশা অধিকারী বারাণসী বিদ্যালয়ের মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি একবছরের ছুটি লইয়া শান্তিনিকেতনে অবৈতনিক কাজ করিয়াছিলেন। তাহাতে শান্তিনিকেতনের যে উপকার হইয়াছিল তাহা রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত কথাগুলি পড়িলে বোঝা যায়। এ বৎসর তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদটি ত্যাগ করায় শান্তিনিকেতনের লাভ হইল। তিনি নারী বিভাগের এবং বিদ্যালয়ের শিশু বিভাগের কাজ বিশেষ করিয়া করিবেন। বিশ্বভারতীর প্রধান ও অধ্যাপকগণের এবং নূতন যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের সম্মিলিত যত্নে ইহার কাজ উত্তমরূপে চলিতে থাকিবে।

গত ৩০শে নভেম্বর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬৭। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ইহার মধ্যে ৫৮ জন অবাঙালী, বেশির ভাগ গুজরাটি।

কলাভবন ও শ্রীনিকেতনের বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

আষাঢ়, ১৩৩৯

বিশ্বভারতীতে অর্থসাহায্য

বিশ্বভারতীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যাহা পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপনের সময় হইতে এ পর্যন্ত যাহা দিয়াছেন, তাহা বাদ দিলে এই বিদ্যাপীঠে বাঙালীরা অল্পই সাহায্য করিয়াছেন, অন্য লোকেরাই বেশি দিয়াছেন ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কোন মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের খুঁত ধরাও তাহার উপকার করিবার একটা উপায় বটে, কিন্তু খুঁত ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে যদি সমালোচকেরা খুঁতটা সারিবার সাহায্যও করেন, তাহা হইলে তাহাদের হিতৈষিতা প্রমাণিত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের

মধ্যে এইরূপ সহায়ক অপেক্ষা রবিবাবুর ও বিশ্বভারতীর কেবল খুঁত ও ত্রুটির আবিষ্কারকের সংখ্যাই বেশি। সেরূপ খুঁত ও ত্রুটি অবশ্যই আছে। কোথাও রবীন্দ্রনাথের সম্মান ও প্রশংসা হইলে, তিনি বাঙালী এবং আমরাও বাঙালী বলিয়া আমরা তাহাতে ভাগ বসাই, কিন্তু তাঁহার কাজে সহযোগিতা করি না।

শ্রাবণ, ১৩৩৯

স্বর্ণকুমারী দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম কন্যা, কবি রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বহু গ্রন্থের লেখিকা এবং নারীদের কল্যাণ বিধায়ক নানা কার্যের অনুষ্ঠাত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের ৭৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যবিষয়িনী প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ও গান, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক, প্রবন্ধ ও বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গে বোধ হয় তিনিই প্রথমে ভূতত্ত্ববিষয়ক, 'পৃথিবী' নামক, গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুস্তকাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা সম্মুখে নাই—হয়ত কোন কোন নাম বাদ পড়িবে। সম্ভবতঃ অধিকাংশের নাম নীচের তালিকায় পাওয়া য ব।

উপন্যাস—দীপনির্বাণ, স্নেহলতা, ছিন্নমুকুল, ফুলের মালা, হুগলীর ইমামবাড়ি, বিদ্রোহ, মেবার-রাজ, কাহাকে ?, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি। ছোটগল্পের বহি—নব কাহিনী, মালিনী ও অন্যান্য গল্প। নাটক—রাজকন্যা, দিব্যকমল, কনে বদল, পাকচক্র কৌতুক নাট্য, দেব-কৌতুক। কবিতা ও গানের বহি—কবিতা ও গান, বসন্ত উৎসব, গাথা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক পুস্তক—পৃথিবী। বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক—বর্ণবোধ, ব্যাকরণ, গল্পস্বল্প, বাল্যবিনোদ, কীর্তিকলাপ, সাহিত্যস্রোত।

তাহার 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে ?' উপন্যাস দুটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'ফুলের মালা'র অনুবাদ 'ফেটাল গার্লাণ্ড' নাম দিয়া প্রথমে মডার্ন রিভিয়ু কাগজে বাহির হয়। 'কাহাকে ?' উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদের নাম 'দি আনফিনিশ্‌ট সং।' মান্দ্রাজের গণেশ কোম্পানী তাঁহার

কয়েকটি ছোটগল্পের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'কল্যাণী' নাম দিয়া তাঁহার 'দিব্যকমল' নাটকের একটি জার্মান অনুবাদ প্রকশিত হইয়াছে।

তিনি ১৮৮৪ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত এবং পরে আবার ১৯০৬ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সহিত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বঙ্গে মহিলাদের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনের কাজ তিনিই প্রথমে করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে তাঁহাকেই ১৯২৬ সালে জগত্তারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ২৯ অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহার কার্য নির্বাহ করেন। এই কার্যও মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে করিয়াছেন।

অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে তিনি স্বীয়আচরণ দ্বারা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ও অন্য ব্রাহ্ম মহিলাদের এই চেষ্টার সুফল এখন বাঙালী সমাজ ভোগ করিতেছেন, বিদ্রূপ ও মিথ্যা নিন্দা তাঁহারা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। নারীদের কল্যাণার্থ তিনি ১৮৮৬ সালে 'সখি সমিতি' স্থাপন করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে বন্ধুভাবে মিলামিশায় উৎসাহ প্রদান, তাঁহাদের মনে দেশের কল্যাণচিন্তা ও হিতৈষণার উদ্রেক, দরিদ্র হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি নিকেতন স্থাপন করিয়া তাহাতে তাহাদিগকে শিক্ষাদান ও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল ও সমাজসেবা সমর্থ করা, তাহারা যোগ্যতা লাভ করিলে তাহাদের কাজ জুটাইয়া দেওয়া ও তাহাদিগকে অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া নারীশিক্ষার বিস্তার সাধন এবং ভারতীয় কলা ও পণ্যশিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা, এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির শুভপ্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় আগে আগে প্রতি বৎসর মহিলা শিল্প মেলার অনুষ্ঠান হইত। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহিলারা চালাইতেন, কেবল মহিলাদেরই ইহাতে প্রবেশের অধিকার ছিল। সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করা হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবী কিছুকাল বঙ্গীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মহিলা বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন। ১৮৯০ সালে ফিরোজশাহ মেহতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

তাঁহার শেষ গ্রন্থ 'সাহিত্যস্রোতে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত এবং কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক মনোনীত হইয়াছে। শেষ পীড়ার সময় তিনি উহার দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ভাদ্র, ১৩৩৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় উহা স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন। আর্টস ফ্যাকালটির ক্লাবেও অধ্যাপকগণ তাঁহার সম্বর্ধনা করিয়াছেন। উভয় সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে তিনি অনেক স্মরণীয় কথা বলিয়াছেন।

তিনি নিজে যে বাল্যকালে স্কুলের প্রতি বীতরাগ ছিলেন এই কথাটির আভাস বা উল্লেখ তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় থাকে। বক্ষ্যমান সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেও তাহা ছিল। তাহাতে স্কুলপলাতক নির্বোধ বালকদের মনে হইতে পারে কি না, যে, স্কুল বয়কট করা রবীন্দ্রনাথ হইবার একটা সোজা উপায় তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু স্কুলের সহিত বাল্যকালে তাঁহার আড়ি সম্বন্ধে কবি যাহা বলেন, তাহা হইতে যদি কেহ মনে করে যে, তিনি লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে কম পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে নিজের প্রতি অনিচ্ছাকৃত অবিচার করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই, যে, বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য তিনি বাল্যকালে সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পড়িয়াছিলেন, বাংলা স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষা করিবার জন্য যেরূপ যত্নসহকারে উহা পড়িয়া থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যেও তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে কম পড়েন নাই। ইংরাজী বহির অনুবাদ তিনি কৈশোরে যেমন করিতেন, তাঁহার মত পরিশ্রম করিয়া কয়জন ছাত্র সেরূপ করেন জানি না। বিদ্যার নানা শাখার এত বেশী সংখ্যক বহি তাঁহার মত যত্ন করিয়া বিখ্যাত অল্পসংখ্যক লোকেই পড়িয়াছেন। সুতরাং পড়াশুনা না করা, পরিশ্রম না করা, রবীন্দ্রনাথ হইবার একটা উপায় নহে। অবশ্য তাহা বলা কবির অভিপ্রায়ও নয়।

তিনি বলিয়াছেন, শুধু প্রবেশিকায় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সব রকম শিক্ষাতেও বাংলা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা আগে আগে যাহা বলিয়াছি তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

ভাদ্র, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপকতা

রবীন্দ্রনাথ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক দুই বৎসরের জন্যও হইয়াছেন তাহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু যিনি একদা স্যার উপাধি বর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার চাকুরীর মঞ্জুরী বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্টের নিকট লইতে হইবে, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে সম্মানকর নহে। তাঁহাকে যে বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই পারিশ্রমিকে রীডার নিযুক্ত করিলে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন চাহিতে হইত না। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলে বাংলা শব্দতত্ত্ব এবং বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধেও তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারেন। বহু বৎসর পূর্বে যখন অন্য কেহ বাংলার শব্দতত্ত্ব বিষয় আলোচনা করিতেন না, তিনি তখন তাহা করিয়াছিলেন। বাংলা এম, এ ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহাকে এই সব বিষয়ে কিছু বলিতে রাজী করিতে পারিলে লাভবান হইবে। শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা আছে। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে কীটস ও শেলীর কলেজপাঠ্য ইংরাজী কবিতা কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাহা আমরা নিজে শুনিয়া তাঁহার শিক্ষা নৈপুণ্যের বিষয় জানি। বাংলা এম, এ ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা যদি তাঁহার কাছে পড়িতে চায় এবং তিনি যদি তাহাদিগকে পড়ান, তাহা হইলে তাহারা উপকৃত হইবে।

তাঁহার দক্ষিণার কথাটা যে প্রকারে সেনেটের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল তাহা আমাদের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' দীনেশচন্দ্র সেনের বেতনের অর্ধেক পরিমাণ টাকা রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইবে বলিয়া তাঁহাকে নীচুদরের এবং দীনেশবাবুকে তাঁর চেয়ে উঁচুদরের মানুষ মনে করিবে এমন মূর্খ সম্ভবতঃ বাংলা দেশে নাই। তাহা হইলেও টাকা যখন দেওয়াই হইবে তখন পূরা টাকাই তাঁহাকে দিলে তাঁহার সম্মান রক্ষিত হইত।

কোন কাজ না করিয়া কিংবা রবীন্দ্রনাথ যাহা করিবেন তাহা অপেক্ষা কম কাজ ও নিকৃষ্ট কাজ করিয়া অন্য কোন কোন অধ্যাপক তাঁর চেয়ে বেশি টাকা পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃ দীনেশবাবুর জায়গায় নিযুক্ত হন নাই। কিন্তু দীনেশ বাবুর বেতনের বাকী অংশে আরও কিছু টাকা যোগ করিয়া যাঁহাকে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করা হইবে, তাঁহাকে দীনেশবাবুর চেয়ে নীচুদরের লোক কেহ মনে করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিবে না। এরূপ একটা অসম্মানকর অনুমান সত্ত্বেও আজকালকার আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে এই চাকরী লইবার লোকের অভাব হইবে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এখন হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাভাষায় অনেক পাঠ্যপুস্তক লেখাইবেন। এরূপ সময়ে ভাষাবিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ বিশেষ কাজে লাগিবে।

ভাদ্র, ১৩৩৯

বিশ্বভারতী সংবাদ

গত জুলাই মাস হইতে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে নানা সংবাদ দিবার জন্য ইংরেজীতে 'বিশ্বভারতী নিউস' নামক একটি মাসিক সংবাদপত্র শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমতে এক টাকা। এরূপ একটি পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। পূর্বে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় এইরূপ সংবাদ থাকিত। তাহা অনেক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী নিউসে ছোট ছোট প্রবন্ধও আছে। জুলাই সংখ্যায় ডাক্তার টিম্বার্সের লেখা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান পদ্ধতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি গ্রাম হিতৈষীদের কাজে লাগিবে।

একটি সংবাদে দেখিলাম, ময়ূরভঞ্জ রাজ্য আটজন শিক্ষার্থীকে শ্রীনিকেতনে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা সেখানে চারিমাস থাকিয়া সমবায় (Co operation) এবং গ্রাম পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করিবেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ইহা শ্রীনিকেতনের কৃতিত্বেরও পরিচায়ক।

ভাদ্র, ১৩৩৯

'রাণী বাগীশ্বরী অধ্যাপক' পদে নিয়োগ

এই পদে কাহাকে নিযুক্ত করা উচিত তদ্বিষয় পরামর্শ দিবার জন্য তিনজন বিশেষজ্ঞ নির্বাচিত হইয়াছিলেন—যথা ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিস্টার পার্সী ব্রাউন। তদ্ভিন্ন ইঁহারা উক্ত অধ্যাপক নির্বাচনের কমিটির সভ্যও ছিলেন।...

রবীন্দ্রনাথ অন্যতম বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং নির্বাচন কমিটির সভ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি আগে হইতেই মিং সাহেদ সুরবর্দীর নিয়োগের জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। বিচারকের পক্ষে আগে হইতেই, অন্য সব প্রার্থীদের নাম ও যোগ্যতা জানিবার পূর্বেই, এই প্রকারে একজন প্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই।

ভাদ্র, ১৩৩৯

নিত্যেন্দ্রনাথ

বিদেশে কাহারও মৃত্যু শোচনীয়। যদি তাহা অকালমৃত্যু হয় তাহা আরও বেদনাদায়ক। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান নিত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জার্মেনীতে শিক্ষালাভের জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে ক্ষয়রোগে তাঁহার দেহান্ত সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বালকটির জননী আমাদের সাতিশয় স্নেহের পাত্রী। তাহার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে, প্রার্থনা স্বতই উত্থিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সি, এফ, এণ্ড্রুজ মহোদয় নিত্যেন্দ্রনাথের চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া এবং জননীকে বিদেশে জেনোয়া হইতে পুত্রটির নিকট লইয়া গিয়া ও অন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

কার্তিক, ১৩৩৯

"৪ঠা আশ্বিন"

মহাত্মা গান্ধীর অনশন-ব্রত গ্রহণ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা '৪ঠা আশ্বিন" নাম দিয়া পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য তাহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করচে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি, পরমশোকে এই আমাদের মহৎ সান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেচে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে গভীরভাবে আপন করে নিয়েচেন সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

"দেশকে অস্ত্র শস্ত্র সৈন্য সামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেচে কত বিদেশী কতবার। মাটিতে রোপণ করেচে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

"অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটা-বেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে একদিন কালের আহবানে যে মুহূর্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায় তখনই ইঁট কাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্তির আবর্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মস্থানে বিরাজ করে।

"দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েচেন চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য

দিতে কুণ্ঠিত হলেন না সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

"আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমারা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেচেন যে, দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি এতে দোষ নেই! কিন্তু ভয় হয় মহাত্মাজী যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করচেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

"আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করবো, কেননা মহাত্মাজী উপবাস করতে বসেচেন, এই দুটোকে কোন অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারো মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিষ নয়। তাঁর উপবাস সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে, চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয় তবে তা যথোচিতভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

"আজ তিনি কি বলচেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি একদল মানুষ আরেক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে. অন্যদলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করে এসেচে কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয় প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখ পথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষখেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মনুষ্যোচিত সম্মান থেকে

যাদের আমরা বঞ্চিত করেচি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

"আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্য শাসনতন্ত্রকে অপমানিত করচে তাকে গুরুভারে দুরূহ করচে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেচি সমাজের বৃহৎ একদলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারচিনে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেচি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে। যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

"এতদিন এইভাবে চলছিল—ভালো করে বুঝিনি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠলো। পণ করলাম। চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে যাঁরা মুক্তি সাধনার তাপস তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেচি। যারা ছোট হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেচে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।

"এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারেনি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্বর্তীদেরকে অপমানের দুর্লংঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ীভাবে যখনি পিছিয়ে রাখা যায় তখনি পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনি অপমান বিষ দেশের এক অংগ থেকে সর্বঅংগে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। তার ভিতের গাঁথুনি আলগা, আঘাত পাবামাত্র ভেঙে ভেঙে পড়বে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে

সমাজরীতির দোহাই দিয়ে স্থায়ী করে তুলেচি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলি ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

"যেখানেই একদলের অসম্মানের উপর আর একদলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায় সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠচে ততই সমাজ টলমল করচে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই, সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

"সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য এই অসম্মানের দিকে মহাত্মাজী অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দেশ করেচেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবর্তিত হয়নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েচি, আর্থিক দুর্গতির দিক দৃষ্টি পড়েচে কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এলো। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেচে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয়, তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে, কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস করে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্য সাধনার অবমাননা যেন না করি।

"মহাত্মাজীর এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কীভাবে আঘাত করবে জানিনে আজ সেই পলিটিক্যাল তর্ক অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্ছি

মহাত্মাজীর এই চরম উপায় অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরাজ বুঝতে পারচেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজীর ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাতে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি—আয়ার্লণ্ড যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিকসে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়ার্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্তি তো কারো কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক অদ্ভুত বলে মনে হয়নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজীর অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্তমূর্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজীর মমতা নেই এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েচে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েচেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েচে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেচেন। এ কথা বুঝতে পারেন নি রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোন তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তাহলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দু সমাজের পরম সংকটের সময় মহাত্মাজীর দ্বারা সেই বহু প্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র। প্রটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ চলে এসেছিল সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেচে, সেজন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

"রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজী যে অহিংসানীতি এতকাল প্রচার করেচেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত একথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করিনে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

৪ঠা আশ্বিন ১৩৩৯

চৈত্র, ১৩৩৯

নোবেল প্রাইজ পাইবার আগে রবীন্দ্রনাথের আদর

কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক পাদরী এডওয়ার্ড টমসনের সঙ্গে আমার মধ্যে মধ্যে পত্রব্যবহার হইত। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে এদেশে তাহাকে লোকে বড় একটা পুঁছিত না, মিঃ টমসন তখন একবার এইরূপ মত প্রকাশ করায়, আমি তাঁহাকে জানাই যে, ঐ মত ভ্রান্ত। প্রমাণস্বরূপ আমি রবিবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করি। সেই উপলক্ষ্যে মডার্ণ রিভিয়ু মাসিকপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাও নকল করিয়া পাঠাই। তাহাতে মিঃ টমসন নিজের ভ্রম স্বীকার করেন। এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির উৎসব নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে হইয়াছিল।

সম্প্রতি 'কলিকাতা রিভিউ' মাসিক পত্রের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মিঃ কে, সি সেন একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

Dr. Tagore was not much thought of in his own country until the Nobel Prize was received by him. He personally complained of the shortcomings of his Indian neighbours when the latter hastened to honour him after the Swedish award.—The Calcutta Review for February 1933. p. 232,

তাৎপর্য। ডক্টর ট্যাগোর নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে তাঁহার নিজের দেশে তাঁহার (কাব্যাদিসমূহ) সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না। সুইডেনের ঐ পুরস্কার ঘোষণার পর যখন তাঁহার ভারতীয় প্রতিবেশীরা তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য ত্বরান্বিত হয়, তখন তিনি স্বয়ং তাহাদের ত্রুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

প্রথমে লেখকের নিজের মন্তব্যের প্রতিবাদ করি। রবীন্দ্রনাথ যখন ৫০ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন, তাহার কিছু পরে এবং নোবেল প্রাইজ পাইবার অনেক আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতার টাউন হলে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনেও তখন তাঁহার সম্বর্ধনা হয়। এই সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে বিচারপতি স্যার গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক পূর্বের এই স্বরচিত গানটি পাঠ করেন :—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর ।
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের ।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার ।
হের তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের শ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার ।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ওভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর ॥

কলিকাতা টাউন হলে কবির যে সম্বর্ধনা হয়, ১৩১৮ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী' হইতে তাহার বর্ণনার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি ।

[এই গ্রন্থের ২-৩ পৃষ্ঠার রবীন্দ্র সম্বর্ধনা অংশ অতঃপর উদ্ধৃত হয়েছে]

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে চৌরঙ্গীর ফটোগ্রাফার হপ সিং এণ্ড কোম্পানী 'জগৎকবি সভা'র একটি ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । সেই ছবির নীচে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত এই দুই পংক্তি কবিতা লিখিত ছিল :—

'জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব ;
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব ।'

এই চিত্রে শেক্‌স্‌পীয়র, টলস্টয়, গ্যেটে, ভিক্টর হিউগো, বার্ণস্‌, ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান ও মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল । এই চিত্রের প্রতিলিপি ১৩২০ সালের শ্রাবণের প্রবাসীর ৪৬৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল ।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীদের অবহেলা ও অনাদরের পাত্র ছিলেন না, পরন্তু তাহাদের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন । তাঁহার নিন্দুক তখনও ছিল, এখনও আছে । তিনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর নিন্দুকদের প্রকাশ্য নিন্দা কমিয়াছে, এই প্রভেদ ।

তিনি নোবেল প্রাইজ পাইবার পর যাঁহারা কলিকাতা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেণ

করিয়া শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে গিয়াছিলেন, কবি তাহাদের অভিনন্দনের উত্তরে কিছু স্পষ্ট কথা শুনাইয়াছিলেন বটে। আমরা এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটি ঘটিবার পর প্রকাশিত প্রবাসীর কোন সংখ্যায় উহার উল্লেখ করি নাই; সমালোচনা ত করিই নাই। এখন কলিকাতা রিভিউয়ের লেখকের কথার প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে উহার উল্লেখ করিতে হইল। কিন্তু সমালোচনা এখনও করিব না। তাঁহার ভুল হইয়াছিল, আমাদের ধারণা এইরূপ।

আষাঢ়, ১৩৪০

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনুরোধ

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ৭৩ জন ভারতবর্ষের অধিবাসী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিবকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই অনুরোধ আছে, যে, বিনা বিচারে যাঁহারা বন্দী আছেন তাঁহাদিগকে এবং ভায়োলেন্স বা বলপ্রয়োগের সহিত সম্পর্কশূন্য রাজনৈতিক "অপরাধে"র জন্য কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণকে মুক্তি দেওয়া হউক এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি ও শাসনপ্রণালী রচনার যে চেষ্টা হইতেছে, কংগ্রেসকে তাহার সহযোগিতা করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। কংগ্রেস ছয় সপ্তাহ কাল দাসত্ব লোকদিগকে আইন অমান্য করা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়া যে মনোভাবের আভাস দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা গবর্মেণ্টকে তাহারই সাড়া দিতে বলিয়াছেন।

এই টেলিগ্রাম প্রেরণের উপর সংবাদপত্রে টিপ্পনী নানাবিধ হইয়াছে এবং হওয়া স্বাভাবিক ও উচিত। সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্মতিসূচক মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে কিছু লেখা অনাবশ্যক। বিরুদ্ধ সমালোচনার কিছু উল্লেখ এবং তৎ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইবে। আমি স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একজন বলিয়া কিছু সঙ্কোচের সহিত তাহা করিতেছি।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন না, ইহাতে হয়ত স্বাক্ষরকারীদের অনধিকরচর্চা মনে করিবেন, সুতরাং ইহা নিষ্ফল ও না-করাই উচিত ছিল। খুব সম্ভব, ফল এইরূপ হইবে—গবর্মেণ্ট স্বাক্ষর-

কারীদের কথায় কান দিবেন না। অযাচিত পরামর্শদানের ঐরূপ সম্মান মোটেই বিরল নহে। তবে, এখানে বিবেচ্য এই যে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা— খুব চরমপন্থী সম্পাদকেরাও—গবর্ণমেণ্টকে অযাচিত পরামর্শ নিজেদের কাগজে লিখিয়া দিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্টের কি করা উচিত কাগজে তাহা লেখার মানেই গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া ও অনুরোধ করা। সম্পাদকেরা কাগজে যাহা লিখিয়া ক্ষান্ত থাকেন, কংগ্রেস আইন-লঙ্ঘন-প্রচেষ্টা স্থগিত রাখায় ভারতীয় সম্পাদকেরা যাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া নিজের নিজের কাগজে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রাজপুরুষকে টেলিগ্রাফযোগে জানান নাই, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা সেইরূপ কিছু কথাই বিলাতে রাজপুরুষদিগকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—প্রভেদ এই মাত্র। আমাদের বোধ হয়, রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ উপরোধ করা ও পরামর্শ দেওয়ার বাস্তবিক বা সম্ভাবিত ব্যর্থতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী সম্পূর্ণ অজ্ঞ নহেন। আন্দামানে কতকগুলি বন্দীর প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে আলবার্ট হলে প্রথম যে সভা হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে কিছু অনুরোধ করা হয়। সেই সভায় আমি বলিয়াছিলাম "অরণ্যে রোদন" দুই প্রকার। বৃক্ষপূর্ণ জনমানবশূন্য অরণ্যে রোদন একবিধ অরণ্যেরোদন, এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিহীন লোকারণ্যে অন্যবিধ অরণ্যেরোদন; কারণ উভয়ই নিষ্ফল। গবর্ণমেণ্টকে আমাদের অনুরোধ অরণ্যেরোদন, কিন্তু স্বভাবের দোষে বা মনের কষ্টে বা কাহারও হিতার্থে ত. আমরা করিয়া থাকি।" বোধ করি, ভারতীয় সব সম্পাদকই কখন-না-কখন ইহা করিয়া থাকেন। সুতরাং তদ্রূপ কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বভাবে বিশেষ কোন অসাধারণত্ব আরোপ করা যায় না।

অনুরোধের ফল যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্টকে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় ঠিক, এবং স্বদেশের কল্যাণ কামনায় তাহা করা অনুচিত হয় নাই।

টেলিগ্রামটিকে লিবার‍্যাল ম্যানিফেস্টো (মতজ্ঞাপক পত্র) বা মুভ (চাল) বলা হইয়াছে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং আরও কোন কোন স্বাক্ষরকারী লিবার‍্যাল বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের লোক নহেন।

আর একটি মন্তব্য এই, যে, গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার ঘোষণায় সাড়া দিতে যেরূপ অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন এবং অন্যান্য

প্রকারেও জনমতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে গবর্মেণ্টকে আবার কোন অনুরোধ উপরোধ করা অপমানকর। এইরূপ মনোভাব অসংগত বা অস্বাভাবিক নহে। পরাধীনতা সাতিশয় অপমানকর। এই অপমানকর অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য কেহ অস্ত্র ধারণ করে, কেহ বা নিরুপদ্রব অহিংস প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বন করে। এরূপ কোন উপায়ই যাহারা, যে কোন কারণেই হউক, অবলম্বন করে নাই অথচ যাহারা পদলেহন করিতেও রাজী নয়, তাহাদের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়া দেওয়াটা অনুচিত মনে করি না। কারণ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের এবং ভারতীয় লোকদের উভয়েরই কল্যাণের সম্ভাবনা। দুর্নীতির কাজ, নীচাশয়তার কাজ করা সর্বদা অনুচিত। কিন্তু অপমানকর পরাধীন অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সশস্ত্র বা নিরস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া কোন অপমানহীন পন্থাই নাই, মনে করি না। অবশ্য ইহা ইতিহাস সমর্থিত সত্য, যে, পরাধীন জাতিদের স্বাবলম্বী হইয়া কেবলমাত্র নিজেদের শক্তির দ্বারা স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানকর ও স্ফূর্তিজনক কোন পন্থা নাই। কিন্তু যদি কোন কারণে তাহা ব্যর্থ হয় বা সেইরূপ পথ অবলম্বন করা না চলে, তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট ভাবে পরাধীনতা মানিয়া লওয়া, অভিমান করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা, কিংবা আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কর্তব্যও থাকিতে পারে। (২৬শে জ্যৈষ্ঠ)।

এরূপও লিখিত হইয়াছে, যে গবর্ণমেণ্ট বরাবর তাহাদের দমননীতি ও তদ্বিধ অন্যান্য নীতি এবং কার্যপ্রণালী অভ্রান্ত, এবং তাহা ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ভারতীয়দের সমর্থন পাইতেছে বলিয়া দাবি করেন, এবং ইহাও দাবী করেন, যে, অধিকাংশ ভারতীয় কংগ্রেসের উপর বিরক্ত এবং কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংগ্রামে গবর্ণমেণ্টের পোষকতা করে; কিন্তু স্বাক্ষরকারীরা প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিবকে যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন, তাহাতে এই সরকারী দাবির সত্যতা কার্য্যত অস্বীকৃত হইয়াছে, এবং ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, যে প্রভাবশালী ও জ্ঞানা লোকপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তির মত গবর্ণমেণ্টের সমর্থক নহে। আমরাও মনে করি, টেলিগ্রামটি হইতে পরোক্ষভাবে এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসংগত।

কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রামের উল্লিখিতরূপ প্রশংসার সংগে সংগে ইহাও বলা হইয়াছে, যে আবেদন-নিবেদন-অনুরোধে গবর্মেণ্টের কার্যপ্রণালীর

সংশোধন ও ব্যবহারের উন্নতি হইবে না ; তার চেয়ে বেশী ফলপ্রদ কিছু চাই— তাহা স্বশাসক ব্রিটিশ ডোমীনিয়নগুলি বহু পূর্বে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে ; অবস্থার উন্নতির জন্য জনগণ এখন আর কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষা করে না, তাহারা মুখপাত্রদের উপর নির্ভর করে, না, তাহারা তাহাদের নেতৃবর্গ ও বিশ্বাসভাজন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে 'কাজ' চায়, কথা নহে।

কথাগুলিতে শৌর্যের ভঙ্গী আছে, এবং এই ইঙ্গিতও আছে, যে, স্বাক্ষরকারীরা নেতা নহেন ও জনগণের বিশ্বাসভাজন মুখপাত্র নহেন। আমাদের মন্তব্য এই, যে, কথাগুলির মধ্যে যতটুকু সত্য আছে, তাহা সম্ভবত স্বাক্ষর কারীরা অনবগত নহেন ; মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে বড় নেতা কেহ নাই এবং তার চেয়ে অধিকতর লোকের বিশ্বাসভাজন মুখপাত্রও অন্য কেহ নাই ; এবং মহাত্মাজীর উপবাস আরম্ভের সময় তাঁহার মতজ্ঞাপক পত্রের মধ্যে নিহিত ও ছয় সপ্তাহের জন্য আইন-লঙ্ঘন আন্দোলন স্থগিত রাখার মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতের এবং স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রামের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। মহাত্মাজীর ইঙ্গিতটিকে যদি 'কাজ' বলা চলে, তাহা হইলে স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রামটিকেও কাজ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি ইঙ্গিতটি কেবল শব্দসমষ্টি, তাহা হইলে টেলিগ্রামটিও শব্দসমষ্টি মাত্র।

একটি প্রভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মহাত্মাজীর ইঙ্গিতের মর্যাদা গবর্ণমেণ্ট রক্ষা না করিলে তিনি ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর অনুচরেরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবন পণ করিয়া অহিংস্র রকমের কিছু করিতে পারেন—ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বাক্ষরকারীদের টেলিগ্রাফিক অনুরোধ রক্ষিত না হইলে তাঁহারা কেহ সেরূপ কিছু করিবেন কি-না, তাহা অনিশ্চিত।

শ্রাবণ, ১৩৪০

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের উৎপত্তি

আমরা সবাই জানি, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাম দিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তাহাতে তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতি ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে অধুনালুপ্ত 'ক্যাথলিক হেরাল্ড

অব্ ইণ্ডিয়া' নামক রোমান ক্যাথলিকদের কাগজে লিখিত হয়, যে, উহা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্থাপন করেন। ঐরূপ কথা সম্প্রতি আবার "রিন্যাসেণ্ট ইণ্ডিয়া" (Renascent India) "নবজাত ভারত" নামক একখানি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। উহার রোম্যান ক্যাথলিক গ্রন্থকার ডক্টর জ্যাকারিয়াস লিখিয়াছেন—

"They [Brahmabandhav Upadhyaya and Animananda] started in Calcutta a school for high-caste Hindus,···and after a few months were joinend there by a third companion, Rabindranath Tagore, son of the famous Maharshi Debendra nath Tagore, and of the same age as Upadhyaya. Rabindra nath prevailed upon them to transfer their school to a country seat of his father, near Bolpur; and thus began Santiniketan ··"

শান্তিনিকেতনের উৎপত্তির এই বৃত্তান্ত ঠিক নয় জানিতাম। তথাপি এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ দুর্বল থাকায় তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে এই কথা জানাইতে বলিলেন, যে, শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহিত তাঁহার কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয়। উপাধ্যায় কিছুদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে নানা পত্রিকায় অতি নিপুণ বিচক্ষণ সমালোচনা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের সহিত যখন উপাধ্যায়ের কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি কবির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি এবং তাঁহার এক বন্ধু (অণিমানন্দ) কবির আশ্রমে যোগ দিতে ইচ্ছুক, যেহেতু আশ্রমের কাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা আছে এবং দুই জনেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদর্শ এবং কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের দুই জনকে বিশেষ আনন্দের সহিত আহ্বান করেন। অণিমানন্দকে তিনি জানিতেন না। যতদিন তাঁহারা শান্তিনিকেতনে ছিলেন কর্মব্যবস্থার দিক হইতে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য বিশেষ কুশলপ্রদ হইয়াছিল।"

ভাদ্র, ১৩৪০

নৃত্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

যাঁহারা সকল রকম নৃত্যের—বিশেষতঃ বালিকা ও নারীদের সকল রকম নৃত্যের—বিরোধী, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে সকল নাচের, এমন কি বাই-নাচেরও, সমর্থক মনে করেন। বলা বাহুল্য, তিনি বাস্তবিক তাহা নহেন। নৃত্য সম্বন্ধে তাঁহার মত উদয়শংকরকে তাঁহার নিম্নমুদ্রিত আশীর্বাদ হইতে বুঝা যাইবে।

"উদয়শংকর,

তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী করে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা করে রেখেছে—জয়মাল্য নয়—আশীর্বাদপূত বরণমাল্য। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো।

"আশ্রম থেকে তোমাকে বিদায় দেবার পূর্বে একটি কথা জানিয়ে রাখি। যে কোনো বিদ্যা প্রাণলোকের সৃষ্টি—যেমন নৃত্যবিদ্যা—তার সমৃদ্ধি এবং সংবৃদ্ধির সীমা নাই। আদর্শের কোনো একটি প্রান্তে থেমে তাকে ভারতীয় বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নামের দ্বারা চরম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা বিহিত নয়, কারণ সেই অন্তিমতায় মৃত্যু প্রমাণ করে। তুমি দেশবিদেশের নৃত্যরসিকদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পেয়েছ, কিন্তু আমি জানি তুমি মনে মনে অনুভব করেছ যে, তোমার সামনে সাধনার পথ এখনো দূরে প্রসারিত, এখনো তোমাকে নূতন প্রেরণা পেতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে নব নব কল্পমূর্তি। আমাদের দেশে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'কেই প্রতিভা বলে। তোমার প্রতিভা আছে, সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে, তোমার সৃষ্টি কোনো অতীত যুগের অনুবর্তনে বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারে জড়িত হয়ে থাকবে না। প্রতিভা কোনো সীমাবদ্ধ সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকে না, অসন্তোষই তার জয়যাত্রাপথের সারথি। সেই পথে যে-সব তোরণ আছে তা থামবার জন্যে নয়, পেরিয়ে যাবার জন্যে।

"একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উদ্বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা

আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতঃ পথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্বাহিত করে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ।

"নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ-কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণমাত্র নয়। মানব সমাজে নৃত্য সেইখানেই বেগবান, গতিশীল, সেই খানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য আছে। যে দেশে প্রাণের ঐশ্বর্য অপর্যাপ্ত, নৃত্যে সেখানে শৌর্যের বাণী পাওয়া যায়। শ্রাবণ মেঘে নৃত্যের রূপ তড়িৎ লতায়, তার নিত্য সহচর বজ্রাগ্নি। পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে, সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাস ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাইজীর নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে তার সরলতা থেকে উদ্ধার করো। সে মন ভোলাবার জনে, নয়, মন জাগাবার জন্যে। বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্যে ও সফলতায় সমুৎসুক করে তোলে। তোমার নৃত্যে ম্লানপ্রাণ দেশে সেই বসন্তের বাতাস জাগুক, তার সুপ্ত শক্তি উৎসাহের উদ্দাম ভাষায় সতেজে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক, এই আমি কামনা করি। ইতি।"

কবির এই আশীর্বচন গত ২৮শে আষাঢ় উদয়শংকরের শান্তিনিকেতন আশ্রম দর্শন ও তথায় নিজ নৃত্যপ্রদর্শন, উপলক্ষ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল। ইহা আশীর্বাদ বলিয়া ইহাতে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই সমালোচনা সুস্পষ্ট করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসংগে উদয়শংকরের দলের কোন কোন নৃত্য সম্বন্ধে কবির মত আমরা জানিয়াছি। উদশংকরের নৃত্য শিক্ষা রাজপুতানার কোন কোন রাজধানীতে হইয়াছিল। মুসলমান আমলের বিলাস ও ভোগলালসার উদ্দীপক পেশাদার নর্তকীদের নৃত্যই সেখানে চলিত আছে। বাইনাচকে ও বাইজীদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের নাচকে কবি নিন্দনীয়, অননুকরণীয়, এবং সুরুচি সম্পন্ন দ্রষ্টাদের পীড়াদায়ক মনে করেন বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি।

প্রশংসায় উদয়শংকর অহংকৃত হইয়া যান নাই। তিনি নম্র প্রকৃতির লোক। তাঁহার কৃতিত্ব সমজদার লোকদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও তিনি নিজে মনে করেন, যে, এখনও নৃত্যকলায় তাঁহার অনেক শিক্ষণীয় ও উদ্ভাবনীয়

আছে। তিনি কবিকে বলিয়াছেন, আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার শিক্ষালাভে যত্নবান হইবেন।

কবি মণিপুরের নৃত্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ফাল্গুন, ১৩৪০

মানুষের পাপ ও ভূমিকম্প

মহাত্মা গান্ধী ভূমিকম্পটা মানুষদের পাপের—যেমন অস্পৃশ্যতাবোধের—ফল বলেন। তাহাতে আমরা গত ১লা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলাম, যে, মানুষের পাপের সহিত ভূমিকম্পের সম্পর্ক আছে, এরূপ মত স্বীকার করা দুরূহ।...সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও মহাত্মার মতের বিপরীত।

বৈশাখ, ১৩৪১

সর্বজাতীয় মানবিকতা

সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। যাহাকে ইংরেজীতে ইণ্টারন্যাশন্যালিজম ও ইণ্টারন্যাশন্যাল কালচার বলে তিনি সেই বিশ্বমানবীয় সংস্কৃতি ও একপ্রাণতা বিষয়ে কিছু বলেন। তাঁহার বক্তৃতাটির ভাল বাংলা বা ইংরাজী রিপোর্ট বাহির হয় নাই। তবে শ্রোতারা আশা করি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, তিনি, এই বাংলা দেশেই যে এক শত বৎসর পূর্বে রামমোহন রায়ের দ্বারা বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অস্বাভাবিক মনে করেন নাই, বরং গৌরবের বিষয়ই মনে করিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

"ভারতী" ঝরণা কলমের কারখানা

...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কারখানা দেখিতে আসিয়া ফাউনটেনপেনের ঝরণা-কলম নাম দিয়াছেন।...

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ও সিংহল

চীন, জাপান, যবদ্বীপ শ্যামদেশ প্রভৃতির সহিত প্রাচীন কালে ভারতীয় সংস্কৃতির যে যোগ ছিল, আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই সব দেশে গিয়া তাহা নূতন করিয়া স্থাপন করেন। তাঁহার সিংহল যাত্রা দ্বারাও ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের প্রাচীন সংস্কৃতির যোগ পুনরুজ্জীবিত হইবে।

আষাঢ়, ১৩৪১

সিংহলে রবীন্দ্রনাথ

ধর্মে সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের সহিত সিংহলের যোগ বহু প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথের সিংহল ভ্রমণ সেই যোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল। এই কাজটি তাঁহার দ্বারা যে প্রকারে হওয়া সম্ভব অন্য কোন এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা হইতে পারে না। তিনি কোথাও ধর্মোপদেষ্টা হইয়া যান না, এবং বঙ্গেও ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না, কিন্তু তাঁহার বহু গানে ব্যাখ্যানে, কবিতায়, বক্তৃতায় এবং বাংলা ও ইংরেজী কোন কোন বহিতে ধর্মের গভীরতম বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। ধর্মতত্ত্বে ও দর্শনে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি মনীষীদের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি কর্মী না হইলেও তাঁহার চিন্তার প্রসার ও গভীরতা কম নহে। নাগরিক জীবন ও পল্লীজীবনের বিরোধভঞ্জন ও সামঞ্জস্যসাধন তাঁহার পরিকল্পিত পৌরজনপদ, সমাজ সংগঠন ব্যবস্থা দ্বারা হইতে পারে। অন্য দিকে অভিনয়ে সংগীতে নৃত্যে

চিত্রকলায় তাঁহার প্রতিভা দ্বারা সংস্কৃতির সৌন্দর্যসুষমা ও আনন্দের দিকটি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এই সকল নানাগুণের সমাবেশ একই ব্যক্তিতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ সিংহল বাসীদিগকে যেমন আনন্দ দিতে পারিয়াছেন ও তাঁহাদের মধ্যে যে নবজাগরণ আনিয়াছেন, তাহা পূর্বে তথায় সংসাধিত হয় নাই।

ভাদ্র, ১৩৪১

বিশ্বভারতীর বর্ষা উৎসব

খবরের কাগজে দেখিলাম, গত অনেক বৎসরের মত এই বৎসরও বিশ্বভারতীর বর্ষা-উৎসব হইয়াছিল। ২৭শে শ্রাবণ রবিবার এই উৎসব হয়। ইউনাইটেড প্রেস তাহার নিম্নমুদ্রিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

> আজ প্রাতে এখানে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। চারি দিকে আগ্রহান্বিত জনতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া খোলা মাঠের একধারে কবি উৎসবের পুরোধারূপে বসিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা গান গাহিতে গাহিতে, হাতে মাংগলিক দ্রব্যাদি লইয়া শোভন ভংগীতে উৎসবক্ষেত্রে আসিল। শেষে কবি তাঁহার স্বাভাবিক বাচন পটুতা সহকারে প্রকৃতির আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে কতকগুলি গাথা আবৃত্তি করিলেন। উৎসবের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। উৎসবান্তে এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল। ইহাতে সকলে প্রীত হইয়াছিলেন।
>
> বিশ্বভারতীর পল্লী সংস্কার বিভাগ শ্রীনিকেতনে বিকালবেলা হলকর্ষণ উৎসব সম্পন্ন হইল। যাহাতে প্রাণের পোষক প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়, উৎসবের ইহাই অর্থ। বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিতে হল সংযোগ করেন। এই উপলক্ষে কবি যে গানটি রচনা করেন, তাহাতে গ্রামের সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য একটি গভীর আবেদন ছিল। নিকটবর্তী গ্রামের সমবায় সমিতি সমূহের বহু কৃষক তাহাদের ভাল বলদ ও লাঙল প্রদর্শন করিবার জন্য আনিয়াছিল।
>
> অতঃপর বিশ্বভারতীর উদ্যোগে বিভিন্ন পল্লী সংস্কার-সমিতির সদস্য-

গণের একটি সভা হয়। সমবায় সমিতি সমূহের রেজিস্ট্রার খান বাহাদুর আরসাদ আলী সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায় এই সভায় বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যার পর শান্তিনিকেতনে কবির নূতন নাটক "শ্রাবণধারা" অভিনীত হয়। কবি নিজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃত্য ও সংগীত এবং আলোক ও বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গানের সহিত যোগ হইয়াছিল সুরের, আবার তাহার সংগে যুক্ত হইয়াছিল সংগীতার্থব্যঞ্জক নৃত্য। আকাশ হইতে তৃষাহরা ধারা নামিয়া আসুক— সংগীত ও নৃত্য একসুরে এই প্রার্থনা জানাইয়াছিল।

নানাস্থান হইতে বহু অতিথি উৎসব উপলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর নানা দেশের অনেক উৎসব আদিতে ঋতু উৎসব ছিল। আমাদের দেশের অনেক উৎসবও তাই। নানা দেশে এই সব উৎসবের অনেকগুলি এখনও অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থলে লোকে তাহার উৎপত্তির কারণ ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল নিয়মরক্ষা ও আমোদপ্রমোদের জন্য অনেক স্থলে ঐ উৎসবগুলি হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঋতুর বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও ভাব এবং তাহা হইতে লব্ধ আনন্দ ও অনুপ্রাণনা লোকে সে-সব স্থলে অনুভব করে না। বিশ্ব-ভারতীর বর্ষা উৎসব নূতন প্রবর্তিত, এবং একজন মনীষী ও কবির দ্বারা প্রবর্তিত। ইহা তাঁহার পৌরোহিত্য ও নেতৃত্বে তাঁহার রচিত গান ও নাটকাদি এবং তাঁহার উদ্ভাবিত নৃত্যের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্য ইহার কর্মী, দর্শক ও শ্রোতারা, রসানুভূতি ও আত্মিক যোগ্যতা থাকিলে, কবির উপলব্ধ সময়োচিত ভাব আনন্দ ও অনুপ্রাণনা লাভ করিয়া থাকেন।

কার্তিক, ১৩৪১

শান্তিনিকেতনে চৈনিক অধ্যাপকদ্বয়

ইউনাইটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন—

বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক তান ইউন সান এবং অধ্যাপক চেন ইউ-সেনকে চীনে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এক প্রীতিভোজে সম্বর্ধিত করেন। উক্ত অধ্যাপকগণ চীন-ভারতীয় সংস্কৃতি-সঙ্ঘ সম্পর্কে

শান্তিনিকেনে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁহাদিগের শুভযাত্রা কামনা করেন এবং চীন-ভারতীয় সংস্কৃতির ভ্রাতৃত্ববন্ধন বৃদ্ধিকল্পে তাঁহারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই চীন বন্ধুদ্বয় সত্য সত্যই প্রভু বুদ্ধের বাণীতে অনুপ্রাণিত। বুদ্ধ এক সময়ে তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে বাণী প্রচারের জন্যে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ইঁহারাও তাহাই করিতেছেন। বক্তা আশা করেন যে, তাঁহাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে। তিনি আরও আশা করেন যে, সেই সময় খুব দূরবর্তী নহে, যখন ইঁহাদের চেষ্টায় চীন ও ভারত জগতের শান্তি ও সুখের জন্য একযোগে কাজ করিবে।

অধ্যাপক চেন মিঃ ঠাকুর ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপকবৃন্দকে তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ দেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা যাহাতে কবি ও শাস্ত্রী মহাশয়ের আশীর্বাদের যোগ্য পাত্র হইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের কামনা। তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের সহযোগিতা ও সদিচ্ছা পাইলে তাঁহারা শান্তিনিকেতনে একটি চীন মন্দির নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন। সেখানে চীন ও ভারতীয় কৃতী ছাত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া উভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে একটা সংঘ স্থাপন করিবেন।

অধ্যাপক তানও অনুরূপ বক্তৃতা করেন। আপাততঃ বিদায় সম্ভাষণান্তে সকলে প্রস্থান করেন।

অধ্যাপক, কলিকাতা হইতে ২রা অক্টোবর চীনে রওনা হইবেন।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

মাদ্রাজে ও বিশাখপত্তনে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

মাদ্রাজবাসীদিগের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ গিয়াছিলেন, সঙ্গে বিশ্বভারতীর কতকগুলি ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীরা ছিলেন। সেখানে নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে বিপুল জনতা রেলওয়ে স্টেশনে তাঁহার সম্বর্ধনা করে। পরে পৌরজনের প্রতিনিধিরূপে মেয়র মিঃ ডব্লিউ লাডেন তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। ছাত্রসমাজ ও অন্য কোন কোন সমিতি কর্তৃক ও তিনি সম্বর্ধিত হন।

কয়েকটি বিষয়ে বক্তৃতা ছাড়া মাদ্রাজে বিশ্বভারতীর শিল্প প্রদর্শনীও হয়, এবং "শাপমোচন" নামক নৃত্যগীতবহুল নাটিকার অভিনয় হয়। বিজয়নগরের মহারাণীর আমন্ত্রণে তিনি বিশাখপত্তন গমন করেন। সেখানেও শাপমোচনের অভিনয় এবং কোন কোন বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা

এ স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে, গান্ধীজী এখন যে কাজ করিতে যাইতেছেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বৎসর ধরিয়া বিশ্বভারতীর একটি শাখার দ্বারা সেই কাজ করাইতেছেন, এবং তাহার আগেও এইরূপ গ্রামোন্নতির কাজ তাঁহাদের বাড়ীর জমিদারীর কোন কোন অঞ্চলে করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই, যে, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতীয় কোন পরিকল্পনা ও সমিতি রচনা করেন নাই, প্রথমে কেবলমাত্র একটি জেলার একটি অংশে কার্যতঃ কিছু করা সমীচীন ও শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন—যদিও তাঁহার এই কাজের কেন্দ্র সুরুলে স্থিত শ্রীনিকেতন হইতে বঙ্গের বাহিরের কোন কোন অবাঙ্গালী ছাত্রও তাঁহার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার এই কাজটিতে স্বদেশবাসীদের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য পান নাই। তাহার একটি কারণ বোধ হয় তাঁহার ধনশালিতার অপবাদ।

পৌষ, ১৩৪১

ফ্রান্সের রবীন্দ্রবান্ধব সমিতি

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মিলন-স্থাপনের নিমিত্ত ফ্রান্সে রবীন্দ্রবান্ধব সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।* এই সমিতি কি কি কাজ করিতেছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথকে জানাইবার জন্য ঐ সমিতির দু-জন সভ্য সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁহারা বৎসরাধিক পূর্বে প্যারিস হইতে স্থলপথে রওনা হন এবং স্থলপথেই ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ অতিক্রম করিয়া বালুচীস্তানের অন্তর্গত

কোয়েটার পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তাঁহারা মানবজাতির কৃষ্টিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ আছে।

মাঘ, ১৩৪১

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ"

অদ্য প্রাতে 'গীতাঞ্জলি' খুলিতেই রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' শীর্ষক কবিতাটি চোখে পড়িল। কবিতাটি ভারতীয় মহাজাতির বর্তমান প্রধান কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ স্মারক বলিয়া সকলের পড়িবার জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান

•••　　•••　　•••

মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান ॥

(সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে)

এই কবিতাটি সাড়ে চব্বিশ বৎসর পূর্বে ১৩১৭ সালের ২০শে আষাঢ় রচিত হয়। এখন কতকগুলি লোক সচেতন হইয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইতে পারা যায়। এখন ঐ ১৩১৭ সালেরই পরদিন ২১শে আষাঢ়, রচিত কবির নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি আশ্বাস-বাণী বিবেচিত হইতে পারে।

ছাড়িস্ নে ধরে থাক্ এঁটে
　　ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে,
　　ওরে আর নেই ভয়।
ওই দেখ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
　　শুকতারা হয়েছে উদয়।
　　ওরে আর নেই ভয়।
এরা যে কেবল নিশাচর—

অবিশ্বাস আপনার পর,
হতাশ্বাস, আলস্য, সংশয়,
এরা প্রভাতের নয় ।
ছুটে আয়, আয়রে বাহিরে
চেয়ে দেখ্, দেখ্ ঊর্দ্ধশিরে,
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়,
ওরে আর নেই ভয় ।

মাঘ, ১৩৪১
"চার অধ্যায়"

কয়েক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে ছোট উপন্যাসটি পড়িয়াছিলেন, তাহা 'চার অধ্যায়' নাম-দিয়া সম্প্রতি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রধান নায়ক বিভীষিকাপন্থী অতীন্দ্র, যদিও সে দলের সর্দার নয়। দলের সর্দার ইন্দ্রনাথ একজন উপনায়ক। অন্য কয়েক জন উপনায়কেরও দেখা পাওয়া যায়। নায়িকা এলা। এলা দলে থাকিলেও তাহার কৃত কোন বিভীষিকাপন্থানুসারী-বৈপ্লবিক কাজের বর্ণনা বা উল্লেখ পুস্তকে নাই। অতীন্দ্রের নিজের মুখেই তাহার কোন কোন কাজের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যখন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গল্পটি পড়া শেষ করেন, তখন শ্রোতাদের মন এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একা আবার পড়িয়া মনের অবস্থা সেইরূপই হইল। একবার শুনিয়াছিলাম তথাপি কৌতূহল হ্রাস পায় নাই। যখন পড়া শেষ করিলাম, তখনকার মনের অবস্থা প্রকাশ করিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের চুয়াত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া পঁচাত্তরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে ঐ দিন শান্তিনিকেতনাশ্রিত

ব্রহ্মচর্য আশ্রমে তাঁহার জন্মোৎসব হয়। আশ্রমবাসী অধ্যাপকবর্গ, পুরস্ত্রীগণ এবং আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণই প্রধানত উৎসব করেন। বাহির হইতেও কেহ কেহ গিয়াছিলেন। প্রত্যূষে ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে গান গাহিতে গাহিতে আশ্রম পরিক্রম করিয়া সকলকে জাগান। সকলে আসিয়া আলিপনা ও ফুল-পাতায় সজ্জিত আম্রকুঞ্জে সমবেত হন। কবির আসনের সম্মুখে শুভকর্মসূচক নানা দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছিল। শঙ্খধ্বনির দ্বারা তাঁহার আগমন সূচিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে উৎসব আরব্ধ হয়। উদ্বোধন সংগীতের পর পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করেন। কবিকে অতঃপর অর্ঘ্য দান করা হয়। অতঃপর কবি একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার দ্বারা সংশোধিত ইহার অনুলিপি পরে পাইলে আমরা প্রকাশ করিব। বাহ্য সম্মান অপেক্ষা আন্তরিক প্রীতি পাইতে তিনি অধিক অভিলাষী এই ভাবটি তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পায়।

উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর সভাস্থ অনেকে শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার জন্য নূতন নির্মিত মৃৎকুটির অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহার নাম তিনি রাখিয়াছেন 'শ্যামলী'।

এখন হইতে তিনি ঐ কুটিরে বাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উহা এরূপ মাটিতে নির্মিত যে বৃষ্টিপাতে তাহার বিশেষ বিকৃতি ও ক্ষতি হইবে না। এরূপ মাটির এরূপ গৃহ এখানে এই প্রথম নির্মিত হইয়াছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর নিজের পরিকল্পনা অনুসারে ইহা নির্মাণ করাইয়াছেন এবং কতকগুলি মৃন্ময় মূর্তি ও কারুকার্যে ইহার বাহির ও ভিতর অলংকৃত করিয়াছেন।

এই কুটিরের সম্মুখে ভূষিত প্রাঙ্গণে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কবি শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশে নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি পাঠ করেন :—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কল্যাণীয়েষু

ধরণী বিদায় বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু,
কহিল "একটু থামো, তোরে আমি দিতে চাই কিছু
আমার বক্ষের স্নেহ, রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে কদিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।"

হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল, ধ্যানে তব, মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যাম স্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি। তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্যে রচি আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখানি ভরি
রূপের যে প্রতিমারে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ্য ; ধরার সন্তান যারা আছে
ধরার মহিমা গান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখ আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা রবে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৪২ শান্তিনিকেতন

সন্ধ্যাকালে বিশ্বভারতীর কর্মীরা 'পরশুরাম' রচিত 'বিরিঞ্চি বাবা' অভিনয় করেন। পরে ভোজ হয়।

এই জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ইংরেজী বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক কৃপালনী ইহার সম্পাদক। কবির আধুনিকতম কবিতার পুস্তক 'শেষ সপ্তক'ও এই দিন প্রকাশিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

শ্যামলীর জন্মকথা

কবির জন্য শান্তিনিকেতনে যে মৃৎকুটির নির্মিত হইয়াছে, গৃহপ্রবেশের দিন তাহার মেজে ভিজা ছিল। এরূপ একটি কুটির যে চাই, তা বোধ হয় কবিও বেশিদিন আগে ভাবেন নাই। তাঁহার 'শেষ সপ্তক' পুস্তকের ছেচল্লিশটি

কবিতার মধ্যে ৪৪তম কবিতাটিতে এই 'শ্যামলী'র উদ্ভবের পূর্বাভাস পাইতেছি। কবি তাহাতে লিখিয়াছেন

আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তাঁর নাম দেব শ্যামলী।

(এর পর কবিতাটি আরও সতেরো পংক্তি উদ্ধৃত আছে)
কবিতাটিতে আরও একান্ন পংক্তি আছে।

জ্যৈষ্ঠ. ১৩৪২

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

গত ২৯শে বৈশাখ কলিকাতায় বংগীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হয়। শহরের অনেক মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার পর কবি মৌখিক কিছু বলেন। তাহার পর 'শেষ সপ্তক' হইতে একটি কবিতা পড়েন। তদনন্তর তাঁহারই কয়েকটি গান গীত হইবার পর সভা ভংগ হয়।

তিনি যে কবিতাটি পড়েন তাহা 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতা, শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে চিঠির আকারে লিখিত। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা

বাল্য কৈশোর যৌবন অতিক্রম করিয়া কবি তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের সম্বন্ধে বলিতেছেন,

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষতবক্ষে পড়ছে রক্তধারা ।

(পরে সমগ্র কবিতাটি মুদ্রিত আছে)

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২

"শেষ সপ্তক"

"শেষ সপ্তক" পুস্তকখানির অনেক কবিতাকে আত্মচরিত জাতীয় বলা যাইতে পারে। তাহাতে কবির জীবনের বাহ্যঘটনার বর্ণনা বা উল্লেখ নাই। তাঁহার অন্তরের জীবন লইয়া সেগুলি লিখিত।

অন্যরকম কবিতাও আছে। যেমন এই মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত 'অসমাপ্ত' শীর্ষক কবিতাটিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

শ্রাবণ, ১৩৪২

জার্মেনীতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

মান্দ্রাজের সাপ্তাহিক দি গার্ডিয়ানের (The Guardian এর) ২৭শে জুনের সংখ্যায় এই খবরটি বাহির হইয়াছে :—

"Tagore's books in the German language brought in more royalties than in any other, and these royalties were employed by the poet for his International university at Santiniketan. But his pacific philosophy is taboo to all good Nazis, and as a result his royalties have dwindled and Santiniketan is a sufferer thereby."

"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জার্মান ভাষায় অনুদিত বইগুলির বিক্রি হইতে তাঁহার অন্য ভাষায় অনূদিত বহিসকল অপেক্ষা মুনফা বেশি পাইতেন এবং তিনি তাহা বিশ্বভারতীর জন্য ব্যয় করিতেন। কিন্তু তাঁহার শান্তিপ্রবর্তক দার্শনিক মত সমুদয় খাঁটি নাৎসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু ; সেই জন্য জার্মেনীতে তাঁহার বহির কাটতি কমিয়া যাওয়ায় মুনফাও কমিয়াছে, সুতরাং শান্তিনিকেতন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

আমরা জানিতাম, জার্মেনীতে তাঁহার বহিগুলির অনুবাদ খুব বেশি বিক্রি হইত এবং তাহাতে তাঁহার বহু লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু জার্মান মুদ্রা মার্কের বিনিময়মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় ঐ প্রভূত মুনফা অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে; নতুবা আজ বিশ্বভারতীর কোনই আর্থিক অসচ্ছলতা থাকিত না। আমরা যাহা জানিতাম তাহা ঠিক কিনা স্থির করিবার নিমিত্ত কবিকে মান্দ্রাজের কাগজখানির উক্ত সংবাদটি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং এ-বিষয়ে ঠিক তথ্য কি জানিতে চাহিয়াছিলাম। উত্তরে কবি লিখিয়াছিলেন:—"জর্মনিতে আমার বই বিক্রি সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল। অবশেষে যখন হিসাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো যে তাকে [মুনফার প্রভূত সমষ্টিকে] টাকায় পরিণত করতে গেলে এক আঁজলাও ভরে না। সমস্ত আয় জর্মনিকেই দান করে এলুম। তার [মার্কের] মূল্য যদি হ্রাস না হোতো তাহলে বিশ্বভারতীর জন্য আজ আমাকে ভিক্ষার ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না। আজ আমার বই সেখানে কী পরিমাণে বিক্রি হয়, এবং তার গতি কোন্ পথে আমি কিছুই জানি নে। এইটুকু জানি আমার তহবিলে এসে পৌঁছয় না। সেজন্য দুঃখ করে ফল নেই, কেন না লাভের অংক বেশি হবার প্রত্যাশা করি নে,—বস্তুত য়ুরোপের হাটে আমার বই বিক্রির মুনফা তর্কের অতীত, খাতাটা দর্শন শ্রবণের অগোচরে। আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞ মহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুসি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন একজন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন যদি হোতো সাধারণের মধ্যেই শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাঁর যখন খুসি পরিতোষ প্রকাশের জন্য কবিকে পারিতোষিক পাঠাতেন তা হলে কপিরাইট আগলানোর মত বণিগ্‌বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করতো না। রুচিও আছে রৌপ্যও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তাঁরা দুটাকা পাঁচশিকার পরিমাণেই তাঁদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন—তার ফলে যাঁদের রুচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডটা তাঁদেরই নিষ্ঠুর ভাবে ভোগ করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্বরতা একথা মানতেই হবে।"

আমরা গত মহাযুদ্ধ শেষ হইবার অনেক পরে যখন ১৯২৬ সালে জার্মেনী গিয়াছিলাম তখনও সেখানে রবীন্দ্রনাথের বহির খুব বিক্রি দেখিয়াছিলাম। কয়েক জায়গায় এক হোটেলে তাঁহার সঙ্গে ছিলাম; দেখিতাম, সকাল বিকাল তাঁহার টেবিলে তাঁহার বহিগুলির জর্মান অনুবাদ হোটেলের চাকরচাকরাণীরা পর্যন্ত কিনিয়া স্তূপাকারে রাখিয়া গিয়াছে, সেগুলিতে তাঁহার নাম স্বাক্ষরের অনুগ্রহের জন্য। তাহা দেখিয়া পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম, "আপনি এক একটা দস্তখতের কিছু একটা মূল্য ধার্য করলে কিছু অর্থাগম হত," কিন্তু তিনি এই বণিগ্‌বৃত্তির ইঙ্গিত গ্রহণ করেন নাই।

ভাদ্র, ১৩৪২

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব

গত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার জন্য যে নূতন দুটি গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা অন্য পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

"প্রাচ্য আলোকমালা" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার ইউরোপের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি Eastern Lights ("প্রাচ্য আলোকমালা") নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইহা প্রেরণ করায় কবি উত্তরে লিখিয়াছেন :—

"তোমার Eastern lights বইখানি যখন আমার হাতে এল তখন বিশেষ-ভাবেই পীড়িত ছিলাম। যে বিষয়ে আমি অনভ্যস্ত ও অশিক্ষিত তাতে মন দেবার শক্তি তখন একেবারেই ছিল না—এখনো যে সম্পূর্ণ আছে তা বলতে পারি নে। তোমার বইয়ের আরম্ভভাগের কিছু অংশমাত্র পড়েছিলুম। সীমাকে একান্তই সীমা বলে জানা সংসারের কাজ চালাবার উপযোগী একটা মায়া বলেই আমি মনে করি। সেই সীমাকে যখন আনন্দরূপ বলে উপলব্ধি করি

তখনি সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে প্রেমের দৃষ্টিতে তার অসীমত্ব ধরা পড়ে। তোমার 'Beautiful' সংজ্ঞক অধ্যায়ে এই নিয়ে আলোচনা করেছ। "আর্ট" সম্বন্ধীয় আমার কোনো কোনো প্রবন্ধে আমি লিখেছি, যাকেই আমরা সত্য বলে উপলব্ধি করি (অর্থাৎ কেবল জানি মাত্র নয়) তাই আমাদের আনন্দ দেয়। সেই উপলব্ধির দ্বারা তার আর আমার মাঝখানকার ভেদসীমা দূর হয়ে যায়। আমার সেই পত্রে এই কথাটা আমি বলতে চেয়েছিলুম, আমার মতে সত্য উপলব্ধির অভাবই সীমা। ইতিমধ্যে তোমার বইয়ে Cosmic Man থেকে সুরু করে বাকি অংশটুকু পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুকাল থেকে আমার কোনো কোনো রচনায় আমার মত ব্যক্ত করতে চেয়েছি—হয়তো স্পষ্ট বলতে পারি নি, কেন না, তত্ত্বের ভাষায় বলার ক্ষমতা আমার নেই। তাই তোমার ঐ অধ্যায়ে মানবের মধ্যে দৈবী আবির্ভাবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা পড়ে আমি পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। অবশেষে তোমার গ্রন্থে রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ভারতের বর্তমান সাধকদের বাণীর যে বিশদ পর্যালোচনা করেছ, সে অত্যন্ত উপাদেয়। এতে তোমার যে নির্মল উদার দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি বিশ্বমানবের মহিমা তোমার যথার্থ প্রত্যক্ষগোচর।

"তত্ত্বকথা সম্পূর্ণ করে অনুধাবন ও বিস্তারিত করে পর্যালোচনা করা আমার ক্লান্ত শক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য। সংক্ষেপে তোমাকে জানালুম তোমার বইখানি থেকে উপকার প্রত্যাশা করি এবং সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

পৌষ, ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' অভিনয়

কলিকাতায় দুই দিন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' অভিনয় হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন। টিকিট কিনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় আমি টিকিট পাই নাই, সুতরাং আমার অভিনয় দেখাশুনা হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, অভিনয় সাজসজ্জা আলোকপাত ও নৃত্যগীত অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, সকলেই এইরূপ বলিয়াছেন। অতি উৎকৃষ্ট হইবারই কথা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যেরূপ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষা দিতেও তিনি তদ্রূপ অতিশয় দক্ষ।

(এইখানে রাজা নাটকের গল্পের সারাংশ আছে)

"এই নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।"

দর্শকদের মধ্যে যাঁহারা মননশীল ও ভাবুক, আশা করি অন্ততঃ তাঁহারা নাট্য-রূপকটির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন।

মাঘ, ১৩৪২

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের জয়ন্তী

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্যোগে গত মাসে কলিকাতায় তাঁহার জয়ন্তী হইয়া গিয়াছে।...

রবীন্দ্রনাথ নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি পাঠাইয়াছিলেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্বরেষু—

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হতে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্যরাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হতে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,

দিকসীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হতে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যসুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দাক্ষিণ পাণি

মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি ;
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর ॥

১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ॥

মাঘ, ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঢেঁকির চালের পক্ষপাতী

জানুয়ারী মাসের "বিশ্বভারতী নিউসে" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, চাল পালিশ করায় তাহার পুষ্টিকর আবরণ অংশ নষ্ট হয়, তাহার পর চাল সিদ্ধ করিয়া ফেন গালিয়া ফেলায় পুনর্বার আর কতক পুষ্টিকর অংশের অপচয় হয়। এই জন্য তিনি ঢেঁকিতে ভানা ও ছাঁটা চালের ব্যবহারের এবং এ প্রকারে ভাত রাঁধার পক্ষপাতী যাহাতে ফেন আলাদা হইয়া না-থাকে ও ফেলিয়া দিতে না হয়। চালের কলের পরিবর্তে পূর্ববৎ আমাদের ঢেঁকি চালান একান্ত আবশ্যক। ফেন আলাদা হইয়া থাকিবে না, এরূপ রান্না করাও সহজ।

ফাল্গুন ১৩৪২

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক জন্মোৎসব

এক শত বৎসর পূর্বে ফাল্গুন মাসে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ

করেন। সেই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া এই মাসে তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব আরম্ভ হইবে।......প্রবুদ্ধ ভারতের বিশেষ সংখ্যার গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত বন্দনাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

To the Paramhansa Ramkrishna Deva

Diverse courses of worship
from varied springs of fulfilment
have mingled in your meditation.
The manifold revelation of the joy of the
Infinite has given form to a shrine of unity
in your life
Where from far and near arrive salutations
to which I join mine own.

RABINDRANATH TAGORE

রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার উপরের ইংরাজী বাক্যগুলির মর্ম নিম্নমুদ্রিত বাংলা কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে।
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফাল্গুন, ১৩৪২

শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাই এই অনুষ্ঠানটির প্রধান জিনিষ। এই বক্তৃতাটিতে তিনি যাহা বলেন, তাহা তাঁহার আগেকার অনেক কথার পুনরাবৃত্তি বটে, কিন্তু তাঁহার অনুকরণাতীত

নিত্যনব অনবদ্য কথনভঙ্গী সেগুলিকে নূতনের বেশ দিয়াছে। আমরাও এইরূপ কোন কোন তত্ত্ব ও তথ্য অনেকবার বলিয়াছি, কিন্তু কবি তাঁহার কথাকে যে অলংকার সাজাইয়া মনোজ্ঞ করিতে পারিয়াছেন ও যে রসে আপ্লুত করিয়া উপভোগ্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাণ্ডারে নাই। গোড়াতেই তিনি বলেন :—

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সবচেয়ে পর হয়ে তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে নাড়ীর যোগ হয়নি; এর ব্যর্থতা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করেছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতি প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন, আদালত সকল প্রকার সরকারী কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধানবশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি এহ বাহ্য কিন্তু শিক্ষা ব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিষ না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মত সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমান জনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি, সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষার পরধর্ম।

আমাদের দেশে নিরক্ষর লোকদের অজ্ঞতা নিম্নতম শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষা—এই তিন স্তরের মধ্যে যে যোগাযোগ নাই, নীচের স্তরের লোকদের উপরে উঠিবার ব্যবস্থা নাই, তাহা কবি প্রকাশ করেন এই রূপে—

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তার চেয়ে আনাড়ী ব্যক্তির বাড়ি তৈরী করবার ভার নিয়েছিলেন। মালমসলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের, ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুৎ, কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবেই নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোন রাজ্যে থাকে যেখানে একতলার লোকের নিত্যবাস একতলাতেই, আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে ঊর্দ্ধপথযাত্রায় একতলার প্রয়োজন ছিল। এই ছিল তাঁর উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রীর প্ল্যানে ওঠেনি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে, তার ভার বহন করেছে কিন্তু সুযোগ গ্রহন করে নি, দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্বেকার লেখায় এ দেশের সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোন পাঠকের মনে কোনো যে উদ্বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর নিচে সম্বন্ধ স্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম, সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয়নি।

আমাদের আশঙ্কা এই যে, কবির যুক্তিগর্ভ তুলনার আমলাতান্ত্রিক উত্তর প্রস্তুত হইয়া আছে। আমলাতন্ত্র বলিবেন দোতালাটাতেই ত তোমার আপত্তি? সেটা ভাঙিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত হইয়া আছে; এবং চাই কি, একতলাটাও আরও ছোটখাট করা হইবে।

জীবিকা ও অন্নের অভাবে এবং শিক্ষা ও বিদ্যার অভাবে আমাদের দেশের যে শোচনীয় লজ্জাকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, শিক্ষাসপ্তাহের আয়োজনকর্তারা এবং দেশের লোকেরা আশা করি কবির নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজ টিকে থাকবার

স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্ত-ভাবে সজাগ থাকে। অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে পরে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্ন-সংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গভর্ণমেণ্ট যে রকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেছেন, সে রকম উদ্বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সঙ্কোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশী দেরী করে না। এর থেকে যে নির্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না। নিরুৎসাহ, অবসাদ অকর্মণ্যতা, রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত, তাহোলে দেখতে পেতুম এদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু, সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোন স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানাদিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিষেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই এক ইঞ্চিমাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূর প্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোন সভ্যসমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদ আলোক অন্ধকারের

বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে অন্য পিঠ সূর্য-বিমুখ। তেমনি করে সমাজের যে এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশী প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলেছে ; সেই উভয় বিরুদ্ধের পাশর্বতিতাই এদের দূরত্বকে আরো প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য সকল সভ্য দেশে শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা যে তথাকার সব মানুষের জন্য, কবি অতঃপর তাহাই বলিয়াছেন।

শিক্ষার ঐক্যযোগে চিত্তের ঐক্যরক্ষাকে সভ্যসমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য বলে জানে। ভারতের বাইরে নানাস্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি এসিয়ার নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সংগে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সংগে যে সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদান প্রদান বুদ্ধিবিচারের সংগে চালনা করতে না পারবে তারা কেবল হঠে যাবে, কোণঠেসা হয়ে থাকবে—এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোন ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ৎ মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, তার প্রথমভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষা বিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হোলো।

শিক্ষার ঐক্যসাধন যে মহাজাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনের মূলে, কবির বক্তৃতার সেকথা বাদ পড়ে নাই।

শিক্ষার ঐক্যসাধন ন্যাশনল ঐক্যসাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট করে বুঝতে আমাদের দেরী হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনিক অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা

প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলা দেশেই সবচেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষায় অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর, এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনই ছিল মজ্জাগত।

এখানে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে, মহামতি গোখ্‌লে সার্বজনিক অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগে প্রবলতম বাধা পাইয়াছিলেন গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে। গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছুক না থাকিলে বাংলাদেশের কোন কোন গণ্যমান্য লোকের বাধা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত। এবং হয়ত তাঁহারা বাধা দিতেনও না।

আমাদের দেশে বিদ্যা ও শিক্ষার প্রচারের আগেকার ব্যবস্থার সংগে বর্তমান অবস্থার যে তুলনা কবি করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

এদেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুংগ শৃংগ থেকে নির্ঝরিত হোত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কারখানা ঘর বানাতে হয়নি, দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা উপশিরা যোগে সমস্ত দেহে অংগ প্রত্যংগে প্রবাহিত হোতে থাকে, তেমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজ-দেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণ প্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে—নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা বা স্থূল কোনোটা বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবরভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণভরা রক্ত।

আমাদের সমাজের বনভূমিতে উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নীচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হোত, আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য, ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সংগে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ

পাণ্ডিতের সংগে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল,—সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয় উদ্বৃত্ত উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্সে গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সংগে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি—জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রীধারী পণ্ডিত এদেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্‌তলে; তাড়াতাড়ি যা তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ; মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ শিক্ষার নৌকাতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টোদিকে—নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই।

কবির নীচের কথাগুলি শিক্ষাসপ্তাহের আয়োজনকর্তা গবর্ণমেণ্ট ও তাহার আমলাদের লজ্জাবোধ কিঞ্চিৎ সচেতন করিবে কি?

আধুনিককালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট দশ জনের মাত্র অক্ষর পরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা করে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশজন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে আছে, কেম্ব্রিজে আছে, লণ্ডনে আছে, আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্বোক্তের সংগে এদের ভাবভংগী ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে করে বসি এরা পরস্পরের সবর্ণ,—যেন ওটীন-ক্রীম ও পাউডার মাখলেই মেমসাহেবের সংগে সত্যসত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ব বিদ্যালয় যেন তার ইমারতের দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্যাপ্ত। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ বলতে শুধু এটুকু বোঝায় না, তার সংগে সংগে সমস্ত শিক্ষিত ইংলণ্ডকেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে গেছে যে সে

কেবল বর্তমানের অসমাপ্তিবশত নয়; এখনো বয়স হয়নি বলে যে কান্দুঘাটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার হাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম নেই, তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতি বলে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এদেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট কাঠ চুন সুরকির প্যাটার্ণ দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দবোধ করেন।...আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামী করা অর্থাভাববশতঃ অসম্ভব বলে সংবাদ পাই, সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতটাকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরী বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

প্রাচীন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। কবি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক অথচ মস্ত করে চোখে পড়ে না। এদেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারৎ না আছে অতি জটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা প্রণালী। সেখানে বিদ্যা-দানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে, কেননা সত্যেই তার পরিচয়।

কেহ যেন মনে না করেন, কবি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি, সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয় কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত হোতে পারে কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্তিতা থাকে না।

স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশন্যাল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থ ব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজী য়ুনিভার্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটে ছুঁটে কুর্তি বানাচ্চি তা নয়, ইংরাজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষতবিক্ষত করে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদঘর্ম চেষ্টা করছি ; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারদিকে না পেঁছচ্ছে গভীরে।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদিকের কৃতিত্বের এই প্রশংসা করিয়াছেন—

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প, সেইজন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তাছাড়া একথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর কিছুই হোতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দু ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারি প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারতও হোলো, সিঁড়িও হোলো ; নিচে থেকে উপরে লোক যাতায়াত চলছে। হোতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবু চারিদিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে যিনি এমন মহৎ সংকল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আকবর হয়দরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান সাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দুভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষা সংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে, তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবী করবে কোন্ স্পর্ধায় ? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

রাজকোষে যথেষ্ট টাকা না থাকায় শিক্ষার জন্য যথেষ্ট টাকা দেওয়া চলে না, এই অছিলাটা সম্বন্ধে কবি বলেন—

এদেশে বহু রোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে সব অভাবে দেশ অন্তরে বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্চে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই, অথচ এদেশে শাসনব্যবস্থার ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এমন কি বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা পরিবেশনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস জোগানে টানাটানি চলেছে। তা হোক, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

দেশের খালবিল নদীনালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে মানুষকে লিখন পঠনক্ষম করিবার আয়োজন, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, এখনকার চেয়ে আগে প্রচুর ও ব্যাপক ছিল, তাহা আমরা বার বার তাথ্যিক সংখ্যা সহযোগে ও অনেক ইংরাজের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ করিয়াছি। কবিও বলিতেছেন—

রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্ততঃ ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশাই বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতা এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলা

ভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে ; এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃ ভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানিনে হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন এ কথাটা কাজের কথা নয়, এ কবি কল্পনা। তা হোক আমি বলবো, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

ফাল্গুন, ১৩৪২

নব শিক্ষাসংঘ

আগে এই মাসের বিবিধ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতাটি হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা তিনি নব শিক্ষাসংঘের উদ্যোগে বংগীয় শিক্ষা সপ্তাহে একদিন পড়িয়াছিলেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "শিক্ষার স্বাংগীকরণ।" বিশ্বভারতী ইহা একটি পুস্তিকার আকারে বাহির করিয়াছেন। মূল্য আট আনা। তাহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের "শিক্ষার স্বদেশী রূপ" শীর্ষক প্রবন্ধটিও আছে।···"শিক্ষাও ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান" শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধটি আমরা ছাপিয়াছি, তাহাও এই সংঘের অধিবেশনে পঠিত হয় কিন্তু ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয় নাই।—এই সংঘের "New Education Fellowship-এর সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, শান্তিনিকেতন।

বৈশাখ, ১৩৪৩

বাংলার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথকে জানা

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি বিহার, আগ্রা, দিল্লী ও পঞ্জাব প্রদেশগুলির যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন সর্বত্র অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। পাটনায় তাঁহাকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে তিনি এই মর্মের কথা বলিয়াছিলেন যে ভারতের যে-

সব স্থানের লোকেরা তাঁহাকে অনুবাদের সাহায্যে জানিয়া ভারতীয় বলিয়া সম্মান করিতেছেন, এমন সময় আসিতে পারে যখন সেই সব স্থানের অনেক লোক বাংলায় তাঁহার মূল গ্রন্থাবলী পড়িতে পারিবেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতে বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর কতকগুলির অনুবাদের সাহায্যে তাঁহাকে আংশিকভাবেও জানা যায় না আমাদের মত এরূপ নহে। কিন্তু কেবল অনুবাদের সাহায্যে যে তাঁহার প্রতিভা ভাব ও চিন্তা, এবং ব্যক্তিত্ব ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যায় না, তাহাতে আমাদের কখনও সন্দেহ ছিল না। অনুবাদের সাহায্যে কোন লেখককেই ভাল করিয়া জানা যায় না।—বিশেষতঃ কোন কবিকে। মূলের ধ্বনির মোহিনীশক্তি অনুবাদে প্রায়ই থাকে না; অনুবাদ খুব ভাল হইলেও অন্যান্য খুঁৎও থাকে। অনেক সময় অনুবাদে চিন্তা, ভাব, অর্থ প্রকাশ পায়, কিন্তু অলংকার বাদ পড়ে। তদ্ভিন্ন ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্রনাথের বিস্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা অনুবাদিত হয় নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট অনেক গদ্য লেখারও অনুবাদ হয় নাই।

আমরা অনেক সময় শান্তিনিকেতনে কাহারও কাহারও কাছে বলিয়াছি, যে, যেমন ভিন্ন দেশ হইতে ছাত্রেরা জার্মানীতে, ফ্রান্সে, ইটালীতে শিক্ষার জন্য গেলে সেই সেই দেশের ভাষা শিখে, শিখিতে বাধ্য হন, সেইরূপ বঙ্গের বাহির হইতে ভিন্নভাষাভাষী যাঁহারা শিক্ষার জন্য বিশ্ব-ভারতীতে আসেন, তাঁহাদের বাংলা শিক্ষা করা উচিত। নতুবা বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভের প্রধান যে উপকার ও আনন্দ, রবীন্দ্রনাথকে জানা, তাহা হইতে তাঁহারা বহুপরিমাণে বঞ্চিত হন। আমরা যখন এইরূপ কথা বলিতাম, তখন শান্তিনিকেতন কলেজের অবাঙালী ছাত্রদের বাংলা শিখিবার আয়োজন ছিল না। শুনিয়াছি পরে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমরা আমাদের ইংরেজী মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাস, গল্প প্রবন্ধ, কবিতা ও নাট্যের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা আমাদের কাগজটিকে মূল্যবান করিবার জন্য করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী মূলে পড়িবার আগ্রহও কতকগুলি অবাঙালীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

বৈশাখ, ১৩৪৩

বিশ্বভারতীতে ষাট হাজার টাকা দান

দিল্লীতে কোন বা কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি বিশ্বভারতীর ঋণশোধের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ষাটহাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে আপাততঃ আর অভিনয় দ্বারা অর্থসংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইবার প্রয়োজন হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তিনি বা তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় কবিকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইয়াছে, ইহাতে ভারতীয়দের—বিশেষতঃ বাঙালীদের, গৌরব নাই।

অতীতে ঋণ যে কারণেই থাকুক, ভবিষ্যতে আর যদি ঋণ না হয় তাহা হইলে তাহার জন্য বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকর্তারা প্রশংসাভাজন হইবেন।

বৈশাখ, ১৩৪৩

শিক্ষাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রস্তাব

বঙ্গের "শিক্ষাসপ্তাহে" রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পড়েন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির শেষে পরপৃষ্ঠায় একটি 'পুনশ্চ' আছে। তাহাতে "দ্বিতীয় প্রস্তাব" শীর্ষক একটি প্রস্তাব আছে। তাহার মাথায় লিখিত আছে, যে, তাহা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটি এই—

"...আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে

তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীতার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যা বিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তাছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রার কর্ণধার।"

এই প্রস্তাবটি বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের নিকট উপস্থাপিত হওয়ায় শিক্ষাবিভাগ এতদনুসারে কাজ করিবেন এ বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা শিক্ষাবিভাগের কাছে প্রেরণের এই সার্থকতা আছে, যে, উক্ত বিভাগ জানিতে পারিবেন বঙ্গে শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের চেয়ে প্রতিভাশালী যিনি, তিনিও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকারীদের মতই শিক্ষার বিস্তার চান, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের অছিলায় তাহার সঙ্কোচ সাধনে সায় দেন না।

রবীন্দ্রনাথ যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, ঐরূপ একটি প্রস্তাব অনেক বৎসর পূর্বে আমার মনেও দেখা দিয়াছিল। তাহা বাঙালী বালিকা ও মহিলাদের সম্পর্কে বলিয়া আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাঙালী পুরুষদের সম্বন্ধে ওরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম বলিযা মনে পড়িতেছে না—বোধ হয় করি নাই। কবি পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন আমি স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ঠিক তাহাই করিয়াছিলাম এবং তাঁহারই নেতৃত্ব চাহিয়াছিলাম। তাঁহার সম্মতি ও অনুমোদন পাইয়াছিলাম। তাহার পর কার্যতঃ . ান কিছু হইল না, সে বিষয়ে আমার পক্ষের কারণ আমি জানি, কবির পক্ষের কারণ আমি ইতিপূর্বে কখনও জানিবার চেষ্টা করি নাই ও জানিতাম না।

রাজসরকার কর্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হওয়ার যে সুবিধা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু রাজসরকার কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক বাঁধিয়া দেওয়ার বিপদ আছে। একটা বিপদ সাম্প্রদায়িকতা। কোন কোন মুসলমান সাহিত্য-দিগ্‌গজের মতে রবীন্দ্রনাথের লেখা পর্যন্ত "পৌত্তলিকতা" দোষে দুষ্ট। পাঠ্যপুস্তক রচনার ও নির্বাচনের কার্যতঃ অনুসৃত একটা সরকারী নিয়ম এই, যে, হিন্দুদের সাহিত্যপুস্তকে মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু লেখা থাকা চাই-ই; কিন্তু মুসলমানদের লেখা সাহিত্য পুস্তকে হিন্দুদের সম্বন্ধে

কিছু থাকা আবশ্যক নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রস্তাবটিতে "পাঠ্যপুস্তক বেঁধে" দিবার কথা লিখিবার সময় সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িকতা-বিভীষিকা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হয় নাই।

এলাহাবাদে যে মহিলা বিদ্যাপীঠ আছে, তাহার বেসরকারী কর্তৃপক্ষ হিন্দী ও বাংলা প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক স্বয়ং নির্ধারণ করেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহিলারা কোন কোন দেশী রাজ্যে এবং অন্যত্র শিক্ষয়িত্রীর কাজ পান।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

"পত্রপুট"

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জীবনের ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে, কলিকাতার কয়েক জায়গায় এবং অন্য অনেক স্থানে তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কৈশোর হইতে বঙ্গদেশকে ও পৃথিবীকে নানা উপহার দিয়া আসিতেছেন। গত ২৫শে বৈশাখের জন্মদিনে কাব্যানুরাগীরা তাঁহার নিকট হইতে একটি উপহার পাইয়াছেন। তাহা 'পত্রপুট'। এই গ্রন্থখানির ষোলটি কবিতা গদ্যে লিখিত, কেবল তাঁহার দৌহিত্রীর শুভপরিণয় উপলক্ষ্যে লিখিত আশীর্বাদটি পদ্যে লিখিত। এই ষোলটি কবিতার মধ্যে ১৪ সংখ্যক যেটি, তাহার রচনার দিন গত ১৯শে বৈশাখ। ষোলটির মধ্যে ইহাই সর্বশেষে লিখিত। গ্রন্থখানির পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

টোকিয়োতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

কয়েকবৎসর পূর্বে হাঙ্গেরী দেশের একটি মহিলা ও তাঁহার কন্যা শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মাতার নাম সাস্ ব্রানার, কন্যার নাম এলিজাবেথ ব্রানার। তাঁহাদের পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। মাতা ও কন্যা জুতা পরিতেন না, সর্বদা খালি পায়ে চলাফেরা করিতেন। তাঁহাদের আর এক বিশেষত্ব এই ছিল

যে, তাঁহারা কোন জিনিষ রাঁধিয়া খাইতেন না। কন্যাটি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার একটি ছবি আঁকিয়াছিলেন। অন্য অনেক ছবিও আঁকিয়াছিলেন। এই ছবি তাঁহারা কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে টোকিওতে দেখাইতেছেন।

তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের তৈলচিত্রটির এই ফটোগ্রাফ টোকিয়ো হইতে এয়ার মেলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তৈলচিত্রটির পার্শ্বে চিত্রশিল্পী শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্রানার দণ্ডায়মানা।

আষাঢ়, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ও "মোহাম্মদী"

মাসিক 'মোহাম্মদী'-তে (প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকদের চেষ্টায় পুষ্ট) বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালান হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাও রেহাই পায় নাই। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' তাঁহার কোন লেখার উপর আক্রমণের উত্তর দিয়া ঐ মাসিককে সম্মানিত করিয়াছেন, এইরূপ সম্মান পুনর্বার প্রদর্শন করিতে তিনি বাধ্য না হইলে আশ্বস্ত হইব। তিনি লিখিয়াছেন—

"জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "মোহাম্মদী" পত্রখানি আমার হাতে এল। বাংলা প্রবেশিকা পাঠ্যপুস্তক যে অপাঠ্য লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। আমার রচনাও তাঁর দৃষ্টান্ত জুগিয়েছে। নমুনাস্বরূপ সেই অংশটুকু নিয়েই আমি আলোচনা করব।"

অতঃপর তিনি বলিতেছেন—

"সাহিত্যের আসরে নেমে অবধি আমার বিরুদ্ধে অনেক অত্যদ্ভুত অভিযোগ আমাকে শুনতে হয়েছে। তৎসত্ত্বেও আজ যা শোনা গেল, এতটা প্রত্যাশা করি নি। সমস্তটা উদ্ধৃত করতে হোলো, পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাই।"

তদনন্তর পঙ্কোদ্ধার কার্য চলিয়াছে। যথা—

"পূজারিণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌত্তলিকতার একেবারে চূড়ান্ত। 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নেই ভবে পূজা করিবার,—বিশ্বের দরবারে বিশ্বকবির উপযুক্ত message-ই বটে। আলোকের দুয়ারে এ যেন অন্ধকারের আহ্বান। ইহাও কি এই যুগে চলিবে?

"গান্ধারীর আবেদন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কুরুপাণ্ডবের কাহিনী। নারীত্বের প্রতি লাঞ্ছনা এবং ন্যায়ের প্রতিই অবিচারই এই কবিতার অন্তরালে উঁকি মারিতেছে। মজার কথা এই, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা এবং পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারকে ধৃতরাষ্ট্র এক অদ্ভুত যুক্তিবলে সমর্থন করিয়া যাইতেছেন। গান্ধারী যখন বলিতেছেন যে পাপাচারী দুর্যোধনকে পরিত্যাগ কর, তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন :—

'এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী পরে পা দিয়ে বাঁচেনা কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ, তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে।'

"চমৎকার যুক্তি এ। তাহা হইলে একবার পাপ করিলে তাহার আর উদ্ধার নাই। সারা জীবন তাহাকে পাপ করিয়াই যাইতে হইবে? এ কথা শুনিলে নিরাশায় মানুষের চিত্ত ভরিয়া উঠিবে, পক্ষান্তরে পাপের স্রোত নিরুদ্ধগতিতে বহিয়া চলিবে। মানুষ পাপ করিতে পারে, তবু তাহার মুক্তির আশা আছে; কিন্তু যেদিন হইতে সে পাপের সহিত সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিবে, সেদিন তাহার ভবিষ্যৎ চিরঅন্ধকারময়। একবার পাপ করিলে আর ধর্মের পথে ফিরিয়া আসায় কোন লাভ নাই—এই মারাত্মক ভ্রান্ত বিশ্বাস কিছুতেই মানুষের মনে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নয়।"

এই কথাগুলার উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে হইবে।

"দেশের কোন পরিচিত লোককে যদি নিন্দা করতেই হয়, নিন্দার অহেতুক আনন্দেই হোক্ অথবা কোন উদ্দেশ্যমূলক কারণেই হোক, অন্তত সেটা বিশ্বাস্য হওয়া চাই। নইলে বুদ্ধির প্রতি দোষ আসে। কাব্যে আমি পৌত্তলিকতা প্রচার করেছি অথবা পাপ একবার সুরু করলে সেটা একেবারে চূড়ান্ত করাই কর্তব্য, এই নীতিটাকে "মানুষের মনে বদ্ধমূল" করবার জন্যে আমি বদ্ধপরিকর, আমার সম্বন্ধে এমন অপবাদ বাংলার মতো দেশেও সম্ভবপর হোতে পারে—এ আমি কল্পনাও করিনি।

"লেখক বলবেন তাঁর স্বপক্ষের দলিলসুদ্ধ তিনি দাখিল করেছেন। অস্বীকার করবার জো নেই যে আমার কাব্যে অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদ করবার উপলক্ষ্যে বলেছেন, "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার", আর ধৃতরাষ্ট্রও বলেছেন বটে, "এককালে ধর্মাধর্ম দুই তরী পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ।"

"এমনতরো অদ্ভুত যুক্তি নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। যদি বলি লেখক যা বলছেন নিজেই তা বিশ্বাস করেন না, তা হোলে সেটা রূঢ় শোনায় ; আর যদি বলি করেন তবে সেটাও কম রূঢ় হয় না।"

অর্থাৎ লেখককে হয় কপটাচারী নয় মূর্খ বলিতে হয়। অথচ এই দুটি শব্দের কোনটিই সম্মানব্যঞ্জক নয়।

"লেখক পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন ; আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে ওঁাকে এই উপদেশটুকু দেব যে কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে সব কথা বলানো হয়, সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্টে 'The Arch Fiend' বলছেন :—

"To do aught good never will be our task,
But ever to do ill, our sole delight."

সন্দেহ নেই কথাগুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ।

"কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ছাত্র বা অধ্যাপক, কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক বা পাঠক মিল্টনকে এ বলে অনুযোগ করে নি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বর-বিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস্ লস্টকে উচ্ছেদ করবার প্রস্তাব এখনো শোনা যায় নি ; কিন্তু বাংলাদেশে কখনই শোনা সম্ভব হোতে পারে না, জোর করে এমন কথা বলার মুখ আজ আর রইল না।"

ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"আমি যে ধৃতরাষ্ট্র নই, সে কথা প্রমাণ করা এতই সহজ যে, সে আমি চেষ্টাও করব না। স্বয়ং শেক্সপীয়রকেও প্রমাণের চেষ্টা করতে হয়নি যে, তিনি লেডি ম্যাকবেথ নন বা তাঁর পক্ষে ওকালতনামা নেননি। তাই রাজ-হত্যায় স্বামীকে উৎসাহিত করা উপলক্ষ্যে তাঁর নাটকের পাত্রীর মুখে এমন কথা নিশ্চিন্ত মনে বসাতে পেরেছিলেন—

Infirm of Purpose !
Give me the dagge. :
the sleeping and the dead
are but as pictures.

"শেক্সপীয়রকে এমন উপদেশ বিস্তারিত করেই দেওয়া যেতে পারত যে এক খানা ছবি মুছে ফেলা ও নিদ্রিত মানুষকে হত্যা করা একই, এমন কথা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশ্রদ্ধেয় ; বরঞ্চ নিদ্রিত মানুষকে বধ করায় কেবল যে নরহিংসার পাপ আছে তা নয়, তার সঙ্গে কাপুরুষতা জড়িত। এই উপদেশকে আরোও পল্লবিত করা যেতে পারে, কিন্তু নিরস্ত হলুম। কেননা সম্পাদক নিশ্চয়ই বলতে পারেন শেক্সপীয়রের মুখে যা সাজে, রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষুদ্র পাপীর মুখে তা শোভা পায় না। এমন কথা বলবার আশংকা আছে, এই প্রবন্ধ থেকেই তার প্রমাণ পাই।"

প্রমাণ তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে দিয়াছেন।

"লেখক অধ্যাপক খগেন্দ্র মিত্রের একটা গল্পের উল্লেখ করে বলেছেন :—

"এই গল্পে নরপূজার এক কুৎসিৎ চিত্র অঙ্কণ করা হইয়াছে। মানুষকে সাক্ষাৎ ভগবানের আসনে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গল্প পাঠে মানুষের নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য।"

ইহার উপর কবির মন্তব্যটুকু "মোহম্মদী'র লেখক হজম করিতে পারিবেন। অতএব তাহা উদ্ধৃত করায় কোন দোষ নাই।

"আমার নৈতিক সৌভাগ্যবশতঃ গল্পটি পড়িনি, কিন্তু হিজ হাইনেস্ আগা খাঁয়ের বিবরণ জানি এবং সকলেই জানে। নরপূজা হিন্দুর লেখা গল্পে থাকলে নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য হয়, কিন্তু মুসলমান সমাজের সর্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রনায়কের ব্যবহারে থাকলে দোষ স্পর্শে না, এই প্রসঙ্গে এ কথাটা চিন্তার বিষয় হয়েছে।"

"হিজ হাইনসে আগা খাঁয়ের" ব্যবহারে নরপূজা কি কি আকারে আছে, তাহা গত নবেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রবন্ধ ও তাহার সমর্থক আগা খাঁয়ের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মন্তব্য পড়িলে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন।

ইহার পর কবি কিছু অবান্তর অথচ সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা বলিয়াছেন :

"এই উপলক্ষ্যে একটা বাহুল্য কথা বলে নিই, কেননা দুঃসময়ে বাহুল্য কথাও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। জনশ্রুতি এই যে ভৈরব রাগ মহাদেবের বাংলাগানের জন্যই প্রবর্তিত, আর শুনলেই বুঝা যায়, মিঞা মল্লার বাদশাহী

করমাসেই রূপ নিয়েছে। কিন্তু তবুও ভৈরব বা ভৈরবী হিন্দু নয়, আর মুসলমান নয় মিঞামল্লার। ওরা সম্প্রদায়ের অতীত। তেমনি হোমরের ইলিয়ড বা মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট মুখ্যতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌত্ত-লিকও নয়—ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্তব্য, ধর্মমতের দিক দিয়ে নয়। লজ্জা হয় এই সাদা কথাটারও ব্যাখ্যা করতে।"

'মোহাম্মদী'র আক্রমণটা নূতন নয়। বাংলার সরকারী "পাঠ্যনির্বাচন বিভাগের মুসলমান পক্ষ" পূর্বেই ইহার নজীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

"আমার 'কথা ও কাহিনী'তে "বিচারক" নামক কবিতার একস্থানে আছে, মরাঠা রঘুনাথ রাও মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে বলছেন,—

"চলেছি করিতে যবন নিপাত
জোগাতে যমের খাদ্য।"

'যবন' শব্দটা কালক্রমে হয়তো শ্রুতিকটু হয়েছে। তাই সাধারণত নিজের জবানীতে মুসলমানদের সম্বন্ধে ঐ শব্দ কখনই ব্যবহার করি নে। কিছুকাল হোলো পাঠ্যনির্বাচন বিভাগের মুসলমান পক্ষ থেকে আদেশ এল ঐ "যবন" শব্দটা তুলে দিতে হবে। বিস্মিত হলেম। দুর্বল পক্ষ আমরা, ভাবলেম এই হতভাগ্য দেশ ছাড়া আর কোথাও এমন উৎপাত সম্ভব হোতে পারত না। মার্চেন্ট অব ভেনিসে খ্রীষ্টান বারেবারে ইহুদিকে কুকুর বলে গাল দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত বইখানাতেই ইহুদির পরে অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, তা না হোলে ওর নাটকীয় বাস্তবতার অপলাপ হত। তৎসত্ত্বেও [ইহুদি] লর্ড রেডিং যখন এখানে ভাইসরয় ছিলেন তখন ঐ বইটাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণী থেকে সরাবার জন্যে পরোয়ানা জারি করেন নি। আর [ইহুদী] ডিজরেলির মত প্রখর বক্তা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নির্বাক ছিলেন। অথচ কাব্যে মরাঠা পাত্রের মুখে উচ্চারিত সামান্য একটা "যবন" শব্দের জন্য বাংলা সাহিত্য যদি লাঞ্ছিত হতে পারে, তাহলে এই মাথাগণতির দিনে কার দরজায় দোহাই পাড়ব? সমস্ত কবিতাটিতে রঘুনাথ রাওকে আদর্শ পুরুষ বলেও খাড়া করা হয় নি। তার বিপরীত "যবন" শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যদি অন্যায় সূচিত হয়ে থাকে, সে অন্যায় কবির মধ্যেও নেই, কাব্যের মধ্যেও নেই, বস্তুত সে অন্যায় সাহিত্যকে স্পর্শও করে নি।

এই সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ রাও যমের খাদ্য যোগাবার কথা বলেছে। ওটাও তো সাধুলোকের যোগ্য কথা নয়; ঐ পংক্তিটাও বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল। ওথেলো নাটকে একজন মুসলমান সেনাপতি অন্যায় সন্দেহে তার স্ত্রীকে খুন করেছে। খ্রীস্টানে মুসলমানে বিবাহ হলে মুসলমান স্বামী কর্তৃক এইরকম বীভৎস আচরণ স্বাভাবিক, শেকস্‌পিয়রের রচনার মধ্যে এমন একটা কুৎসিৎ ইসারা আছে, এই অভিযোগে পাঠ্যনির্বাচন সমিতির মুসলমান সদস্যেরা কি দণ্ড উত্তোলন করবেন? সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা কপালে আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে সুরু হবে?"

কবি "উপসংহারে ন্যায়ের অনুরোধে একটা কথা বলা উচিত" মনে করিয়াছেন।

"সাহিত্যবিচার নিয়ে এই রকম অদ্ভুত বুদ্ধি বিকার আমার হিন্দু ভ্রাতাদের মধ্যেও উগ্র হয়ে উঠতে পারে, আমি হতভাগ্য তার প্রমাণ পেয়েছি। "ঘরে বাইরে" নামক একখানা উপন্যাস অশুভলগ্নে লিখেছিলেম। তার মধ্যে বর্ণিত সন্দীপ নামক এক দুর্বৃত্তের মুখে সীতার প্রতি অসম্মানজনক কিছু আলোচনা ছিল। বলাবাহুল্য সন্দীপের চরিত্র-চিত্র পরিস্ফুট করা ছাড়া এই আলোচনার মধ্যে অন্য কোন অসৎ অভিপ্রায় ছিল না। হঠাৎ আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কলরব উঠল, সীতাকে স্বয়ং আমিই অপমান করেছি। কবি বাল্মীকি অযোধ্যার প্রজাদের দুর্বাক্যকে দুর্মুখের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করিয়ে নিরপরাধ সীতার নির্বাসন সম্ভব করেছেন। কেউ তো ত্রেতা যুগের কবির প্রতি দোষারোপ করেন নি। আর এই কলিযুগের কবির মাথায় হিন্দুমুসলমান উভয় পক্ষই একই শ্রেণীর অপরাধ চাপিয়ে যদি তার অখ্যাতিকে দুর্ভর করে তোলেন, তবে কি এই বাংলাদেশের পঙ্কিল মাটিকেই দায়ী করব? প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া কোনো রকম নৈতিক কারণ অনুমান করতেও সাহস করিনে।"

কবির উল্লিখিত সাহিত্যিক দুর্ঘটনাটা মনে পড়িতেছে বোধ হয়। যিনি রবীন্দ্রনাথকে আসামী খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহারই পিতার কোন নাটক থেকে সীতাসম্বন্ধীয় কিছু দুর্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।

'মোহাম্মদী'র লেখকের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে সমুদয় মুসলমানের প্রতি প্রযুক্ত ও প্রযোজ্য নহে, তিনি তাহা বলিয়া জবাবটি শেষ করিয়াছেন।

"সবশেষে একটি কথা বলে বিদায় নেব। আমার কোন কবিতায় ব্যক্তিগত-ভাবে আওরংগজেবের সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ পেয়েছিল। বলেছিলেম, আওরংগজেব ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেছিলেন। পাঠ্য নির্বাচনের মুসলমান সভ্য এটাকে সমস্ত মুসলমানের নিন্দা বলেই গণ্য করেছিলেন, নইলে এ লাইনটাকেও বর্জন করতে আদেশ দিতেন না। তাই স্পষ্ট করে বলে রাখি বর্তমান প্রবন্ধে আমি মোহাম্মদীর প্রবন্ধ-লেখকের অদ্ভুত উক্তি নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটাও একজনের সম্বন্ধেই। সেটাতে সমগ্র বা অধিকাংশ মুসলমানের বিচারবুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, এ দুর্দিনে এত বড়ো নিন্দার কথা কেউ যেন কল্পনা না করেন। আমি অনেক মুসলমানকে জানি তাঁদের শ্রদ্ধা করি। অনেকেই তাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা রসজ্ঞ, তাঁরা উদার, তাঁরা মননশীল, নানা ভাষার সাহিত্যে তাঁরা অভিজ্ঞ। অপক্ষপাত সদ্বিবেচনায় তাঁরা কোন সম্প্রদায়ের কোনো সদাশয় ব্যক্তির চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নন। হিন্দু কি মুসলমান এ তর্ক মনে ওঠেই না; তাঁরা মানুষের মতো মানুষ।

শ্রাবণ, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভা

৩০শে আষাঢ়ের দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে,

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে গঠিত নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে আইনসভায় হিন্দু প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইবে, বর্তমানে হিন্দুদের যে ক্ষমতা আছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে, এবং দীর্ঘকালের সেবা, আত্মত্যাগ ও দেশহিতৈষণাদ্বারা তাহারা শাসনকার্য পরিচালনায় যে ন্যায়-সংগত ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছিল তাহা হারাইবে।—একথা আজ সমস্ত হিন্দুই উপলব্ধি করিতেছেন। এই অন্যায়, অবিচার ও জাতীয় অপমানের প্রতিবাদ-কল্পে বুধবার ১৫ই জুলাই ৩১শে আষাঢ় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সময় কলিকাতা

টাউনহলে হিন্দুগণের এক বিরাট সভা হইবে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

হিন্দু সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

যাঁহারা এই সভা আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের সভ্য, রাজনৈতিক দলের সভ্য, হিন্দু মহাসভার সভ্য প্রভৃতি এবং কোন দলেরই সভ্য নহেন এরূপ লোকও আছেন। স্বয়ং সভাপতি কোন দলের লোক নহেন।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

নিখিল-বঙ্গ মহিলা কর্মীসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ

গত ২৫শে ও ২৬শে আশ্বিন কলিকাতার আলবার্ট হলে শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ প্রমুখ মহিলাদের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীমতী মোহিনী দেবী অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীমতী নির্মলনলিনী ঘোষ সম্মেলনের সভানেত্রীর কর্তব্য যথাযথরূপে সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় মানবসভ্যতা ও নারীদের সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার বক্তব্য মূলতঃ তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্য মহিলাসম্মেলনে তাঁহার সমুদয় বক্তৃতাটির অনুলেখন দিবার প্রয়োজন নাই, এবং তাহা যথাযথ অনুলিখিত হয়ও নাই। শেষের দিকে তিনি বলেন:

"প্রজারা যাতে আপনাদের হীন অবস্থা বুঝতে না পারে এবং প্রতিবাদ না করে—সেজন্য একেশ্বর রাজারা যেমন প্রজাকে জ্ঞান দিতে কুণ্ঠিত হয়, তেমনি একেশ্বর আধিপত্য বজায় রাখবার জন্যই পুরুষেরা নারীদের প্রতি এই রকম ব্যবহার করে এসেছে এবং মূঢ়তার জগদ্দল পাথর মেয়েদের উপর চাপিয়েছে। এতে পুরুষেরা ঠকেছে। কারণ, আজ যে আমরা দেশকে উন্নতির পথে, শাসনের দিকে টানতে চাচ্ছি, তা বাধা দিচ্ছে এই মূঢ়তা ও অজ্ঞতা আমাদের মেয়েদের মধ্যে। এ পুরুষেরই কৃতকর্মের ফল।"

নারীদের জগদ্ব্যাপী জাগরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন:

"একটা সৌভাগ্যের কথা এই যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এসেছে। প্রাচ্য মহাদেশের সর্বত্র এই জাগরণ দেখা দিয়েছে। সকলেই বুঝতে পারছে যে, মেয়েদের পিছনে ফেলে রেখে সমগ্র দেশের ক্ষতি হয়েছে। দেখেছি পারস্যে রাজশাসনের নূতন আইন হয়েছে—যাতে মেয়েরা শিক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভ করে নিজেদের গৌরবময় স্থান অধিকার করে। জাপানে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমানভাবে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছে। সেখানকার বীরাঙ্গনাদের কীর্তি দেখলে পুলকিত হতে হয়। চীনের মেয়েরা দেশকে বাঁচাবার জন্য ঘরের গণ্ডী পেরিয়ে এসেছে। মা যেমন সন্তানকে বাঁচাবার জন্য বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পশ্চাৎপদ হয় না, সেই রকম মেয়েরা যখনই দেখেছে যে তাদের ভাই পুত্র সন্তান বিপন্ন তখনই তাদের স্বাভাবিক ধর্ম পরিত্যাগ করে রণাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হয় নি। স্পেনে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোক। একথা বললে ভুল হবে যে, তাহলে কি তারা নারীধর্ম পরিত্যাগ করে পুরুষের চিত্তবৃত্তি ধার করে কাজ চালাচ্ছে? ধারে কোন বড় কাজ চলে না। মেয়েদের মেয়েই থাকতে হবে—এটা বিধাতার বিধান। কিন্তু একথাও বলা ভুল ও অশ্রদ্ধেয় যে মেয়েরা কেবল গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।"

সভ্যতা জিনিষটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। সেই কাজে নারীদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

"যে নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়া পুরুষের সভ্যতা রক্তপথে চলেছে, সেটা আজ টলমল করে উঠেছে। পাশ্চাত্য দেশ, যেখানে এই সভ্যতার বড় কেন্দ্র, সেখানে এই বিনাশের শক্তি এত উগ্র হয়ে উঠেছে যে, আজ বড় বড় মনীষীরা সন্দেহ করছেন যে, বর্তমান সভ্যতা বিনাশের পথে চলেছে—তার কারণ কি? কারণ এই সভ্যতা একপেশে, এর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। এটা পুরুষের, নারীর স্থান এতে নেই। এই যে নিষ্ঠুরতার উপর গড়া পুরুষের সভ্যতা, এ টিঁকতে পারে না। আজকের দিনে তার হিসাব নিকাশের পালা পড়েছে। আর ঠিক এই সময় মেয়েরা বাইরে এসেছে। যদি সভ্যতা একেবারে ধ্বংস হয়ে না যায়—যদি এ টিঁকে থাকে, তবে এখন থেকেই মেয়েদের দায়িত্ব সুরু হল। মেয়ে আর পুরুষে মিলে যে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠবে তাতে

বাঁচবার মন্ত্র দিতে হবে মেয়েদের। পুরুষের চিত্তবৃত্তির এবং নারীর হৃদয়-বৃত্তির মিলনে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে—তাই হবে প্রকৃত সভ্যতা। তার উদ্যোগ হয়েছে এতদিনে। মেয়েরা এত দিন তাদের দীনতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা মেনে নিয়েছে। সেই মেয়েরা এখন যদি বলে যে, সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টিতে তাদের কাজ করতে হবে—তবে তাদের তা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাদের অজ্ঞতা অন্ধকার দূর করতে হবে। যেখানে অজ্ঞতা—সেখানে তোমাদের অর্ঘ্য দিও না। আজকের দিনে তোমাদের জাগতে হবে। শক্তিকে দীপ্ত, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল, কর্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে; কেননা নূতন যুগ এসেছে। একথা আর বলতে পারবে না যে, তোমরা বোকা, মূঢ়, মূর্খ, অকেজো। একথা বলতে লজ্জা কোরো যে তোমরা, ভারতের নারীরা অবনত। জগতের আহ্বান তোমাদের এসেছে। যুগসঞ্চিত সমস্ত আবর্জনা তোমাদের তুচ্ছ করতে হবে এবং জ্ঞানের বুদ্ধির দীপ্তিতে তোমাদের উজ্জ্বল হতে হবে। যদি তোমরা যোগ্য হও, দেখবে আর কেউ কখনও তোমাদের অপমান ও অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।"

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ও জবাহরলালের কথোপকথন

খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত জবাহরলালের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী কথোপকথন হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা ও র‍্যাডভান্সের ছবি দুটিতে জবাহরলালকে শ্রোতারূপে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেস-অধিনায়কের কি কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলস ও বৃথা কৌতূহল হয় তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্বসাধারণ উপকৃতও হইতেন।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত যেমন বিখ্যাত অবিখ্যাত দেশী বিদেশী বহু ব্যক্তি দেখা সাক্ষাৎ করেন, রবীন্দ্রনাথের সহিতও সেইরূপ বহু বৎসর হইতে বিস্তর লোক দেখা করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন ও তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর সহিত এইসব সাক্ষাৎকারের ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত ও অনুলেখন

রক্ষিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন লিখিয়া রাখিবার এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।

ফাল্গুন, ১৩৪৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান বর্তমান বৎসরেও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।...

বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের দলবদ্ধ পথচারিতার আনুষঙ্গিক এই গানটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

ওঁ

"চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই।
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো মুক্তি পথে, চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে,
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন,
স্বপ্ন কুহক করো ছিন্ন,
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ, জড়তার জর্জরবন্ধে।
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,
মুক্তির জয় বলো ভাই—
চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।
চলো দুর্গম পথ যাত্রী
চলো দিবা রাত্রি,
করো জয় যাত্রা, চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,
সত্যের জয় বলো ভাই,
যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।
দূর করো সংশয় শঙ্কার ভার
যাও চলি তিমির দিগন্তের পার,

চলো চলো জ্যোতির্ময় লোকে জাগ্রত চোখে,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়—
বলো নির্মল জ্যোতির জয় বল ভাই—
চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।
হও মৃত্যু তোরণ উত্তীর্ণ,
যাক্, যাক্ ভেঙে যাক্ যাহা জীর্ণ,
চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,
অমৃতের জয় বলো ভাই—
চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।"

প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে শুধু এই গানটি থাকিলেও তাহা অনুপ্রেরণা লাভের উপায় বিবেচিত হইতে পারিত। ইহাতে যে মুক্তি পথের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মানব জীবনের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তির পথ।

ফাল্গুন, ১৩৪৩

উইনটারনিটজ্

এখন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের জীবন বাহিরের ঘটনা দিয়া সম্পূর্ণ জানা যায় না। অধ্যাপক উইনটারনিট্জ্ (Winternitz) ছিলেন এইরূপ মানুষ। ভারতের প্রতি এমন খাঁটি ও গভীর অনুরাগ ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রে ও বিদ্যায় এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখা যায় না।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রিয়ার নিম্নপ্রদেশে তাঁহার জন্ম। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ষোলো কি সতের বৎসর বয়সে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। দর্শনশাস্ত্র ও ভাষা বিজ্ঞানই ছিল তাঁহার মুখ্য সাধনার বিষয়। তাহার পর বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, অধ্যাপক বুলরের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল। তখন হইতে তিনি নৃতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ২২ বৎসরে বয়সে, তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করিলেন। জ্ঞানক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম উপহার হইল আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র। এই গ্রন্থখানি সম্পাদনে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল।

এই সময় অধ্যাপক ম্যাকসমূলরের বিখ্যাত ঋগ্বেদ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন হয়। তাই তিনি একজন যোগ্য সহকর্মী খুঁজিতে ছিলেন। আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র গ্রন্থখানির সম্পাদনপ্রণালী দেখিয়া তিনি যুবক উইনটারনিট্‌জ্‌কেই তাঁহার সহকর্মীরূপে মনোনীত করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। এই বয়সেই তিনি যেরূপ নিপুণ পাণ্ডিত্যের সহিত ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণটি বাহির করিলেন, তাহাতে এই গ্রন্থখানিই তাঁহার তপস্যা ও সাধনার অমর কীর্তিস্তম্ভ হইয়া রহিল।

এই উপলক্ষ্যে তিনি অফ্রেক্‌ট প্রভৃতি বহু প্রবীণ আচার্যগণের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। কতকটা তাঁহার নৃতত্ত্বের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বৈদিক যুগের উদ্বাহকাণ্ডের দিকে। তাঁহার রচনা এই বিষয়ে বহু পরিমাণে আলোকপাত করিল। তাঁহার সম্পাদিত আপস্তম্ব মন্ত্রপাঠও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধনার সাক্ষী।

ইহার পর তিনি যে কাজে হাত দিলেন তাহা একান্ত নীরস ও একঘেয়ে হইলেও তাহার দ্বারা তাঁহার অনুরাগ ও সাধনা একটি কঠিন প্রতিষ্ঠাভূমি ও যাথাতথ্য লাভ করিল। তিনি বিখ্যাত বড্‌লিয়ন গ্রন্থালয়ের বৈদিক পুঁথির সূচী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের পুস্তকালয়স্থিত দক্ষিণভারতীয় পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করেন। এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি মহাভারতের মহিমা উপলব্ধি করেন এবং এই মহাগ্রন্থের একখানি সুসম্পাদিত সংস্করণের প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। নৃতত্ত্বের প্রতি তাঁহার অনুরাগও কতক পরিমাণে ইহার হেতু হইতে পারে। এই নৃতত্ত্বানুরাগই তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ **Position of women in Brahmanic Literature** এর ("ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নারীর সামাজিক অবস্থা"র) মূল কারণ। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহারও পরিচয় দিয়াছেন তিনি বহু গ্রন্থে এবং রচনায়।

তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ তিনি আপন হস্তেই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা তাঁহার তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ **History of Indian Literature** (ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের ইতিহাস)। এই গ্রন্থখানা প্রথমে বাহির হয় জর্ম্যান ভাষায়, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে।

ইহার পর তিনি আসেন ভারতে। এদেশে তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে

নানাবিধ বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে মুখ্য হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত Six Readership Lectures।

জ্ঞানক্ষেত্রের বিখ্যাত দুইখানি জর্ণালও তাঁহার প্রেরণায় চালিত হইত। জীবনে ছোট বড় গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রায় চারি শতখানি তাঁহার রচনা। মোট কথা, আপন স্মৃতিস্তম্ভ রচনার ভার তিনি পরহস্তে রাখিয়া যান নাই।

এই পর্যন্ত তাঁহার যে জীবন তাহা তাঁহার গ্রন্থাদি দেখিয়াই জানা যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার আসল মাহাত্ম্যটি আমরা ধরিতে পারিলাম না। তাহার সন্ধান পাইলাম বিশ্বভারতীর সাধনা ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার ছিল অপরিমেয় শ্রদ্ধা।* কবিবরের নিমন্ত্রণে তিনি আসিলেন ভারতে। বিশ্বভারতীতে পৌঁছিবার পূর্বে পথে তিনি কয়দিন কাটাইয়া আসিলেন পুনায়। সেখানে বিখ্যাত ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউটে তিনি দেখাইয়া দেন কেমন করিয়া ভারতের সর্বপ্রদেশের পুঁথি মিলাইয়া সুবিচারসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হয়। তাঁহার প্রদর্শিত এই প্রণালীতেই বুঝা যায় তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞান।

তিনি যখন প্রথম বিশ্বভারতীতে আসিলেন, তখন সর্বাগ্রে চোখে পড়িল তাঁহার অতুলনীয় ভদ্রতা, বিনয় ও চরিত্রমাধুর্য। আমাদের কাছেও তিনি শ্রদ্ধানত ছাত্রের মত বিনয়ের সহিত প্রশ্ন করিতেন। অথচ সেই সব বিষয়ে দেখিতাম তাঁহার জ্ঞানও-পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। তাঁহার সম্পাদন ও বিচার প্রণালীর মধ্যে যেমন দেখা যাইত তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা তেমনি থাকিত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ় হইলেও তাঁহার বিচারবুদ্ধি ছিল সদাজাগ্রত। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানসম্পদের আলোচনায় তিনি মহৎ সব ভাবের প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন তেমনি অসার ও হীনবস্তুর প্রতি কখনও মিথ্যা সম্মান দেখান নাই। এক কথায় তাঁহার বিচার প্রণালীর মধ্যে একটি অপূর্ব সামঞ্জস্যবোধ (balance) ছিল। তাহাই তাঁহার প্রণালীর বিশেষত্ব।

এখান হইতে দেশে গিয়াও তিনি আমাদিগকে বা বিশ্বভারতীকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। সর্বদাই নানাভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি

---

* প্রাগে কবিকে তথাকার পৌরজনদিগের পক্ষ হইতে যে সম্বর্দ্ধনা করা হয়, তদুপলক্ষ্যে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে "গুরুদেব" বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিজ অভিভাষণ পাঠ করেন।

প্রবাসীর সম্পাদক

উৎসুক থাকিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য যখন ভাঙিয়া আসিয়াছে, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি জীবনী লিখিয়া তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাটুকুর পরিচয় দিয়াছেন।

চৈত্র, ১৩৪৩

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সর্বধর্মসম্মেলন

গত ফাল্গুন মাসের অরাষ্ট্রনৈতিক সর্বপ্রধান ঘটনা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকীর একটি অঙ্গ সর্বধর্মসম্মেলন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুদ্রিত অভিভাষণ···তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া সর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড বলেন, যদি এই সর্বধর্মসম্মেলনে কেবল এই অভিভাষণটিই পঠিত হইত, তাহা হইলেও ইহার অধিবেশন সার্থক মনে করা যাইতে পারিত। পড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মুদ্রিত পুস্তিকাটি অল্প কিছু সংশোধন করেন। এই সংশোধন অনুসারে তাঁহার অভিভাষণটি মডার্ণ রিভিয়ুর এপ্রিল সংখ্যায় ছাপা হইবে।

চৈত্র, ১৩৪৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান বিতরণ সভা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক কন্‌ভোকেশ্যনে অর্থাৎ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) পদবীসম্মানবিতরণসভায় কবি সার্বভৌম বাংলায় লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা এই প্রথম হইল। কবি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

"দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়।"

বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় কনভোকেশ্যনের বক্তৃতাকে যে একটি গৌরবের বিষয় বলিয়া সাংবাদিকদিগকে ও অন্য কাহাকেও কাহাকেও বলিতে হইয়াছে, "বিরোধের কণ্ঠে" সে সম্বন্ধে এই টিপ্পনী করিতে হইতেছে, যে, বঙ্গের যে কোন সভায় বাংলার ব্যবহার যে কর্তব্য তাহা একটি স্বতঃস্বীকার্য সত্য, সুতরাং সেই সত্যের অনুসরণ জয়ধ্বনির সহিত ঘোষিত হওয়া "দুর্ভাগ্য

দিনের" একটি "দুঃসহ লক্ষণ"। তথাপি, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যাহা স্বতঃ-স্বীকার্য, যে বাধাবশতঃ তাহা এ পর্যন্ত কার্যতঃ স্বীকৃত হয় নাই, সেই বাধা অতিক্রান্ত হওয়া গৌরবের বিষয় এবং প্রধানতঃ যাঁহাদের চেষ্টায় তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারা ধন্যবাদভাজন।

আর একটি স্বতঃস্বীকার্য সত্য এবার কনভোকেশ্যনে কার্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে—বাঙালী ছাত্রেরা ধুতি পরিয়া পদবী-সম্মান লইতে পারিয়াছে। গাউনের পরিবর্তে দেশী কোন রকম শোভন পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইতে পারিলে পরিবর্তনটি পূর্ণাঙ্গ হইবে। কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, কবি এই কারণে গাউন পরিতে রাজী হন নাই যে, উহাতে একটা অবাস্তবতা (unreality) আছে। তাহা সত্য।

কবি এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করেন—

"এদেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

"ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তাবিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা যে বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলঙ্কার প্রসাধনের সামগ্রী বলেই আদরণীয় হয়নি, নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে বলেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এই জন্যই এই শিক্ষার সর্বজন গম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার করে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে সেই শিক্ষার প্রসারসাধন-চেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশ মাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরবর্তী করা,—ফসলের বড়ো মাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতিভাগ্যের এই অবজ্ঞা

আমরা সহজেই স্বীকার করে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি, জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেষণকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যা-দানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারা-মরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচবশতঃ চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমানকালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্য-জাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয়নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।"

বলা বাহুল্য তাহার কারণ সেই সব দেশ স্বাধীন, আমাদের দেশ পরাধীন।

তাঁহার বক্তৃতার শেষে এই প্রার্থনাটি ছিল—

হে বিধাতা

দাও দাও মোদের গৌরব দাও

দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে

দুঃসহ দুঃখের গর্বে।

টেনে তোলো রসাক্তভাবের মোহ হতে

সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ

ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে

মানবমর্যাদা বিসর্জন

চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি

নিষ্ঠুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে

মস্তক তুলিতে দাও

অনন্তআকাশে,
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে।

বৈশাখ, ১৩৪৪

শান্তিনিকেতনে "রবিবাসর"

"রবিবাসর" নামক সাহিত্যগোষ্ঠীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ইহার সভ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করায় ইহার ৩০শে ফাল্গুন রবিবারের অধিবেশন শান্তিনিকেতনে হইয়াছিল। সেখানে সভ্যেরা যে ভূরিভোজনাদি করিয়াছিলেন এবং যে সাহিত্যিক ও শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলেখনও বাহির হইয়াছে। বিশ্বভারতীর পরিচয় প্রবাসীর পাঠক পাঠিকাদিগকে নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং এই উপলক্ষ্যে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। এখানে কেবল বক্তব্য এই, যে, কলিকাতার কতকগুলি ভদ্রলোক যে কর্মী রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্রের সহিত সাক্ষাৎ কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেন, ইহা সন্তোষের বিষয়। 'বিচিত্রার' সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (অবশ্য ভূরিভোজনের প্রতিদানস্বরূপ নহে) যে একটি প্রস্তাব করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য এবং আমরা তাহার সমর্থন করিতেছি। তিনি বলেন, বাঙালী পুস্তকপ্রকাশকেরা ও গ্রন্থকারেরা যে সকল বাংলা পুস্তক প্রকাশ করিবেন, তাহার এক এক খণ্ড বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে উপহার পাঠাইবেন। আইন অনুসারে প্রকাশকেরা গভর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক পুস্তক তিনখানি বিনামূল্যে দিতে বাধ্য। বিলাতী আইনে তথাকার প্রকাশকেরা ব্রিটিশ মিউজিয়ম, বডলীয়ান লাইব্রেরী প্রভৃতিতে বিনামূল্যে পুস্তক দিতে বাধ্য। বঙ্গের পুস্তক প্রকাশকেরা নিজেদের আইন নিজেরা করিয়া তাহা নিজেদের উপর খাটান। অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে একখানি করিয়া বই বিনামূল্যে দিতে ভুলিবেন না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব নানাস্থানে হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিশ্বভারতীর আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র সেনের বাড়ীতে শান্তি নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। এই সভাতে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি এবং অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও অন্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সংগীত ও সভাপতির বক্তব্যের পর মধ্যে মধ্যে আরও গান হয়, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী একটি কবিতা পড়েন, তাঁহার নির্মিত ও কবিকে উপহৃত একটি সুন্দর পুস্তকাধার প্রদর্শিত হয়, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, অনাথবাবু ও শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বলেন, কবিকে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা যে প্রণামী গরদের ধুতিচাদর উপহার দিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হয়, সভাপতি আরও দুইবার কিছু বলেন, এবং জলযোগ ও ফটোগ্রাফ গ্রহণের পর রাত্রি ৯টার সময় সভা ভংগ হয়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

"কালান্তর"

রবীন্দ্রনাথের গত জন্মোৎসবের দিন তাঁহার "কালান্তর" নামক একটি নূতন প্রবন্ধসংগ্রহ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পনরটি প্রবন্ধ আছে। যথা—কালান্তর, বিবেচনা ও অবিবেচনা, লোকহিত, লড়াইয়ের মূল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ছোটো ও বড়ো, বাতায়নিকের পত্র, শক্তিপূজা, সত্যের আহ্বান, সমস্যা, সমাধান, শূদ্রধর্ম, বৃহত্তর ভারত, হিন্দু মুসলমান ও নারী।

প্রবন্ধগুলি নূতন লিখিত না হইলেও ইহার কোনটিই এমন কোন সমস্যা বা প্রশ্নের বিষয়ে লিখিত নহে, যাহার সমাধান হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সব

গুলিরই এখনও উপযোগিতা আছে। সবগুলি একখানি বহির মধ্যে পাওয়া সুবিধাজনক। একটি পাতা উল্টাইতে হঠাৎ চোখে পড়িল,

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেস্টিজ্-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

প্রেস্টিজ যাইবার ভয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক গভর্ণরেরা মন্ত্রী হইবার যোগ্য কংগ্রেসওয়ালাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারিতেছেন না, যে, তাঁহাদের আইনসংগত কাজে বাধা দিবেন না।

শ্রাবণ, ১৩৪৪

"সে"

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একখানি নূতন সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। নাম, "সে"। একটু বিস্তারিত পরিচয় পরে দিবার ইচ্ছা রহিল। এখন কেবল বলি, ভারি মজার বই! লেখা ও ছবি দুই-ই কবির হাতের। ইহার মজা ছেলে বুড়ো উভয়েই পাইবে; নিগূঢ় রস ও রহস্যের সন্ধান বোধ করি বুড়োরাই বেশী পাইবে।

বাংলা দেশে এই সময়ে আমাদের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগকে কোন না কোন বিলাতী গ্রন্থকারের সদৃশ বলিলে সম্মান করা হয়, এইরূপ একটা ধারণা ছিল —এখনও আছে কি না জানি না। অমুক বঙ্গের মিল্টন, অমুক স্কট, অমুক বায়রন, অমুক শেলী...। সেইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ যদি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ত বহুরূপী, আবার কি বেশ ধরিয়াছেন? তাঁহার এই বইখানি ইংরেজী কোন বইয়ের মত? উত্তরের আগেই বলিয়া রাখি, কেহ কাহারও নকল বলিলে নকল বলিয়া অভিহিত ব্যক্তিকে সম্মান করা হয় না, এবং কোন বাঙালী কবি বা অন্য সাহিত্যিক নকল করিয়া বড় হইয়াছেন ইহা সত্য নহে। অতঃপর প্রশ্নের উত্তরে বলি, 'রবীন্দ্রনাথের নূতন বহিটি কোন ইংরেজী বহির মত নয়। তবে, ইহা ঠিক যে ইহা পড়িতে বসিয়া হঠাৎ ইংরেজী "অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড্" মনে পড়িয়া গেল। কেন পড়িল, কেমন করিয়া বলিব? উত্তর

পুস্তকেই অপ্রত্যাশিত মজা আছে। এবং একটিতে "র‍্যালিস্," অন্যটিতে "পুপে দিদি"। আর কোন মিল দেখিতেছি না।

ভাদ্র, ১৩৪৪

"লোকশিক্ষা-সংসদ"

মৌলবী আজিজুল হক শিক্ষামন্ত্রী থাকিবার সময় যে "শিক্ষা সপ্তাহ" হইয়াছিল তাহার সংস্রবে রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার সাঙ্গীকরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে 'পুনশ্চ' শিরোনামা দিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি ও অন্য কিছু কথা মুদ্রিত হইয়াছিল।

> দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসর মত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্ব পর্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।

কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

> একদা আমাদের দেশে কাশী প্রভৃতি নগরে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতিরক্ষা ও শিক্ষাচর্চা নানা প্রণালীতে পরিব্যাপ্ত ছিল গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। আধুনিক কালের শিক্ষাকে কোন উপায়ে এদেশে তেমন করে যদি প্রসারিত করে না দেওয়া যায় তবে এ যুগের মানব সমাজে আমরা নিজের বিদ্যাগত যোগ রক্ষা করতে পারবো না। এবং না পারা আমাদের সকল প্রকার অকৃতার্থতা ও অপমানের কারণ হবে এ কথা বলা বাহুল্য।

এই সমুদয় কথায় ব্যক্ত কবির অভিপ্রায় অনুসারে বিশ্বভারতী "লোকশিক্ষা

সংসদ" গঠন করিয়াছেন বিশ্বভারতী কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন হইতে লিখিয়াছেন—

> দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্যবিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দিষ্ট করিয়া দিব। যথেষ্ট মনোযোগপূর্বক পাঠ্যবিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কিনা এই প্রদেশব্যাপী নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রমাণ গ্রহণ হইবে। এই সকল কেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষার ভার গ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ বোধ করেন তাঁহারা আপন অভিমতসহ পত্র লিখিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাইলে উপকৃত হইব।

পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথম—আদ্য, দ্বিতীয়—মধ্য, তৃতীয়—উপাধি। প্রথমতঃ আদ্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তাহার বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ভারতশাসনপদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞান, পাটিগণিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গৃহস্থালী। প্রশ্নপত্রের সংখ্যা আট। পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত বাঙ্গালী মহিলা ও পুরুষেরা উৎসাহী হইয়া বিশ্বভারতীর এই মহতী প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

ভাদ্র, ১৩৪৪

আন্দামানে বন্দীদের প্রায়োপবেশন

...আন্দামানের ১৮৭ জন বন্দী প্রায়োপবেশন করায় সর্বত্র জনগণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহা প্রথম প্রকাশ পায়, কলিকাতার টাউন হলের বহু জনাকীর্ণ সভায় যাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মন্তব্য পাঠ করেন। মহাকবিরা যেমন তাঁহাদের, অনেক রচনায় মানুষের হৃদয় মনের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ তাঁহার বাণীকৃত জনগণের মনের কথা তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভাদ্র, ১৩৪৪

ওয়াল্ট হুইটম্যান স্মৃতিসভা

গত ৩২শে আষাঢ় কলিকাতার সিটি কলেজ হলে প্রবাসীর সম্পাদকের সভাপতিত্বে আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহু বিদ্বজ্জনের ও ছাত্রছাত্রীমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অনেকে চিঠি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

ওঁ

কল্যানীয়েষু—

শরীর ক্লান্ত দুর্বল তার উপরে কাজের ভীড়—চিঠি লেখার কর্তব্যে সর্বদাই ত্রুটি হচ্ছে।

তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক—এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে এ রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিম কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল—তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে এ সেই রকম ছন্দোবদ্ধ সব লণ্ডভণ্ড—মাঝে মাঝে এক একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোন যাচাই নেই সেখানে আবর্জ্জনাও নেই—সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে নিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই —মুখরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়ার দরকার। ইতি—৩০শে আষাঢ় ১৩৪৪।

কার্তিক, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথের আরোগ্যলাভ

রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হওয়ায় বিদেশের, ভারতবর্ষের ও বঙ্গের অগণিত লোক উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগমুক্তিতে তাঁহাদের উদ্বেগ দূর হইয়াছে।

আমরা তাঁহার পীড়ার সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তাঁহার আরোগ্যলাভে আনন্দিত হইয়াছি।

সর্ নীলরতন সরকার প্রমুখ চিকিৎসক মহাশয়েরা কবির চিকিৎসা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কার্তিক, ১৩৪৪

শান্তিনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব

এ বৎসরও শান্তিনিকেতনে নিকটবর্তী সাঁওতাল গ্রামের মাঠে, হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সাঁওতাল পুরুষ ও নারীরা ইহাতে সানন্দে যোগ দিয়াছিল। সভ্যতার প্রায় আদিম স্তরের মানুষের সহিত সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উপনীত কবির মিলন জগতে অপূর্ব।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

"বন্দেমাতরম" গান সম্বন্ধে আন্দোলন

"বন্দেমাতরম" গানটির বিরুদ্ধে অভিযান হওয়ায় এবং কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক কমিটি ঐ গানটি সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা দেশে প্রতিক্রিয়াজনিত বিক্ষোভ ও আন্দোলন দেখা যাইতেছে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। দুঃখের সহিত এই আন্দোলনের একটি অবাঞ্ছনীয় বিশিষ্টতার উল্লেখ করিতে হইতেছে। কাহারও সহিত মতের অনৈক্য হইলে তাহার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগ করা উচিত, ব্যক্তিগত

আক্রমণ অনুচিত। হীন অভিসন্ধি আরোপ যদি অগত্যা করিতেই হয়, তাহা হইলে সেরূপ অভিসন্ধি আরোপের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করা কর্তব্য। তর্কবিতর্কের উদ্দেশ্য সত্যের ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। যেরূপ আক্রমণ ও অভিসন্ধি আরোপের কথা বলিতেছি, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সভা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা সর্বাংশে একমত নহি কিন্তু আমরা মনে করি, তাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাস বশতঃ কর্তব্যবোধে এইরূপ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "বন্দেমাতরম" সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরোপ স্থলবিশেষে তর্কবিতর্কের রীতি লঙ্ঘন এবং শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এরূপ আক্রমণে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতা

"বন্দেমাতরম্" সম্বন্ধীয় আন্দোলন সম্পর্কে কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথবিরচিত জাতীয় সংগীতগুলির বিরুদ্ধে এই মর্মের কথাও বলিয়াছেন, যে, তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নাই, স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার জন্য মানুষ সেগুলি হইতে কোন প্রেরণা পায় না! রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা চান না, কোন সমালোচক যে একথা বলেন নাই, ইহাও সমালোচকদের দয়া বলিতে হইবে। উত্তেজনার সময় মানুষের মনের সত্যানুভূতির শক্তি হ্রাস পায়।

রবীন্দ্রনাথের তিন খণ্ড "গীতবিতান" গ্রন্থের শেষ খণ্ড ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। এই তিন খণ্ডে মোটামুটি ১৬০০ গান আছে। ১৩৩৯ সালের পরও তিনি বিস্তর গান রচনা করিয়াছেন। সবগুলি হইতে জাতীয় সংগীতগুলি বাছিয়া লইয়া সেগুলির সম্বন্ধে সরাসরি রায় দেওয়ার কাজে আমরা প্রবৃত্ত হইব না।

মাঘ, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথের "প্রান্তিক"

পৌষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রান্তিক" নাম দিয়া তাঁহার আঠারটি নূতন কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকটি ছাড়া কবিতাগুলি তাঁহার কঠিন পীড়ার পর রচিত। আখ্যাপত্রের আগের একটি পৃষ্ঠায় ভূমিকাস্বরূপ কবির হস্তাক্ষরে এই কথাগুলি মুদ্রিত আছে :—

"অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরব দিগন্ত পানে
পাঠাইল অন্তিম পূরবী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

খ্রীস্টের জন্মদিন বলিয়া খ্রীস্টীয় জগতে যে ২৫শে ডিসেম্বরে উৎসব হয়, সেইদিন পুস্তকখানির শেষ দুটি কবিতা কবি লিখিয়াছিলেন। একটিতে কবি বলিতেছেন :—

"যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তি গুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমংগলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাংগে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণ বিক্ষেপ, বক্ষে আলিংগিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল ; সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ নির্দেশ

রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ এক ওষ্ঠ অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এদিকে দানব-পক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

ফাল্গুন ১৩৪৪

শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা

মিঃ সি. এফ. এণ্ডরুজের পৌরোহিত্যে সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে যে হিন্দী ভবন প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, নানা কারণে তাহা উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে বাঙালীদের মনে ঔৎসুক্যের ও একাত্ম বোধের অভাব, এই অপবাদ সর্বাংশে সত্য না হউলেও অনেকাংশে সত্য, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অন্য প্রদেশীয়েরা বাঙালীর প্রতি সদয় মনোভাব সম্পন্ন কি না, সে আলোচনা এখানে করিয়া লাভ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অখণ্ড ঐক্যের কথা বিস্মৃত হইয়া আমাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক অতীতে অ-বাঙালীদের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়াছি, এ কথা ঠিক। রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা ও কর্মে, সামাজিক উন্নতি প্রচেষ্টায়, শিল্প কলায় ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশই আধুনিককালে অগ্রণী হইয়াছে; ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ; এই শ্রেষ্ঠতাভিমান আমাদিগকে অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উদাসীন করিয়া রাখিয়াছে। গত কয়েক বৎসর সর্বভারতীয় ব্যাপারে কোণঠাসা হইয়া থাকায় এই অভিমান এখন বাহিরে সর্বদা প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু ইহার মূল

নষ্ট হয় নাই। সর্বভারতীয় ব্যাপারে অন্যপ্রদেশীয়গণ কর্তৃক বাঙালীদের কোণঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টার অন্যতম কারণও আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ।

সাহিত্যের কথা ধরা যাক। বাংলা সাহিত্য শ্রেষ্ঠ, অতএব অন্য প্রদেশের লোকেরা ইহা পড়িবেই, আমাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অন্যপ্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের যেন কোন খোঁজও লইবার দরকার নাই, তাহাতে ভালমন্দ কি আছে না আছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন কৌতূহল বোধ পর্যন্ত নাই। বাঙালী গ্রন্থকারদের বহু রচনা ভারতীয় অন্যান্য বহুভাষায় অনূদিত কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্য প্রদেশের আধুনিক গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কোন আলোচনা তেমন হয় নাই। এমন হইতে পারে, যে, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ বা সংকলনের যোগ্য আধুনিক গ্রন্থাদি যথেষ্ট সংখ্যক নাই। কিন্তু সে কথাটা আমরা আলোচনা দ্বারা পরখ করিয়া ততটা দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ, যতটা অনুমান করিয়া বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

তারপর বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র আচার ব্যবহার সামাজিক রীতিনীতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও আমাদের ঔদাসীন্য যথেষ্ট।

একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ আমাদের অজ্ঞতা সামান্য বিষয় ও দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে দিয়াও পরিস্ফুট। বিভিন্ন স্থানের ভাষা পার্থক্য অনুসারে কংগ্রেসের স্বকীয় নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে ভারত বর্ষের প্রদেশসমূহ বিভক্ত, এবং ভবিষ্যতে সরকারী বিভাগেও এই ভাষা পার্থক্য অনুসারে প্রদেশসমূহের বিভাগ অনেকে চান। কিন্তু আমাদের মধ্যে সুশিক্ষিত অনেকেও অবগতই নহেন, যে দক্ষিণ ভারতে তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মলয়ালম প্রভৃতি বিভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত এবং ঐ সমস্ত ভাষা-গতভাবে তাঁহারা অভিহিত হইতে ইচ্ছা করেন; আমাদের অনেকের কথায় মনে হয়, তাঁহারা সকলেই 'মান্দ্রাজী' এবং তাহাদের সকলের ভাষাও 'মান্দ্রাজী', যদিও মান্দ্রাজী বলিয়া কোন ভাষা নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে আসন দিয়াছেন এবং ভারতীয় ভাষা সমূহে এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিয়া কোন কোন বাঙালী প্রতি বৎসর উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন। অন্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন অন্য প্রদেশের ভক্তদের বাণী ও জীবন সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা করিয়া ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাত্মা গান্ধীর পুস্তকাবলী বাংলায় অনুবাদ করিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত যোগাভিলাষীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তুলসীকৃত রামায়ণের কয়েকটি অনুবাদ আগেই হইয়াছিল, শিখদিগের জপজী প্রভৃতির অনুবাদও হইয়াছিল।

বাঙালীরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখুন, ইহা আমরা নিশ্চয়ই কাম্য মনে করি। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে উদাসীন ও অবজ্ঞাশীল থাকিয়া আমাদের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন কখনও সম্ভব নহে। বাংলাকে অন্য প্রদেশের নেতৃত্ব করিতে হইলে ভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। শ্রেষ্ঠত্ববোধের দ্বারা নহে।

হিন্দীকে আমরা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মানিয়া লই বা না লই, হিন্দী সাহিত্য উন্নত হউক বা না হউক, একথাও সত্য যে হিন্দী ভারতবর্ষের একটি প্রধান লোকসমষ্টির ভাষা। এজন্য হিন্দী ভাষা সুপরিচালিত হইলে, এবং ইহার কার্যক্রম বাঙালী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সুপরিব্যাপ্ত হইলে ইহা দ্বারা এই পারস্পরিক যোগরক্ষার কাজ অংশতও সুসম্পন্ন হইতে পারে।

ফাল্গুন, ১৩৪৪

"বিশ্বপরিচয়"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈজ্ঞানিক পুস্তক "বিশ্বপরিচয়" প্রথম প্রকাশিত হয় গত আশ্বিন মাসে। পৌষে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। চারি মাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা দেশে সাধারণতঃ হয় না। এই বহিখানির যে তাহা হইয়াছে, তাহা ইহার উৎকর্ষের পরিচায়ক। ইহার প্রথম সংস্করণের পরিচয় দিবার সময় ইহার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়াছিলাম। এবারেও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্রের আকারে ভূমিকা আছে এবং ভূমিকা, পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক ও উপসংহার, এই ছয়টি অধ্যায় আছে। বর্তমান সংস্করণে পুস্তকটি আগা

গোড়া সংশোধিত হইয়াছে। ইহা বালকবালিকাদের জন্য লিখিত হইলেও আমরা ইহাতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে 'গোল্ডেন বুক্ অব্ টাগোর' নামক ইংরাজী স্মারক গ্রন্থটির জন্য অনেক বিখ্যাত লোকের রচনা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সংগৃহীতও হইয়াছিল। মনে পড়ে, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তখন এই দুঃখ করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ অন্য বহু বিষয়ে পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নাই। বৈজ্ঞানিক কিছুও এখন তিনি লিখিয়াছেন।

ফাল্গুন, ১৩৪৪

হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

জীবন-ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়,
সংসার-যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক,
জরা-আচ্ছাদন তলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক।
নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।
২রা মাঘ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্র, ১৩৪৪

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাত্তর বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে একজন বড় চিত্র শিল্পী এবং মহানুভব ভদ্র ব্যক্তির তিরোভাব হইল। তিনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গে ও ভারতবর্ষে যে চিত্রাঙ্কন রীতি প্রবর্তিত করেন, তাঁহার অগ্রজ ঠিক সেই রীতির অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছবির অঙ্কনরীতি

কতকটা পৃথক পৃথক ছিল। ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছবি অঙ্কনে তিনি প্রতিভাশালী বড় ওস্তাদ ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে যাহা কিউবিষ্ট চিত্রাঙ্কনরীতি বলিয়া পরিচিত তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সেইরূপ একটি রীতি উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষে তিনি এ বিষয়ে এক ও অদ্বিতীয়।

"প্রাচ্য আর্টের ভারতীয় সমিতি"র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘকাল তাহার পরিচালক ছিলেন। এই সমিতি বহু ছাত্রকে আর্ট শিক্ষা দিয়া এবং চিত্র-প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়া বঙ্গে আর্ট শিক্ষা দিবার সহায়তা করিয়াছেন। এবং জনসাধারণকে আর্ট বুঝিতে ও তাহার রসাস্বাদন করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানা-গৃহে "বিচিত্রা" নাম দিয়া সাহিত্য ও আর্টের আলোচনা অনুশীলনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, গগনেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

চিত্রাঙ্কন ভিন্ন অভিনয়েও তিনি সুনিপুণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা"র অভিনয়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

তিনি সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের বদান্য উৎসাহদাতা ছিলেন। দুএক জনের পাকা ঘরবাড়ী কলিকাতায় নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন জানি। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও থাকিতে পারে।

দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনাদি কাজেও তিনি সাহায্য করিতেন। ইহা কম লোকেই জানে।

তাঁহাদের বাড়ীতে যে-সকল পুরাতন চিত্র ও অন্য বহুবিধ শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ আছে, তাহা খুব মূল্যবান।

গগনেন্দ্রনাথ মিষ্টভাষিতা ও সৌজন্যের দৃষ্টান্ত ছিলেন।

বৈশাখ, ১৩৪৫

নাগরী অক্ষরে বাংলা বহি ছাপাইবার প্রস্তাব

হিন্দীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা এবং নাগরীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রলিপি যাঁহারা করিতে চান, শ্রীযুক্ত কাকা কলেলকর তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তিনি সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে গিয়া হিন্দী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। শ্রোতারা সকলেই তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছিলেন কিনা, সংক্ষিপ্ত সংবাদে

তাহা লিখিত ছিল না। তিনি ভাল ভাল বাংলা বই নাগরীতে ছাপিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বলিয়াছেন তাহা হইলে ঐ সকল বহির অনেক অবাঙালী পাঠক জুটিবে। ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সকল বহি নাগরীতে ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।...

রবীন্দ্রনাথের বহি নাগরী অক্ষরে ছাপিবার প্রস্তাব একটা কথা মনে পড়াইয়া দিল। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস যখন তাঁহার বাংলা বহিগুলির প্রকাশক ছিল, তখন বাংলা গীতাঞ্জলির নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত একটি সংস্করণ ঐ প্রেস বাহির করিয়াছিল স্মরণ হইতেছে। উহার বিক্রী কিরূপ হইয়াছিল জানি না। মনে পড়িতেছে, শুনিয়াছিলাম বিশেষ কিছু হয় নাই। তাহা গীতাঞ্জলির দোষ নহে। হয় নাই দুটি কারণে, অনুমান করি। এক, বাংলা জানে ও পড়িতে চায় এরূপ হিন্দীভাষী লোকের সংখ্যা কম। দুই, বাঙালীর রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাবের সহিত হিন্দীভাষীদের রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাবের পার্থক্য আছে। এরূপ অনুমান করিবার একটা কারণ বলি। কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার বাংলা বহিগুলির হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের ও উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশও করা হইয়াছিল। অনুবাদ ভালই হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরে ন্যূনাধিক দুই শত চল্লিশ টাকার বিজ্ঞাপন দিয়াও বহিগুলির বিক্রী যত হইত তাহাতে কবির (বা আমাদের) মুনফার পরিমাণ দুই শত চল্লিশ টাকা হইত না। তাহার কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস উৎকৃষ্ট হইলেও হিন্দীভাষীদের রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাব বাঙালীদের রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাব হইতে অনেকটা ভিন্ন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

অবস্থা বিশেষে কর না-দিবার নৈতিক অধিকার

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবাসীর এই সংখ্যার অন্যত্র যে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, যে, রবীন্দ্রনাথ "প্রায়শ্চিত্ত" ও "পরিত্রাণ" নাটক দুটিতে, অবস্থাবিশেষে প্রজাদের রাজাকে বা রাষ্ট্রকে কর না দিবার নৈতিক অধিকার ঘোষণা ও সমর্থন করিয়াছেন। এই উক্তির সমর্থক দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কবির "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক তাঁহার "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" নামক আরও কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসের গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই নাটকটির বিজ্ঞাপনের তারিখ ৩১শে বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল। বহিখানি লিখিত হয় উনত্রিশ বৎসর পূর্বে, এবং মুদ্রিতও হয় ঐ সময়ে হিতবাদী প্রেস হইতে ও প্রকাশিত হয় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে। আমরা নিচে যাহা উদ্ধৃত করিব, তাহা "হিতবাদীর" এই পুরাতন সংস্করণ হইতে। নাটকটির কোন্ অঙ্কের কোন্ দৃশ্য হইতে আমরা কি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা বুঝাইয়া বলিবার স্থান নাই। বহিখানি ছোট, পাঠকেরা খুঁজিয়া লইতে পারিবেন।

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের এক দল প্রজা।

দ্বিতীয় প্রজা। বাবা আমরা রাজাকে গিয়ে কি বল্‌ব ?

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃতীয় প্রজা। যদি শুধোয় কেন দিবি নে ?

ধনঞ্জয়। বল্‌বে, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশী যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ প্রজা। বাবা, একথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়—তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না। ওরে জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম প্রজা। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই। তাঁর জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্।

ষষ্ঠ প্রজা। কিন্তু ঠাকুর আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয় । দেখ্ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না । যত দূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না । যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয় ।

আর এক অঙ্কের আর একটি দৃশ্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করি ।

প্রতাপাদিত্য । দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগ্‌লামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না । এখন কাজের কথা হোক্ । মাধবপুরের প্রায় দু-বছরের খাজনা বাকি—দেবে কিনা বল ।

ধনঞ্জয় । না মহারাজ, দেব না ।

প্রতাপ । দেবে না । এত বড় আস্পর্দ্ধা !

ধনঞ্জয় । যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না ।

প্রতাপ । আমার নয় !

ধনঞ্জয় । আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয় । যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি বলে !

প্রতাপ । তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে !

ধনঞ্জয় । হাঁ মহারাজ, আমিই ত বারণ করেছি । ওরা মূর্খ, ওরা ত বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায় । আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি —তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে ।

"পরিত্রাণ" নাটকটিও "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসের গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত । উপরে উদ্ধৃত কথাগুলির মতো আরো অনেক কথা তাহাতে আছে, স্থানাভাবে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না । পাঠকেরা তাহা হইতে সেগুলি সহজেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

বন্দিত্ব ও বন্ধনবরণের দৃষ্টান্ত

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের যে প্রবন্ধটি অন্য কয়েক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বলিয়াছি, যে, তাঁহার "প্রায়শ্চিত্ত" ও "পরিত্রাণ" নাটক দুটিতে বন্দিত্ব ও বন্ধন স্বেচ্ছাবরণের গৌরব ও আনন্দের বিবৃতি আছে

উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "প্রায়শ্চিত্ত" হইতে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিব, স্থানাভাবে "পরিত্রাণ" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে না।

প্রজার দল খাজনা না দিবার কথায় যখন ভয় পাইয়াছে, তখন সপ্তম প্রজা বলিল :—

৭। তোরা অত ভয় করচিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর। বেটারা তোরা কেবল বাঁচতেই চাস্—পণ করে বসেছিস্ যে মর্‌বি নে। কেন মরতে দোষ কি হয়েছে! যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি! ওরে সেই গানটা ধর্।—

(গান)

বল ভাই ধন্য হরি।
বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।
ধন্য হরি সুখের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্যপাটে
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে
ধন্য হরি, ধন্য হরি!
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে—
ধন্য হরি হাসিমুখে,—
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি, ধন্য হরি!
খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে
ধন্য হরি, ধন্য হরি!

ধন্য হরি স্থলে জলে
ধন্য হরি ফুলে ফলে—
ধন্য হৃদয়-পদ্ম-দলে
চরণ-আলোয় ধন্য করি ।

ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন বলিলেন তিনিই প্রজাদিগকে খাজনা দিতে বারণ করিয়াছেন, তখন প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" ধনঞ্জয় যথাযোগ্য উত্তর দিবার পর—

প্রতাপ। দেখ বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্চ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ বেটারা, আমি বলছি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী তুমি এইখানেই রইলে।

অর্থাৎ মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তাহাতে—

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে ত হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে! তোদের বুদ্ধি এখনো হল না। রাজা বল্লে বৈরাগী তুমি রইলে। তোরা বল্লি না তা হবে না—আর বৈরাগী লক্ষী ছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তারা থাকা না থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

(গান)

রইল বলে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
(তোমার) টানাটানি টিক্‌বে না ভাই
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তা করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে,
তিনি যা সন, সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,

অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাব্‌ছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপ। কি! হুকুমটা তোমার মনের মত হচ্ছে না বুঝি।

উদয়াদিত্য। মহারাজ, বৈরাগী ঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে!

ধনঞ্জয়। আমি বল্‌চি তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দু দিন রাজার কাছে থাকব। বেটাদের সেটা সহ্য হল না!

প্রজারা। আমরা এই জন্যেই কি দরবার করতে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়। দেখ্‌, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কিরে বেটা। আমাকে তোদের গাঁটে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা সব পালা।

আগুন লাগিয়া কারাগার ভস্মসাৎ হওয়ায় ধনঞ্জয় বৈরাগী বাহিরে আসিয়াছেন।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ! আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না; কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কি করে? তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। কদিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে—কোন ভাবনা ছিল না। এসব তার লুকোচুরি খেলা—ভেবেছিল পারবে লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু

ধরেছি, চেপে ধরেছি, তারপর খুব হাসি, খুব গান। বড় আনন্দে গেছে—আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে!

(গান)

(ওরে) শিকল তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহংকার।
তোমায় নিয়ে করে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার!
তোমার পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকেত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমাব সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ, অভাব কিসের? তোমায় সুখ দিতে পারেন, আর আমাকে সুখ দিতে পারেন না?

প্রতাপ। এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভাল—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই ত পথিক; আমরা কোথায় লাগি? তা হলে অনুমতি যদি হয় ত এবারকার মত বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেও না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি। যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না?

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসব এই বৎসর নানা কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার কঠিন পীড়ার পর ইহাই তাঁহার প্রথম জন্মদিনের উৎসব। তিনি এই প্রথম তাঁহার জন্মদিনের উৎসবে তাঁহার নবরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া রেডিয়ো-সহযোগে স্বদেশবাসীকে শুনাইয়াছেন (তাহার সম্পূর্ণ ও কবিকর্তৃক সংশোধিত পাঠ অন্যত্র মুদ্রিত হইল)। এমন সময় তাঁহার "জীবনস্মৃতি"র একটি নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হওয়া আনন্দের বিষয় হইয়াছে। ইহা পুস্তক-মুদ্রণের সাধারণ অক্ষর অপেক্ষা কিছু বড় অক্ষরে সুমুদ্রিত হইয়াছে। সবুজ রঙের কাপড়ের মনোজ্ঞ বাঁধাইটিও যেন গ্রন্থকারের কবিপ্রকৃতির চিরনবীনত্ব সূচনা করিতেছে।

"জীবনস্মৃতি" সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বহিখানি দেখিয়া মনে হইল। এই বহিখানিতে "কড়ি ও কোমল" বহিখানির কথা লিখিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছেন। সে মোটামুটি আধ শতাব্দী আগেকার কথা। অতএব তাঁহার জীবনের অধিক অংশের কথা তিনি জীবনস্মৃতির আকারে লেখেন নাই। কিন্তু অন্যভাবে তাঁহার নিজের জীবনের কথা তিনি কিছু কিছু বলিয়াছেন। যেমন, তাঁহার সপ্ততি-পূর্তির পর তাঁহাকে যত প্রকারে অভিনন্দিত করা হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে কিছু জীবনস্মৃতি আছে; চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেও কিছু জীবনস্মৃতি আছে। এইরূপ ভাষণগুলি সংগ্রহ করিয়া যদি ভবিষ্যতে "জীবনস্মৃতি"র পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে পাঠকেরা কবির স্বকথিত জীবনকথা একখানি বহিতে পাইতে পারেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র"

রবীন্দ্রনাথের গত জন্মদিন উপলক্ষ্যে রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অন্যত্র মুদ্রিতও হইয়াছে। কিন্তু পনর মিনিটে ত সব কথা সংক্ষেপেও বলা যায় না। তাই বিবিধ প্রসঙ্গের অন্যত্র অধিকন্তু কিছু বলিয়াছি। আর একটা অল্প জানা কথাও বলি; কারণ কলিকাতার অনেক কাগজওয়ালাই কিছু-না-কিছু বলিতেছেন।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র—

"From the start the child enters the Siksha Satra as an apprentice in handicraft as well as housecraft. In the workshop, as a trained producer, and as a potential creator, it will acquire skill and win freedom for its hands; whilst as an inmate of the house which it helps to construct and furnish and maintain, it will gain expanse of spirit and win freedom as a citizen of the small community."

তাৎপর্য্য। প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীসরূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকার অর্জন করিবে।

বিশ্বভারতীর ৯-সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাহাতে দেখাশুনায়, গৃহকর্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়া বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কি কি শিল্প শিখান যাইতে পারে, তাহার তালিকা আছে। লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁহারা শিক্ষাসত্র

সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ চান, তাঁহারা বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখিবেন।

বিশ্বভারতীর বুলেটিন দুটিতে শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হইয়াছে, তাহা এবং ইহার মূলগত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশু স্বভাব, বালস্বভাব ও মানব-মন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তাহা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই, কেন ইহার আদর্শ বহু স্থানে অনুসৃত হয় নাই, তাহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের দু-একটা অনুমান লিখিতেছি।

প্রথম অনুমান এই, যে, ইহার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোন রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই ;—ইহাতে বলা হয় নাই, যে, শিক্ষাসত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাইবে ও দেশ স্বাধীন হইবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ও অর্ধা স্বীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে - যেমন তাঁহার চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক অর্থনৈতিক যুক্তির সঙ্গে চরখা ও খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হইবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার চিঠি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে এই চিঠি লিখিয়াছেন :—

"সম্প্রতি আমার নববর্ষের বাচন ও জন্মদিনের কবিতা নিয়ে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা আমার অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। যখনি প্রথমে আমার নজরে পড়ল আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম. কিন্তু আকস্মিক দুর্যোগের ত্রুটি সংশোধনের সময় থাকে না। কবিতাটি অল্প পরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে—সেইটিকেই আমার অনুমোদিত পাঠ বলে গণ্য করবেন। এই সকল কারণেই মাঝে মাঝে আমার খ্য..ত নিয়ে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখলে আমি নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করি "

এই চিঠিখানি আমরা .৮ মে ২.শে বৈশাখ পাইয়াছি।

আষাঢ়, ১৩৪৫

বিদ্যাসাগর ও তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনকে লিখিয়াছেন :—

"বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ড পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁরই বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা। অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব যাঁর চরিত্রে দীপ্তিমান হয়ে দেশকে সমুজ্জ্বল করেছিল, যিনি বিধিদত্ত সম্মান পূর্ণভাবে নিজের অন্তরে লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তির দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে। এই অগৌরব থেকে বিস্মৃতিপরায়ণ বাঙালীকে রক্ষা করবার জন্য যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের সকলকে সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দিই। ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫।"

আষাঢ়, ১৩৪৫

"কণিকা"

বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, এবং এখনও শুনিতে পাই, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে বঙ্গে বর্ষা না আসিলে লোকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়, সাধারণতঃ বর্ষা আসেও।

এখন ঘাটশিলায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মেঘে অম্বর মেদুর, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। এমন দিনে জ্যৈষ্ঠের ছাব্বিশ তারিখে রবীন্দ্রনাথের "কণিকা"র নূতন সংস্করণের বহি একখানি ডাকে আসিয়া পৌঁছিল। হঠাৎ মনে হইল, দেখি ইহাতে বর্ষার কথা কি আছে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে 'সেকাল' কবিতায় দেখি কবি বলিতেছেন, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে," তাহা হইলে

আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাক্‌ত নাকো
কিছুমাত্র ত্বরা।

কিন্তু এই বৃদ্ধ সম্পাদকের জন্ম কালিদাসের কালে হইলেও তাহার দশম রত্ন বা X তম রত্ন হওয়া ত ঘটিতই না, তাহাকে নিতান্তই বেকার হইতে হইত। কবির জীবনটি কি হইত এবং সম্পাদকের জীবনটা বাস্তবিক কি, ভাবিতে গিয়া দেখি, আষাঢ় মাসেও জীবনটাতে ঘড়ির কাঁটা কেবলই ত্বরা দিতেছে। বানপ্রস্থের ইচ্ছা খুবই হয়। কিন্তু দেখি, কবি "ক্ষণিকার"ই 'শাস্ত্র' কবিতায় ব্যবস্থা দিয়াছেন,

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

কবিকে লোকে ঋষিও বলে, সুতরাং তাঁহার আর্ষ-প্রয়োগও শাস্ত্রোক্ত বিধির মত মান্য। তাহা হইলে "ত্রিষাতুরোধেব" সম্পাদকের বনে যাওয়াও ঘটিবে না। যায় কোথা? 'মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া'র যে ব্যবস্থা কবি আর একটি কবিতায় করিয়াছেন, তাহার মাতাল সাধারণ মদ্য পান করে না, কবিতা বা অন্য কোন রকম ভাবের ও রসের নেশা করে। বৃদ্ধ স ্পাদক বাস্তব বা রূপক কোন নেশাই কখনও না-করায় তাহার পাতাল পানে ধাওয়াও ঘটিবে না।

সুতরাং বর্ষার ও আষাঢ়ের সন্ধানে আরও পাতা উল্টানই ভাল।

কবি কালিদাসের কালে জন্মিলে

বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রৈত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গণিত বসে।

দিন গণনা এখনও চলিতেছে। কবে ফুরাইবে?

কাল্‌কে রাতে মেঘের গরজনে,
রিমিঝিমি বাদল-বরিষণে

ভাব্‌তেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্তি ধরে
বাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।

পাতা উল্টাইয়া দেখি কবি বলিতেছেন,

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহিরে।

আর একটি কবিতায় কবি ক্ষমা চাইতেছেন—

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।

কবির বাল্যকালের—

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

'সুখ দুঃখ' কবিতায় বর্ষাকালেরই রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলায়

সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

আর,

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মত
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি,
একটি রাঙা লাঠি কিন্‌বে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ
হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

শ্রাবণ, ১৩৪৫

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ও সংমিশ্রণ সংঘটন সম্বন্ধে ত্রিশ বৎসর পূর্বে "পূর্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ তাঁহার "সমাজ" নামক পুস্তকে আছে। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন :

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।...

দক্ষিণ ভারতে রাণাডে পূর্বপশ্চিমের সেতুবন্ধন কার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব, রাণাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল।...

অল্প দিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই

বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।...

একদিন—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন—সেই দিন হইতে বঙ্গ সাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গ সাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত সদ্যঃপ্রকাশিত "বাংলা কাব্যপরিচয়" গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন, যে এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই।...

বঙ্কিম এক দিন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ নিয়ে নিবেদন করেছিলেন বাংলা ভাষাভারতীকে। বলা বাহুল্য, তার ভাব, তার ভংগী, তার ছাঁচ ইংরাজী সাহিত্যের অনুবর্তী। পণ্ডিতেরা তার ভাষারীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, সমাজদরদীরা তাকে নিন্দা করেছেন এই বলে যে, সামাজিক রীতিপদ্ধতি থেকে এই সব গল্প দেশের মন ভুলিয়ে নিয়ে তাকে

অশুচি করে তুলেছে। কিন্তু দেখা গেল প্রবীণ নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরাও পুত্রবধূদের অনুরোধ করতে লাগলেন এই সব বই তাঁদের পড়ে শোনাতে। বটতলার ছাপা পুরাণ-কথা থেকে তাঁদের দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমা ক্রমশই পথান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিদেশী আমদানী ভালো লাগা উচিত নয় বলে এদের প্রতি অরুচি জন্মাতে কেউ পারলে না।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মন্তব্য 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র'* নামক নূতন প্রকাশিত পুস্তকে দেখিলাম। গ্রন্থকার লিখিতেছেন :—

> ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে লিখিত 'ছিন্নপত্রে'র একখানি চিঠিতে আছে, "বঙ্কিমবাবু উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে ; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোক হতে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতির এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড-কর্মশীল-পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।"

শ্রাবণ, ১৩৪৫

"রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র"

"রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্রে"-র লেখক লিখিয়াছেন :—

> এই শান্ত বাঙালীর কাহিনী রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভালো করে আঁকলেন আমাদের সাহিত্যে। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পেলাম সেই চিরদিনের বাঙলাকে যেখানে নদীর ঢালু তটে চাষী চাষ করে, ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরস্থলে হাঁস উড়ে চলে, যেখানে

*রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : নবজীবন পাব্লিশিং হাউস, ১৯৫/২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

চোখে জাগে নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, নাকে আসে প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধ, কানে শোনা যায় ঘাটের মেয়েদের উচ্চ হাসি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর। ইত্যাদি।

গ্রন্থকার নিপুণ শিল্পীর মত দেখাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের পল্লীগ্রামের কেবল যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিই আঁকিয়াছেন তাহা নহে, সেখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা নানাশ্রেণীর নানা মানুষের সম্পূর্ণ সহানুভূতি সমবেদনা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছবিও আঁকিয়াছেন। ইহা দেখানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা উঠলে এমন কথা আজও শুনতে পাওয়া যায়—তিনি শহরের বিলাসী কবি, নগরের অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃত্রিম জীবনের সঙ্গেই তাঁর লেখনীর কারবার। এই ধারণা ভুল। কতখানি ভুল তারই পরিচয় দেবার জন্য একদা লেখা হয়েছিল এই প্রবন্ধগুলি. পল্লীর প্রকৃতি আর পল্লীর মানুষের প্রতি যে বিপুল দরদ প্রকাশ পেয়েছে কবির অসংখ্য গল্পে, প্রবন্ধে ও কবিতায়—তার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি বিশাল সত্য। এই সত্যটি হোলো দুনিয়ার যারা অনাদৃত আর শৃংখলিত তাদের প্রতি তাঁর অন্তহীন সমবেদনা।

গ্রন্থকার অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

বাঙলাদেশের জনসাধারণের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে রবীন্দ্রনাথকে ভাল করে অধ্যয়ন করবার একান্ত প্রয়োজন আছে। বাঙলা দেশের পল্লীর প্রকৃতি ও মানুষের ছবি তাঁর সাহিত্যে যে-রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, তার সত্যসত্যই তুলনা নেই। তাঁর সাহিত্য চিরদিন বেঁচে থাকবে—কারণ সেই সাহিত্যের মূল রয়েছে জনসাধারণের জীবনের মধ্যে, বাঙলা দেশের মাটির অভ্যন্তরে ; তাঁর সাহিত্য অমর হয়ে থাকবে। কারণ তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার পথকে প্রশস্ত করেছেন।

আমরা গ্রন্থকারের সহিত এ বিষয়ে একমত, যে, "বাংলা সাহিত্যের ললাটে গণতন্ত্রের জয়মাল্য পরিয়েছেন যিনি, এই গণতান্ত্রিক যুগে তাঁর সাহিত্যকে নূতন দৃষ্টি দিয়ে অধ্যয়ন করবার দিন এসেছে।"

শ্রাবণ, ১৩৪৫

শান্তিনিকেতনের মৌলানা জিয়াউদ্দিন

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনের মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে কি যে ক্ষতি হইল বলিতে পারি না। তিনি ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আমানুল্লার আমলে কাবুলে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বহু বৎসর বিশ্বভারতীতে ইসলামীয় সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকের কার্য যোগ্যতার সহিত করিতেছিলেন। কয়েকখানি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহি তিনি লিখিয়াছিলেন। তিনি বাংলা জানিতেন এবং বাঙালীদের সহিত বাংলাই বলিতেন। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা তিনি উর্দু ও ফারসীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সামাজিকতার ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য শান্তিনিকেতনে লোকপ্রিয় ছিলেন। ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন।

তাঁহার পূর্বপুরুষেরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল অমৃতসরে। সেইখানেই টাইফয়েড জ্বরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

ভাদ্র, ১৩৪৫

"বাংলা কাব্য-পরিচয়"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনির্বাচিত কাব্য-সংগ্রহে পূর্ণ ও সুমুদ্রিত তাঁহার সম্পাদিত "বাংলা কাব্য-পরিচয়" গ্রন্থে নিম্নলিখিত "নিবেদন" মুদ্রিত করিয়াছেন :—

> কোনো একটি মাত্র সংস্করণে এ-রকম কাব্য-সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হোতেই পারে না। বাংলা কাব্য-পরিচয়ের এই প্রথম সংস্করণে নিঃসন্দেহেই অনেক অভাব রয়ে গেছে। অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন

যোগ্যতর হোতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হন নি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।

আধুনিক কবিতার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, সুতরাং তার সংগ্রহ ভাবী সংস্করণে পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করবে, এই প্রত্যাশা সংকলন কর্তার মনে রইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই সংগ্রহ-পুস্তকখানির ভূমিকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

...

ভাদ্র, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথকে চিয়াং-কাই-শেকের চিঠি

রবীন্দ্রনাথ চীন জাতির সহিত সমবেদনা ও একাত্মতা প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরে চীনের প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাই-শেক তাঁহাকে "গুরুদেব" সম্বোধন করিয়া চীন যে তাঁহার বাণী হইতে কত উৎসাহ পাইয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।—প্রাচীনতম-সভ্যতা-বিশিষ্ট চীন ও ভারতবর্ষের প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ চীনে গিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সেই সম্পর্ক বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ভাদ্র, ১৩৪৫

রবীন্দ্রসাহিত্যের 'চোরাই' হিন্দী অনুবাদ

বিশ্বভারতীর আর্থিক রিপোর্টে দেখিলাম, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের চব্বিশটি 'চোরাই' হিন্দী অনুবাদের খোঁজ পাইয়াছেন। তাঁহার এবং অন্য বাঙালী লেখকদের লেখারও এরূপ অনুবাদ ভারতের নানা ভাষায় হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না।

আশ্বিন, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীকে য়োনে নোগুচির চিঠি

জাপানী কবি য়োনে নোগুচি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীকে

জাপানের যুদ্ধের সমর্থক আলাদা আলাদা যে দুইটি চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা তিনি অনেক সম্পাদককেও পাঠাইয়াছেন। আমাদিগকে প্রেরিত চিঠিটার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি না। কবি ও গান্ধীজী জবাব দিলেই যথেষ্ট হইবে। তবে, দরকার হইলে পরে আমরাও কিছু লিখিব।

কার্তিক, ১৩৪৫

বাংলা সাহিত্যে বৃটিশ শাসনের স্তুতিনিন্দা

…জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের এবং রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির উৎসাহে ও সাহায্যে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গান

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রিদিন ঝরিতেছে লোচন-বারি"।

—গীত হয়। হিন্দুমেলার আর একটি গান ছিল গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে।" হিন্দুমেলার গোড়ার দিকে এক বৎসর শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নামে প্রসিদ্ধ) ১৯ বৎসর বয়সে একটি৪০০ পংক্তির ১০০ কলির দীর্ঘ কবিতা পড়েন। তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম কলি এইরূপ :—

বঙ্গবাসী! আর কত থাকিবে নিদ্রায় রে,
থাকিবে নিদ্রায়?
জাগ জাগ নারীনর উঠে বাঁধ পরিকর,
অলসে পড়িয়া আর কেন রে শয্যায়?
জন্মে নাকি বীর পুত্র বঙ্গের উদরে রে,
বঙ্গের উদরে!
আমরা কি চিরদিন হয়ে আছি পরাধীন।
চিরদিন আছি কিরে হতমুখ করে?

রবীন্দ্রনাথ প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে একটি কবিতা লিখিয়া হিন্দুমেলায় পাঠ করেন। উহা বাইশটি কলিতে বিভক্ত এবং দৈর্ঘ্যে ৮৮ পংক্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন শোভাসম্পদ বর্ণনার পর তিনি লিখিয়াছিলেন,

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়,
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসিখুসি আর লাগে না ভাল ।
অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক, ভারত কানন,
চন্দ্রসূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্ ।

"বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ" নামক একটি পুস্তক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহা বেআইনী ও নিষিদ্ধ পুস্তক সমূহের তালিকাভুক্ত করিয়া তাহার প্রচার বন্ধ করিয়াছেন। স্বয়ং কবি কিন্তু এই পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। অবশ্য বহিটির নামকরণ তিনি করেন নাই। তাঁহার স্বদেশী যুগের বহু উদ্দীপক গান কে না জানে? ১৯১৭ সালে তাঁহার বয়স ছিল ৫৬ বৎসর, এবং তাহার পূর্বেই তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের পরিচায়ক বহু কবিতা ও গদ্য রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন।...

পৌষ, ১৩৪৫

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয়ের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই এখনও অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি যে-সব চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, তাহার যতগুলি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়, প্রবাসীতে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার শিক্ষিত সমাজে ইঁহাদের উভয়ের বন্ধুত্ব সুবিদিত। ইদানীং উভয়ের বয়োবৃদ্ধির এবং কার্যবাহুল্য ও অবসরের স্বল্পতা হেতু তাঁহাদের পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ কচিৎ হইত। কিন্তু তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা ঠিক হইবে না যে, আচার্য বসু বিখ্যাত হইবার পর আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রাণের টান অনুভব করিতেন না, কিংবা যৌবনবন্ধুকে ভুলিয়া থাকিতেন।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের একখানি চিঠি আমরা সম্প্রতি শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়ার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহা এত দিন শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তের নিকট ছিল। বসু মহাশয়ের 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর এই চিঠি খানি লিখিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঐ বহি একখানি উপহার পাঠান—

কলিকাতা. ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৮

বন্ধু,

সুখে দুঃখে কত বৎসরের
স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক
সময় সে সব কথা মনে পড়ে।
আজ জোনাকির আলো
রবির প্রখর আলোর নিকট
পাঠাইলাম।

তোমার
জগদীশ

এই চিঠির উল্লেখ করিয়া লেডী বসু মহোদয়া 'প্রবাসী'র সম্পাদককে জানাইয়াছেন, "তাহা হইতে বুঝিবেন যে ওঁর কার্যে সফলতার মধ্যেও ওঁর বন্ধুত্ব অটুট ছিল।" তাহার পর লেডী বসু যাহা জানাইয়াছেন তাহাতে আচার্য বসুর বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা আরও স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় :—

"জীবনের শেষ বৎসরও উনি প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর,

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

এর মধ্যে শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন।"

"উনি আজীবন কবির গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সর্বদাই বলিতেন যে, কবির মতন সর্বতোমুখী প্রতিভা বিরল, প্রায় দেখা যায় না।"

পৌষ, ১৩৪৫

কলিকাতায় শ্রীনিকেতন পণ্যভাণ্ডারের উদ্বোধন-উৎসব

বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার-বিভাগ, শ্রীনিকেতন পল্লীস্বাস্থ্যপুনরুদ্ধার, কৃষির উন্নতি, লুপ্ত শিল্পের পুনঃ প্রবর্তন ও নূতন শিল্পের প্রচলন সম্বন্ধে যে বহুবিধ আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার পরিচয় পূর্বে একাধিকবার 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সংলগ্ন কক্ষে, শ্রীনিকেতনের গৃহশিল্পজাত নানা প্রয়োজনীয় ও মনোরম দ্রব্যাদির একটি ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের উদ্বোধন করেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। বর্তমান দেশে পল্লীসংস্কারের যে উদ্যোগ চলিতেছে, চিন্তায় ও কর্মে রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম প্রধান ও প্রথম পথ-প্রবর্তক। সুভাষচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্বে তিনিও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশসেবার বিষয়ে উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন। নানারূপ ভাবধারার সংঘাত তখন দেশে চলিতেছে; কবির নিকট হইতেও কবিজনোচিত উদ্দীপনাময়ী বাণীই তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শুধু গ্রামসংগঠনের কথা—এই নীরস কথা শুনিয়া সেই তরুণ বয়সে তাঁহারা মোটেই প্রীত হন নাই। কিন্তু যত দিন যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চব্বিশ বৎসরের বহু উদ্ধকাল হইতেই রচনায় ও ভাষণে পল্লীসংস্কারের একান্তকর্তব্যতার কথা বলিয়া আসিতেছেন। শুধু কথা নয়, গত ১৬ বৎসর যাবৎ, শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়া বিস্তৃত ভাবে এ বিষয়ে নানা আয়োজনও করিয়াছেন। তাহার পূর্বেও খণ্ড খণ্ড ভাবে পল্লীসংস্কারের চেষ্টা অন্যত্র করিয়াছিলেন। কবি হইয়াও তিনি এই নীরস কর্তব্যের ভার কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে, এবং পল্লীগঠন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার, সুন্দর একটি বিবরণ আছে, এই ভাণ্ডার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রচিত তাঁহার অভিভাষণে :—

কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষার জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কি রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে, অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।···সেই দিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবি কল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক।

···বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়? যাই হোক অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করিনি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হত।

···প্ল্যান ছিল না বটে কিন্তু দুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার "সাধনা" যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্র ব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টোপথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশঃ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ উৎসবেরও সেই দশা। সেই জন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরাও যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না—একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দ প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্প পল্লবে, আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল

লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে লুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপ সৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দ প্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।...

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করি নি। আমরা জানি যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চ-চূড়ায় উঠেছিল। তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ উৎকর্ষ কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজনদরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বনিগবৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়।

যারা স্থূল পরিমাণের পূজারি তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ সুতরাং সমস্তদেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। একথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

এই অভিভাষণের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের এই অংশের উল্লেখ করিয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভাষণে যাহা বলেন, সে সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন, যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্তমান থাকিবে না, ইহা মিথ্যা কথা। ইহাতে শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অবিনশ্বর। হয়ত ইহার বর্তমান আকার (শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন) স্থায়ী না হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্য অংশ ভিন্ন আকারে চিরস্থায়ী হইবে।

কোনও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে যদি শাশ্বত সত্য থাকে, তবে সেই সত্যটি যে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে চিরস্থায়ী এবং যে মূল প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া সেই সত্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবে বিনষ্ট হইলেও পরে অন্য প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া যে সে-সত্যটি প্রকাশিত হইতে পারে, এইটুকু তত্ত্বগতভাবে বুঝিবার মত দার্শনিকতা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু

সেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতার পক্ষে শুধু এই তত্ত্বটি সব সময়ে যথেষ্ট সান্ত্বনা-দায়ক নহে। সত্যের অবিনশ্বরতার তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথেরও জানা আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছে; এবং পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'সত্য' খুঁজিয়া পাইলে, তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে ও রাষ্ট্রপ্রধানকে তাহার বাস্তব স্থায়িত্বের ভারগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেশের পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্র নাথকে তত্ত্বকথার পরিবর্তে তাঁহার বাঞ্ছিত আশ্বাস দিতে পারিলে ভাল হইত —অবশ্য সুভাষচন্দ্র ইহাতে 'শাশ্বত সত্যের' সন্ধান পাইলে। আর্থিক দিক দিয়া শ্রীনিকেতন এখনও একজন বিদেশীর দানেই প্রধানতঃ পরিচালিত হইতেছে।

কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের পণ্যভাণ্ডারে প্রাপ্তব্য আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মাঘ, ১৩৪৫

শান্তিনিকেতনে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা

সম্প্রতি স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা বিশ্বভারতী দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্দেশে যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন, নীচে তাহা মুদ্রিত হইল।

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য কল্যাণীয়েষু

আজকের এই অস্তোন্মুখ সূর্যের মতোই আমার হৃদয় আমার জীবনের পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তার আশীর্বাদ বিকীর্ণ করছে।

তোমার সঙ্গে আজ আমার এই মিলন আর একদিনকার শুভ সম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সেকথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবার উপলক্ষ্য ঘটল বলে আমি আনন্দিত। তখন তোমার জন্ম হয় নি, আমি তখন বালক। একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে,

কেবল আমাকে এইকথা জানাবার জন্যে যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম। প্রত্যাশা করিনি এবং এই বহুমানের যোগ্যতা লাভ করবার দিন তখন অনেক সুদূরে ছিল। তারপরে স্বাস্থ্যের সন্ধানে কার্সিয়ঙে যাবার সময়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডেকে নিয়েছিলেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতেন প্রিয় বয়স্যের মতো। তাঁর সংগীতের জ্ঞান অসাধারণ ছিল। কিন্তু আমার সেই কাঁচা বয়সের রচিত ছেলেমানুষি গান তিনি আদর করে শুনতেন, বোধহয় তার মধ্যে ভাবী পরিণতির কোনো একটা সম্ভাবনা প্রত্যাশা করে। এ যেন কোন্ অদৃশ্য রশ্মির লিপি অঙ্কিত হয়েছিল তাঁর কল্পনার পটে। আজ সকলের চেয়ে বিস্ময় লাগে এই কথা মনে করে যে, বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে মহারাজার মনে যে সকল সংকল্প ছিল আমাকে নিয়ে তার পরামর্শ করতেন এবং আমাকে সেই সাহিত্য অনুষ্ঠানের সহযোগী করবেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন। তার অনতিকাল পরেই কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হল। মনে ভাবলুম এই রাজবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধসূত্র এইখানেই অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তা যে হোলো না সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর। তাঁর অভাবে ত্রিপুরায় আমার যে সৌহৃদ্যের আসন শূন্য হোলো মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সমাদর পেয়েছিলুম তা দুর্লভ। আজ একথা গর্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্তমান ভারতবর্ষের কোনো রাজকুল আজ পর্যন্ত পান নি। এই সম্মেলনের যে একটা ঐতিহাসিক মহার্ঘতা আছে আশা করি সে কথা তুমি উপলব্ধি করেছ। যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা রাজারা তাকে রাজৈশ্বর্যের প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করতেন তোমার পিতামহেরা সে কথা মনে মনে জানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, এবং সে সম্বন্ধ অত্যন্ত

সত্য ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির দাক্ষিণ্য সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ। আজ তুমি বর্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছ, এই উপলক্ষ্যে তুমি আমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ।

৮।১।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহারাজা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদের যথাযোগ্য উত্তর দেন। ত্রিপুরার একটি প্রশংসনীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহার সমুদয় রাজকার্য বাংলায় হয়, বার্ষিক রিপোর্ট এবং সেন্সস রিপোর্টও বাংলায় লিখিত হয়।

মাঘ, ১৩৪৫

"সাম্যবাদের গোড়ার কথা"

"সাম্যবাদের গোড়ার কথা" বহি নিষেধমুক্ত হওয়া ভাল খবর। "বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ" বহিটি কেন নিষেধমুক্ত হইবে না?

ফাল্গুন, ১৩৪৫

শান্তিনিকেতন কলাভবনের চিত্রপ্রদর্শনী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রমেশ-ভবনে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে বিশ্ব-ভারতীর কলাভবনের চিত্রপ্রদর্শনী হইয়াছিল। ইহাতে ১২ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত ২৪ খানি ছবি সমেত মোট ২৮১ খানি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ছাত্রছাত্রীরা কলাভবনের ছাত্রছাত্রী নহে, শান্তিনিকেতনের সাধারণ বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে চিত্রাঙ্কনও শিখিয়াছে, তাহার প্রশংসনীয় পরিচয় তাহাদের প্রদর্শিত ছবিগুলিতে পাওয়া যায়।

সমঝদার লোকেরা রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিগুলি এবং কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের আঁকা বহু চিত্র দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা বড় একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ছবি আঁকেন, তাহা সর্বসাধারণের জানা ছিল না। তাঁহার আঁকা ছবিগুলি বেশ—বিশেষতঃ গিরিনদীর চিত্রটি।

ফাল্গুন, ১৩৪৫

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব

বিশ্বভারতীর পল্লীসংগঠন বিভাগ সুরুল গ্রামে অবস্থিত। পল্লীসংগঠন প্রতিষ্ঠানটির নাম শ্রীনিকেতন। এই নামটি যে সুপ্রযুক্ত, তাহা যাঁহারা আগে বুঝেন নাই তাঁহারাও শ্রীনিকেতনের গত বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারিবেন। তিনি উহাতে এই মর্মের কথা বলিয়াছিলেন যে, পল্লীগ্রামের লোকেরা কৃষিজাত জিনিষ আরও বেশী পাইবে, তাহারা আরও বেশী কাপড় বুনিবে ও অন্যান্য শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করিবে, সুস্থ থাকিবে—কেবল ইহাই আদর্শ নহে। গ্রামগুলিতে শ্রী ফিরিয়া আসা চাই, সেগুলি সুশোভন এবং আনন্দমুখরিত হওয়া চাই ; যে পল্লীসাহিত্য ও পল্লীগীতি অধুনা লুপ্ত প্রায়, তাহাকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

অতি বিলম্বে রবীন্দ্রনাথের কাজের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহাতেও তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে একটি বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে, অন্য সাধারণ লোকদের মত তিনিও একজন সাধারণ লোক বলিয়া কবির মহৎ ও অখণ্ড আদর্শ বুঝিতে পারেন নাই। ইহা বলা নিশ্চয়ই নম্রতাব্যঞ্জক। কবির সমগ্র অখণ্ড আদর্শ যে মহৎ এবং তাহার সম্যক উপলব্ধি কঠিন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহার প্রত্যেক খণ্ডই আমাদের মত সাধারণ লোকদের অবোধ্য, তাহা বিনয়ের খাতিরেও স্বীকার করিতে পারি না। সুভাষবাবুর মত নেতার পক্ষেও প্রত্যেকটিই অবোধ্য কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁহার কথাই প্রামাণিক।

শ্রীনিকেতনের গোড়া হইতেই শ্রীযুক্ত এল. কে এল্মহার্স্ট্ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। তাঁহার পত্নী ও তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বার্ষিক কুড়ি হাজার ডলার শ্রীনিকেতনে দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা হেতু ষোল হাজার ডলার করিয়া দিতেছেন। এক ডলার মোটামুটি তিন টাকার সমান।

এল্মহার্স্ট সাহেব শ্রীনিকেতনের গোড়ার দিকে উহার পরিচালকতা করিতেন, সাধারণ চাষীমজুর মেথরের কাজও করিতেন। শ্রীনিকেতনের আদর্শ তাঁহার এরূপ প্রিয় ছিল যে, ইংলণ্ডে তাঁহাদের গ্রামস্থ বাসভবনের সংলগ্ন স্থানে শ্রীনিকেতনে যেরূপ কাজ করা হয়, সেইরূপ কাজ করাইয়া থাকেন।

বিদেশীরা বিশ্বভারতীর আদর্শ কার্যতঃ যতটুকু বুঝিয়াছেন আমরা তাহা বুঝিতেই পারি না ইহা বিনয়পূর্বক বলিলেই দায় মুক্ত হইতে পারে না।

চৈত্র, ১৩৪৫

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া ও ভগিনী দ্বিতীয়া

যত দূর মনে পড়ে, যখন যুবক ছিলাম তখনই মনে মনে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলাম যে, যদি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে বড়ো ভাইয়ের এবং ছোটভাইয়ের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেইদিন বা অন্য কোনদিন বড় বোনের সংবর্ধনা ও ছোট বোনের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন কেন অনাবশ্যক মনে হয়। হয়ত সঙ্গীদের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকিব। নিজের সম্পাদিত বা অন্যের সম্পাদিত কোন-না-কোন কাগজে এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াও থাকিতে পারি—এখন তাহা মনে নাই।

আগামী ভাইদ্বিতীয়া আসিতে এখনও অনেক মাস বাকী। কিন্তু 'প্রবাসী'র গতসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের "ভাই দ্বিতীয়া" কবিতা হই : দুই জায়গায় কিছু উদ্ধৃত করায় এই উৎসবের কথাটা বারবার মনে হইতেছে। তাই আমাদের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিব মনে করিলাম।

কবি ঐ কবিতায় লিখিয়াছেন বটে, "সংসারে বোনটি নেহাৎ অতিরিক্ত"। কিন্তু তাহা তাঁহার মত নহে। সমাজে নারীরা যেরূপ ব্যবহার পায়, তাহারই সংক্ষিপ্ত সূচনা ঐ কয়টি কথাতে আছে। নারীরা নেহাৎ অতিরিক্ত ত নহেনই; তাঁহারা অত্যাবশ্যক। তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছিল্য, তাঁহাদের প্রতি অযত্ন যে সমাজে হয়, তাহার অধোগতি ও শক্তিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইলে ও তাহার প্রতিকার না হইলে তো সমাজের অধঃপতন নিশ্চিত।

কবি তো নূতন উৎসব কয়েকটিই শান্তিনিকেতনে চালাইয়াছেন। তিনিই ভগিনীদ্বিতীয়াও (বা তৃতীয়া, বা চতুর্থী, বা পঞ্চমী,···) চালাইলে ভাল

হয়। যত রকম শক্তি ও বহুমুখী প্রতিভা থাকিলে একটি উৎসবকে সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন, সুশোভন ও আনন্দদায়ক করা যায়, তাহা তাঁহার আছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাদির সমালোচনা

...১৩৪৪ সালের ২০শে চৈত্র তারিখের "যুগান্তর" কাগজে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্ন্যালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটির প্রধান বিষয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাহার শেষ অনুচ্ছেদ এই :—

> কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভাল হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড় দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসবার পক্ষে এই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের লেখা এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে শরৎবাবুর যে-যে বহির নিন্দা শোনা যায়, কবি তাহার একখানিও পড়েন নাই।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

বাংলা ছড়া ও নারী নিগ্রহের প্রাচীনতা

রবীন্দ্রনাথের "আকাশ প্রদীপ" গ্রন্থে ও তাহার পূর্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :—

> "ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
> সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদের মেলে।"

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখিনে আজ ছবিটা তার কিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করল মেয়ে
এই বারতা ধুলোয় পড়া শুক্‌নো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত
এই কটা তার শব্দ মাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরাদিন কোন খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।

যে রকম খবরের টানে সেই মরা নদী 'সজীব' বর্তমানে এসে পড়ে, কবি তার একটা নমুনা এই কবিতাতেই দিয়াছেন :—

বিকেল বেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টনটনানি,
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চট্‌কা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে,
ঝুড়ি ভরে মুড়ি আন্‌ত, আন্‌ত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার আনিটা।
ঐ যে অন্ধ কলু বুড়ির কান্না শুনি,—
কদিন হোলো জানিনে কোন গোঁয়ার খুনী
সমথ তার নাৎনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্‌ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে
যৌবন তার দলে গেছে জীবন গেছে চুকে।

বুক ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্র মানা আস্তিকতা ধূলোতে যায় উড়ে,—
উপায় নাইরে, নাই প্রতিকার, বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ায় ছন্দে মিলে,
"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে"
"সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।"

বঙ্গে 'বুক ফাটানো এমন খবর' শত শত শোনা যায়; কিন্তু সত্য সত্য 'বুকে বাজে টনটনানি' কয় জনের? যাদের বা বাজে, তাঁরা শোনেন, 'উপায় নাইরে, নাই প্রতিকার'।

নারী নিগ্রহের প্রতিকার, নারী নিগ্রহের অন্ত কি হইবে না?

যে কবি প্রাচীন খবরের সঙ্গে নূতন খবরের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, পুরুষকার ও নারীর নারীত্ব যাহাতে জাগে, এমন বাণীও তিনি অনেক শুনাইয়াছেন। কিন্তু এখনও "সজীব বর্তমানে" সচেতন হইয়াছেন অল্প লোকেই। গভীর পরিতাপের বিষয়।

আষাঢ়, ১৩৪৬

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী

আমরা অবগত হইলাম, আগামী মাঘ মাসে ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মের পর এক শত বৎসর পূর্ণ হইবে। যাঁহারা তাঁহার পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসব করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাঁহারা শুধু তাঁহার রচনার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে জানেন নাই, অধিকন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহার পাদমূলে বসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ত এরূপ স্মৃতি উৎসব চাহিবেনই। প্রধানতঃ এই উৎসব শান্তিনিকেতনেই হইবার কথা। অন্যত্রও হইবে। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে নিভৃতে থাকিতে ভালবাসিতেন। জীবনের শেষ বহু বৎসর শান্তিনিকেতন পল্লীতে যাপন করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি কবি ও দার্শনিক বলিয়া সাহিত্যরসগ্রাহী ও

দার্শনিকজ্ঞানলিপ্সুদিগের নিকট পরিচিত। তিনি রাষ্ট্রনীতিতে কখনও সক্রিয়ভাবে যোগ দেন নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতাকামী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মত তিনি সমর্থন করিতেন। মহাত্মাজী তাঁহার সমর্থন পাইয়া উৎসাহ বোধ করিতেন।

যাঁহারা কবিতা, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি—কোন কিছুরই ধার ধারেন না, তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋষিপ্রতিম জীবন, বালকের মত সরল হৃদয়, ও সকল জীবে প্রীতির কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া ও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার সরল অট্টহাস্য তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় দিত।

তিনি রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা বলিয়া এণ্ড্রুজ সাহেব ও আরও অনেকে তাঁহাকে বড়দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

আষাঢ় ১৩৪৬

শান্তিনিকেতনের কলেজ

বিশ্বভারতীর যে শিক্ষালয়টিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ছাত্র ও ছাত্রীদিগেকে প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম পাঠ ভবন। তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষালয়টিকে বলা হয় শিক্ষাভবন। আমরা ইহাকেই চলিত ভাষায় শান্তিনিকেতনের কলেজ বলিয়াছি। এই দুটি শিক্ষালয় ব্যতীত শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর উচ্চতর একটি অংশ অ[illegible] তাহা বিদ্যা-ভবন। এখানে সাংস্কৃতিক (cultural) গবেষণা হইয়া থাকে।

আগামী ১ লা জুলাই বিশ্বভারতীর শিক্ষাবৎসর আরম্ভ হইবে। তদুপলক্ষ্যে এখানকার কতকগুলি সুবিধার কথা ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবক বর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

অন্য সকল স্কুল কলেজে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানেও তাহা দেওয়া হয়। অধিকন্তু বিশ্বভারতী আবাসিক প্রতিষ্ঠান (residential institution) বলিয়া, ছাত্রছাত্রীদের পরস্পর সাহচর্য ও অধ্যাপকবর্গের সংস্পর্শ লাভের সুযোগ এখানে অধিক।

বিশ্বভারতীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যাহা শিখিতে হয়, তাহা ছাড়া চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলা

নন্দলাল বসুর মত শিল্পাচার্যের পরিচালনায় শিখিতে পারা যায়। তদুপরি যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীত শিখিবার সুব্যবস্থা আছে। যাঁহারা নৃত্য শিখিতে চান, তাঁহারা সুরুচিসঙ্গত উৎকৃষ্ট নৃত্য এখানে শিখিতে পারেন।

কলিকাতার মত বড় শহরের অনেক আকর্ষণ আছে যাহার সহিত মফঃস্বলের কোন জায়গার প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। কলিকাতার মত উন্মাদক বিরাট রাজনৈতিক সভা শান্তিনিকেতনে হইতে পারে না। এইজন্য বহু ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে কলিকাতার আকর্ষণ বেশী। কিন্তু রাজনীতি শিক্ষার পক্ষে যেরূপ রাজনৈতিক বক্তৃতা, বিতর্ক সভা, আলোচনা আবশ্যক, তাহা শান্তিনিকেতনে হইতে পারে ও হয়। কলিকাতার বড় বড় ফুটবল ম্যাচ শান্তিনিকেতনে হয় না, কিন্তু খেলা খুব হয়, ম্যাচও হয়; এবং খেলায় সকলেরই যোগ দিবার সুবিধা শান্তিনিকেতনে কম নয়—বোধ হয় বেশী। খেলা দেখায় আমোদ অবশ্যই আছে—সে সুখ শান্তিনিকেতনেও পাওয়া যায়; কিন্তু নিজে খেলিতে পারিলে তবে খেলার সুখ ও উপকার দুই-ই পাওয়া যায়।

কলিকাতার একটা বড় আকর্ষণ সিনেমা। সিনেমার সমালোচনা না করিয়াও ইহা বলা যায় যে, তাহার সবটাই ভাল নহে। উহা হইতে যখন যতটুকু নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, শান্তিনিকেতনের নৃত্য সম্বলিত অভিনয়, শুধু অভিনয় নয়, এবং বৎসরের কয়েকটি ঋতু-উৎসব হইতে তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের অভিনয় দেখিবার জন্য কলিকাতার লোকদিগকে টাকা খরচ করিতে হয়, শান্তিনিকেতনে বিনা ব্যয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা তাহা উপভোগ করেন।

কলিকাতায় শান্তিনিকেতনের যেসব ঋতু উৎসব হয় (এবং নৃত্যগীত অভিনয়াদিও যাহা হয়), তাহাতে শান্তিনিকেতনের উৎসবের প্রধান যে অঙ্গ, তাহা থাকে না। তাহা প্রাকৃতিক পটভূমিকা। এই পটভূমিকার অভাবে যে কোনো ঋতু উৎসব সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা শহুরে মন লইয়া বুঝা যায় না, শহুরে মনকে বুঝানও কঠিন। কলিকাতায় অমাবস্যা পূর্ণিমা দুই সমান। এখানে প্রকৃতির নানা রূপ, নানা বেশ, নানা রসপরিবেষণ আমাদের অগোচর। শান্তিনিকেতনে থাকিয়া নববর্ষা সমাগম দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনি তাহা ভুলিতে পারিবেন না।

প্রকৃতির নিবিড় ঘনিষ্ঠ সঙ্গ শান্তিনিকেতনের সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা

মূল্যবান সুবিধা। এই সঙ্গ পরীক্ষায় বেশী মার্ক পাইতে সমর্থ করেনা বটে, শহরের চিত্ত বিক্ষেপের কারণগুলির মত অসমর্থও করে না।

ভারতবর্ষের নানা অংশ ও ভারতবর্ষের বাহিরের নানাদেশ হইতে মানুষ আসে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক দর্শন ও সংস্পর্শ লাভের আশায়। শান্তি-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের এই সৌভাগ্য অপেক্ষাকৃত অল্পয়াসে বহুবার ঘটিতে পারে। যখন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা দিতেন ও চিত্ত বিনোদন করিতেন, সেদিন এখন নাই বটে, কিন্তু এখনও তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার রচনা পড়িয়া শুনান, আবৃত্তি করেন এবং অভিনয়াদি শিক্ষা দেন।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রীরা নির্মল উন্মুক্ত প্রান্তরে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে বেড়াইয়া দেহমনকে সুস্থ রাখিতে পারেন। এ সুবিধা কোন শহরে হইতে পারে না। এখানে বড় লাইব্রেরী, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির সংগ্রহ, ইলেকট্রিক লাইট, জলের কল, ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি শহরের সুবিধা আছে, আবার পল্লীজীবনের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শও আছে।

শুধু সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ নহে। পল্লীসংস্কার ও পল্লী উন্নয়ন সম্বন্ধে যে সব বড় কথা শুনা যায় বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে তাহা কাজে করা হয় ও শিখান হয়। যাঁহারা সাধারণ শিক্ষালাভ করেন, তাঁহারা সংগীতাদির মত এগুলিও শিখিতে পারেন।

কাগাওআ জাপানের একজন জগদ্বিখ্যাত জনহিত কর্মী ও শান্তিকামী। তিনি কয়েকমাস পূর্বে যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে কাগাওআ বলেন, বাংলা দেশে তিনি গোসাবা দেখিতে যাইবেন (যেখানে সর ডানিয়েল হামিল্টনের জমিদারী ও তাঁহার মতানুযায়ী আদর্শ গ্রাম আছে)। গান্ধীজী প্রশ্ন করেন, "শান্তিনিকেতন যাইবেন না?" তিনি 'না' বলায় গান্ধীজী বলেন, "গোসাবা গোসাবা, কিন্তু শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষ" ("Well Gosaba is Gosaba, but Santiniketan is India") ইহার অর্থ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা এখানে করা চলিবে না। দু একটা কথা মাত্র বলি। শান্তিনিকেতনে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের ছাত্রছাত্রী একত্র শিক্ষা পায়, অধ্যাপকদের মধ্যেও কয়েক প্রদেশের লোক আছেন নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও সংস্কৃতির চর্চা এখানে হয়। তাহার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরের কোন কোন অধ্যাপকও

এখানে কাজ করেন। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি চৈনিক। তাহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ চীনভবনে করা হয়। এখানে যেমন ভারতভক্তি সেইরূপ বিশ্বমৈত্রীরও অনুপ্রাণনা ও সৌরভ অনুভূত হয়।

বিশেষ কোন ধর্মমত প্রচারের স্থান ইহা নহে। কিন্তু ধর্মভাব পরিপুষ্ট করিবার ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় আশ্রমসচিবকে চিঠি লিখিলে বেতন, শিক্ষণীয় বিষয় ও নিয়মাবলী জানিতে পারা যায়।

আষাঢ়, ১৩৪৬

"ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে"

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' শীর্ষক যুগোপযোগী কবিতাটি নিশ্চয়ই বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয়ও উক্ত কবিতাটির আংশিক সমালোচনা করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রাচীন যুগের ছড়ার ভিতর দিয়াও যে নারী নিগ্রহের প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়, উক্ত কবিতার দ্বারা তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে ছড়াটিকে অবলম্বন করিয়া কবির এই অমূল্য কবিতাটি রচিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের নরনারীদের মধ্যে অনেকেরই জানা না থাকিতে পারে। তবে উহা যে এক সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গে প্রচলিত ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী। তাঁহার কবিতাটি পড়িয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহাদের অঞ্চলে (পশ্চিম বঙ্গে) প্রাচীনকালে এই ছড়াটি প্রচলিত ছিল, কিংবা হয়ত এখনও আছে। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের ঢাকা ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় বর্তমান যুগেও প্রাচীনারা উক্ত ছড়াটি আবৃত্তি করিয়া ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া থাকেন অর্থাৎ 'ঘুমপাড়ানি গান' হিসাবে অদ্যাপি উহা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই ছড়ার কথাগুলি বঙ্গের বিভিন্ন অংশে মোটামুটি একই আকারে প্রচলিত কিনা তাহা জানি না সুতরাং তাহা যাচাই করিবার

উদ্দেশ্যে ঢাকা ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াটি যে আকারে প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল…

কম্‌লীলতা, কমলীলতা ।
জল শুকাইলে থাকবি কোথা
থাকুম থাকুম মাটির তলে ।
ফালা দিয়া উঠুম বর্ষাকালে ॥
অড়ম বিবির খড়ম পায় ।
লাল বিবির জুতা পায় ॥
চল্‌ লো বিবি ঢাকা যাই ।
ঢাকা যাইয়া শ্রীফল খাই ।
সেই ফলের বোঁটা নাই ॥
ঢাকিলা ঢাক বাজায় খালে বিলে ।*
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাইতের মেলে ॥
সুন্দরীর লো মা ।
পাটকাপড়খান পরাইয়া দিলা
দেখতে দিলা না ॥
আগে যদি জানতাম ।
ডুলি ধইর‍্যা কান্দতাম ॥

বঙ্গের বিভিন্ন জেলার অধিবাসিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে এই ছড়াটি কি আকারে প্রচলিত ছিল কিংবা আছে, তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হয় ।

শ্রাবণ, ১৩৪৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রণীত "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ৭৯ ও ৮০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দেখিলাম ।

---

* পাঠান্তর—"ঢাকিরা ঢাক বাজায় বুন্দার খালে" ।

(এই রচনাটি "আলোচনা" পর্যায় হইতে উদ্ধৃত)

"'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ "প্রবাসী"তে লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র 'প্রবাসী'তে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হল যে, তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক করে যেন পূর্বাহ্নে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত করলে তবেই সে উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবে,— এ সর্তে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে 'প্রবাসী'তে রচনা পাঠাতে তাঁকে বারং বার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই 'প্রবাসীতে' কখন কোন রচনা দেন নি"।

ইতিপূর্ব্বে (১৩৪৬ সালের ২৩শে আষাঢ়ের পূর্বে) এই বহিখানি ও ইহাতে লিখিত এই কথাগুলি আমি দেখি নাই। এই জন্য ইতিপূর্বে এগুলির প্রতিবাদ করি নাই। ২৩শে আষাঢ় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎবাবুকে কস্মিন্ কালেও 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, কাহারও মারফৎও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই। তাঁহার উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশও করি নাই। সুতরাং "তিনি যা লিখিবেন তার একটি চুম্বক করে পূর্বাহ্নে" আমাকে পাঠাইতেও কখনও বলি নাই।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও পরে বারংবার নিষেধ করেন, ইহা আমি পূর্বে কখনও শুনি নাই। সেই জন্য এই খবর সত্য কিনা জানিবার নিমিত্ত কবিকে আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিত তাঁহার চিঠিটি নীচে মুদ্রিত হইল।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক

খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্য মরতে আমার সংকোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মত ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?

৯।৭।৩৯ আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কাল্পনিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, "প্রবাসী"তে শরৎ-বাবুর উপন্যাস প্রকাশের জন্য আমার আগ্রহ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের তাঁহাকে "প্রবাসী"তে লিখিতে অনুরোধ, শরৎবাবুকে তাঁহার উপন্যাসের চুম্বক পূর্বাহ্ণে আমাকে পাঠাইতে বলা, তাহাতে তাঁহার অপমানিতবোধ করা ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুণ্ণ হওয়া, এবং শরৎবাবুকে রবীন্দ্রনাথের, একবার নয়, 'বারংবার' প্রবাসীতে লিখিতে নিষেধ করা—সর্বৈব মিথ্যা।

এই কাল্পনিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইত, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত মোকাবিলার উপায় নাই। অতএব, এইখানেই ইতি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্র, ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর অনুকরণে বিপদ, এবং তাঁহারও মুশকিলের সম্ভাবনা!

আমরা যখন কলেজে পড়িতাম তখন কোন কোন যুবককে রবীন্দ্রনাথের মত লম্বা চুল রাখিতে দেখিয়াছিলাম—একজনের ত 'রবিচ্ছায়া' ব্যঙ্গনামই হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু এই কুন্তলানুকারীদের সংখ্যা খুব কম ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাংলা হস্তাক্ষরের নকল অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি লোকে করিত এবং এখনও অনেকে করে। কিন্তু ত.'তে কাহাকেও বিপদে পড়িতে হইয়াছে আগে কখনও শুনি নাই। সম্প্রতি দুটি বি. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্র রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর নকল করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল, খবরের কাগজে এইরূপ

সংবাদ বাহির হইয়াছে। তাহারা উভয়েই পাস হইবার মত নম্বর পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হাতের লেখা ঠিক একরকম হওয়ায় পরীক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় সন্দেহ করেন যে তাহারা প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্ত কোনো অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবে। এই জন্য পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের সঙ্গে তাহাদের নাম প্রকাশিত হয় নাই। পরে তাহারা যথেষ্ট প্রমাণ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্তুষ্ট করে যে তাহাদের প্রত্যেকের উত্তর নিজের লেখা এবং উভয়েই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর অনুকরণ করিয়াছে। তখন তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর অনেকে নকল করায় তাঁহারও মুশকিল কখনও যে না হইতে পারে এমন নয়। কখনও হইয়াছে কিনা জানি না। হাতের লেখা তাঁহার মত করিয়া কোনও কবিযশঃপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা নিজের বলিয়া দাবী করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না। মামলা-মোকদ্দমায় বা অন্যবিধ ব্যাপারে যাহা তাঁহার স্বাক্ষরিত দলিল বা অন্যবিধ লিপি নহে তাহা তাঁহারা বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা তাঁহার হস্তাক্ষরভক্তদের দ্বারা হইবে না, কারণ তাঁহারা কোন কু-অভিপ্রায়ে তাঁহার হস্তাক্ষর নকল করেন না। কিন্তু হস্তাক্ষরের নকল যে কেবল সৎলোকেরাই করিতে পারে, এমন ত নয়!

ভাদ্র, ১৩৪৬

শান্তিনিকেতনে বোধিদ্রুমের শাখা রোপণ

শান্তিনিকেতনে বর্তমান বৎসরের বর্ষামঙ্গলের বিশেষত্ব সেখানে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের একটি শাখা রোপণ। আভাগড়ের রাজা বাহাদুর ইহা রোপণ করেন। হয়ত এতদ্বারা অনভিপ্রেতরূপে নূতন তীর্থের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

ভাদ্র, ১৩৪৬

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন রচনা কেন যে প্রবাসী পত্রিকায় কখনও প্রকাশিত হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমার 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে যাহা

লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শ্রাবণের প্রবাসীতে দেখিলাম আপনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একখানি পত্রও উহার সমর্থনে (১) মুদ্রিত করিয়াছেন। 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক হিসাবে এ বিষয়ে আমার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সুসাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফত একখণ্ড পুস্তক প্রবাসীতে সমালোচনার জন্য আপনাকে পাঠানো হইয়াছিল। (২) কিন্তু উহার কোনও সমালোচনা বা প্রতিবাদ সে সময়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই। হইলে একটা সুবিধা আমার এই হইত যে, প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগের ভূতপূর্ব সহকারী বন্ধুবর চারু বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছু সত্যের আলোকপাত করিতে পারিতেন। কারণ, প্রবাসীর পক্ষ হইতে লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করা এবং রচনার চুম্বক চাওয়া সম্পর্কে আমি শরৎচন্দ্রের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, চারুচন্দ্রের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের জীবনীতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সত্য এবং প্রকৃত ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রবাসী সংক্রান্ত এই ব্যাপার যে শরৎচন্দ্রের আরও একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আত্মীয় ও অন্তরঙ্গগণও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন এই সঙ্গে প্রেরিত প্রমাণপত্রখানি হইতে আপনি তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হইতে পারিবেন। (৩) এবং ইহাও বুঝিতে আপনার অসুবিধা হইবে না যে 'শরৎচন্দ্র ও প্রবাসী' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা সত্য বলিয়া জানিয়া ও বুঝিয়াই লিখিয়াছি। 'সর্বৈব মিথ্যা বা 'কাল্পনিক' কিছুই লিখি নাই।

কিন্তু শ্রাবণের প্রবাসীতে আপনি যাহা বলিয়াছেন এবং পূজনীয় কবি যাহা লিখিয়াছেন, উহা পড়িয়া স্বতঃই মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, তবে কি আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে কোথাও কিছু গলদ আছে? জীবনীকারের কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমি এ সম্বন্ধে যাঁহাদের নিকট হইতে সত্য নিরূপক তথ্য কিছু পাওয়া সম্ভব এরূপ কয়েক জনের সহিত ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ করিয়াছি। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল এবং তাঁহার প্রথম ও শেষ জীবনের দুঃখ সুখের সঙ্গী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয় যিনি শরৎচন্দ্রের একখানি সুবৃহৎ জীবনী রচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তিনি বলেন প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ চুম্বক দেখিতে চাহেন বলিয়া শরৎকে চারুচন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং শরৎ এই ঘটনা কবিকে জানাইলে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া শরৎকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এই দুইখানি চিঠিই তিনি স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। তবে, তাঁহার মনে হয় ইহা হয়ত চারুচন্দ্র নিজের দায়িত্বে করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আপনি এ সম্বন্ধে কিছু না জানিতেও পারেন। (৪)

আমি কিন্তু চারুচন্দ্রের জামাতা শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাবা জীবনের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলাম যে তিনি এবং চারুচন্দ্রের পুত্র কন্যাও চারুচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছেন যে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসীতে প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনিই করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবাসীর কর্তৃপক্ষের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। (৫)

অতঃপর আমি শরৎচন্দ্রের সহোদর প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাই। তিনি বলেন, প্রবাসীতে লিখিবার জন্য চারুচন্দ্রের আমোল হইতে এই সেদিনও পর্যন্ত একাধিক বার দাদাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। (৬) কয়েক বৎসর পূর্বেও সামতাবেড়ের বাড়ীতে রামানন্দবাবুর পুত্র অশোকবাবু, জামাতা কালিদাস নাগ মহাশয় এবং প্রবাসীর তদানীন্তন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় দাদার নিকট প্রবাসীর জন্য লেখা চাহিতে আসিয়াছিলেন। (৭) দীর্ঘকাল আমাদের উহারা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু কাগজ দুইখানি বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দাদাকে লিখিত অনেক পত্রই আমাদের সামতাবেড়ের বাড়ীতে আছে। আমি একদিন সময় মত সেখানে গিয়া সেগুলি খুঁজিয়া দেখিব। এ সম্পর্কে লিখিত কবির পত্রখানি যদি পাই, আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ যিনি ভূতপূর্ব 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কর্ণধারস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বঙ্গবাসীতে দীর্ঘকাল ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনিও এ ঘটনা সমর্থন করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তেও এরূপ ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। সুতরাং এ সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা নির্ণয় একটা জটিল ও কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূজনীয় কবির চিঠির মধ্যেও একটি লাইনে একটু যেন গোল রহিয়াছে

বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যাপারটা যে সময়ের, শরতের সঙ্গে তখন আমার আলাপ ছিল না।" কিন্তু ব্যাপারটা যে কোন্ সময়ের আমার গ্রন্থে তাহার কোথাও কোন উল্লেখ নাই। কারণ, শরৎচন্দ্র কোন সন তারিখ বা নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করিয়া আমাদের কাছে উহা বলেন নাই। তাই মনে হয় আপনার পত্র পড়িয়া কবি সম্ভবতঃ কোথাও কিছু বুঝিতে ভুল করিয়া থাকিবেন। কবিকে লিখিত আপনার পত্রখানি এই প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে এ সমস্যার হয়ত কতকটা নিরসন হইতে পারিত। (৮) যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য আমি শীঘ্রই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিব। বহুদিন পূর্বের এই এক তুচ্ছ ঘটনা বহুকার্যে-ব্যাপৃত কবির স্মৃতি হইতে অপসৃত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এবং ইহাও আমি অসম্ভব মনে করি না যে প্রবাসীসংক্রান্ত এ ব্যাপারটা হয়ত আপনার জ্ঞাতসারে ঘটে নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান আবশ্যক। উহার পরে যদি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারি যে এ ব্যাপার প্রকৃতই সত্য নহে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, "সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র" গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহা স্থান পাইবে না। আপনার মন্তব্যের মধ্যে দেখিলাম আপনি এ সম্বন্ধে কিছু সত্য পরিজ্ঞাত আছেন এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরলোকগত বলিয়া তাহা বলিতে বিরত হইয়াছেন। আমার মনে হয় আপনার এ যুক্তি ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণের সত্যসন্ধানে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। উহা প্রকাশ করিয়া বলাই বোধ হয় সংগত। (৯) ইতি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রবাসী পত্রিকায় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন রচনা কখনও প্রকাশিত হয় নাই কেন, এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রণীত 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের মুখ হইতে এই ঘটনার অবিকল (১০) এইরূপ ইতিহাস আমরাও শুনিয়াছিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ (অধ্যাপক, গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল) সুধীরচন্দ্র সরকার (সম্পাদক, মৌচাক) শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক, বিচিত্রা) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল (সম্পাদক, বাতায়ন)

এই পাঁচজন ভদ্রলোকই শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রতিবাদটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিবার সুবিধার নিমিত্ত আমি উহার কোন কোন স্থানে একাদি সংখ্যা বসাইয়া ছাপিয়াছি। সংখ্যাগুলি মূল প্রতিবাদে নাই।

গোড়াতেই একটি কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানি এই প্রসংগে শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপিয়াছি, তাহার এই বাক্যটি তিনি পরে বাদ দিতে লিখিয়াছিলেন: "ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সংগে আমার আলাপ ছিল না।" কিন্তু তাঁহার সেক্রেটরি শ্রীঅনিলকুমার চন্দের এতদ্বিষয়ক পত্র যখন আমার হস্তগত হয়, তখন শ্রাবণের প্রবাসী বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহা বাদ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সেই আদেশের উল্লেখ করিলাম।

(১) নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের যে প্যারাগ্রাফটিতে আলোচ্য বিষয়টির বিবৃতি আছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কথা বিশেষভাবে লিখিত থাকায় আমাকে তাঁহার চিঠি তাঁহার অনুমতি লইয়া ছাপিতে হইয়াছে। নতুবা তাঁহার নাম এরূপ-ব্যাপারে আমি জড়িত হইতে দিতাম না।

(২) নরেন্দ্রবাবুর এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ আমি পাই নাই ও দেখি নাই। প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক মহাশয়েরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঐ বহি তাঁহাদিগকে কেহ দিয়াছিলেন বা তাঁহারা উহা দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনে পড়ে না। নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের আলোচ্য প্যারাগ্রাফটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইবার পর আমি উহার দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি বহি কিনাইয়া আনাইয়াছিলাম।

(৩) নরেন্দ্রবাবু যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, কল্পনা করিয়া বা বানাইয়া কিছু লেখেন নাই; ইহা বিশ্বাস করিতে কোনই বাধা নাই। সাক্ষী-দিগকে ও আমাকেও অবিশ্বাস করি না।

(৪) চারুবাবু শরৎবাবুকে কিছু লিখিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ও বলিতে পারি না। যদি তিনি চুম্বক চাহিয়া থাকেন, নিজের দায়িত্বে চাহিয়া থাকিবেন ; "প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ" অর্থাৎ সম্পাদক কখনও চুম্বক চান নাই।

এখানে আর একটি কথা বলা অনাবশ্যক হইবে না। চারুবাবুর যথেষ্ট সৌজন্য ও শিষ্টাচারবোধ ছিল। কাহাকেও নিজেই লিখিতে অনুরোধ করিয়া আবার আগাম চুম্বক পাঠাইতে বলা খুব শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া মনে করিবার মানুষ চারুবাবু ছিলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ।

(৫) "শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসীতে প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি [চারুবাবু] করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবাসীর কর্তৃপক্ষের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, একথা আমি এই প্রথম শুনিলাম ; আগে জানিতাম না। প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ ও মডার্ণ রিভিয়ুর কর্তৃপক্ষ এক। মডার্ণ রিভিয়ুতে সেই কর্তৃপক্ষ "বিন্দুর ছেলে"র অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ প্রবাসীতে শরৎবাবুর কোন লেখা, পাইবার বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেই কর্তৃপক্ষই ছাপিতে রাজী হয় নাই, ইহা তথ্য বলিয়া মানিতে হইবে দেখিতেছি।

এই কর্তৃপক্ষ আরও দু একটা কাজ করিয়াছিল। যেমন—

যখন শরৎবাবুর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হয়, তখন মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহার প্রতিবাদ যুক্তি সহকারে করা হইয়াছিল। এই প্রতিবাদের শেষ প্যারাগ্রাফে ছিল :—

> It will help our readers to understand the position of Babu Sarat Chandra as an author if we tell them that at Villeneuve, Switzerland, M. Romain Rolland told us in the course of our conversation with him that he had read the Italian translation of the English translation of Sarat Chandra's '*Srikāntā*' and he observed that the author was a novelist of the first order. As M. Rolland does not read or speak English, he had to form his judgement of Sarat Chandra's quality as a novelist from a translation of a

translation ; yet that was his opinion. But some underling of the Bengal Government has scented sedition in one of Sarat Chandra's works and so it is a book dangerous to society ! Or is it to the bureaucracy ?—The Modern Review for February, 1927, p. 261.

ফরাসী মনীষীর সহিত আমার কথোপকথনের এই অংশ জেনিভা হইতে প্রেরিত ও ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত সম্পাদকের চিঠিতেও বাহির হইয়াছিল। সেই প্রসিদ্ধ বিদেশীর কাছে শরৎবাবুর কোন গ্রন্থের এই আদরের কথা ইহার আগে বঙ্গে বোধ হয় কেহ জানিত না।

কোন লোকের কাছে লেখা চাওয়া দোষের বা লজ্জার বিষয় নহে। আমি শরৎবাবুর কাছে লেখা চাহিয়া থাকিলে তাহা অস্বীকার করিতাম না।

শরৎবাবুর মৃত্যুর কিছু পরে চারুবাবু তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ দেন এবং তাহার প্রুফও তিনি দেখেন। (শরৎবাবুর বন্ধু ও ভক্তদের মতে) বিশেষ গুরুত্ববিশিষ্ট এই বিষয়টির কোনই উল্লেখ ঐ প্রবন্ধে নাই। 'বিশেষ গুরুত্ববিশিষ্ট' এই জন্য বলিতেছি যে, তাঁহারা বলিতেছেন তাঁহারা অনেকেই জানিতে চাহিয়াছিলেন শরৎবাবুর লেখা প্রবাসীতে কেন বাহির হয় নাই।

(৬) "প্রবাসীতে লিখিবার জন্য চারুচন্দ্রের আমোল হইতে" শরৎবাবুকে একাধিক বার অনুরোধ যদি একাধিক ব্যক্তি করিয়া থাকেন, তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি কখনও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই, অন্যের দ্বারাও করাই নাই।

(৭) নরেন্দ্রবাবু শরৎবাবুর ভ্রাতা প্রকাশবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমান্ কালিদাস নাগ প্রভৃতির সামতাবেড়ে শরৎবাবুর বাড়ী যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা গিয়াছিলেন ইহা ঠিক। কখন ও কি জন্য গিয়াছিলেন, তাহা আমি তাঁহাদের যাইবার আগে ও ফিরিয়া আসিবার পরেও জানিতে পারি নাই। সুতরাং তাঁহারা আমার কোন শিষ্টাচারসম্মত নমস্কার সম্ভাষণাদি লইয়া যাইতে পারেন নাই, কোন অনুরোধ ত লইয়া যানই নাই।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে শরৎবাবুর সহিত কালিদাস প্রভৃতির সাক্ষাৎকারের একটি সচিত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু সাক্ষাৎকারের তারিখ নাই। তাহাতে শরৎবাবুকে কোন প্রকার অনুরোধ করার কথা

নাই। লেখাটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১লা প্রকাশিত জানুয়ারী সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ুতে থাকায় বোধ হইতেছে সাক্ষাৎকার ১৯২৬ সালের কোন সময়ে হইয়া থাকিবে। নভেম্বরে হইয়া থাকিলে আমি তখন ভারতবর্ষে ছিলাম না। লীগ অব নেশ্যন্স দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া যে জেনিভা গিয়াছিলাম, সেই বিদেশযাত্রা হইতে ১৯২৬ সালের ৩০শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

শ্রীমান কালিদাসকে এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করিযাছি। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, একযুগ কাটিয়া যাওয়ার পর সেই ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা সম্ভবপর নহে—যতটা মনে পড়ে তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ও তিনি অনেক-দিন হইতে শরৎচন্দ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। কালিদাস ১৯২৩ সালের শেষে বিলাত হইতে ফিরিবার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শরৎচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার গ্রন্থাদির ভাল অনুবাদ না হওয়ায় পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে তাঁহার যথোচিত আদর হইল না। ১৯২১-২৩ সালে ইটালী ভ্রমণকালে কালিদাস অধ্যাপক জি তুচ্চি ও অধ্যাপক বি, ফিল্লিপীর সহিত শরৎচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলাকার ফরাসী অনুবাদ শেষ হইলে ফিল্লিপী কালিদাসকে তাঁহার সহকর্মী হইয়া শরৎ-চন্দ্রের কিছু গল্প অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কারণে কালিদাস ইহার ভার লইতে পারেন নাই কিন্তু শরৎবাবু তাঁর সঙ্গে এই অনুবাদপ্রসঙ্গ একাধিক বার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি শরৎবাবুকে জানান শ্রীমান অশোক অনুবাদ ভাল করেন ও তৎকৃত অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপা হইতে পারে, এবং এই কাগজ মারফতে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের বাহিরে বহু সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কালিদাস প্রভৃতি সামতাবেড়ে গেলে শরৎচন্দ্রের সৌজন্যে ও আতিথ্যে যে মুগ্ধ হন তাহার প্রমাণ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত ও উপরে উল্লিখিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধে আছে। শরৎবাবু অশোককে 'বিন্দুর ছেলে' অনুবাদ করিতে বলেন। কালিদাস আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন যে প্রবাসীতে লেখা দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রের কোন কথাহয় নাই।

মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসী যে দীর্ঘকাল শরৎবাবুকে নমস্কার করিতে

যাইত, তাহার কারণ 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদ তিনি মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন, এবং আমি তাহার কোন আর্থিক প্রতিদান করি নাই।

৮। রবীন্দ্রনাথকে আমি যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহাতে নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের আলোচ্য প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়া আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম যে কবি কখনও শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিনা, এবং ঐ প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন কিনা। তাঁহার উত্তর আদ্যোপান্ত শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে।

তিনি যে চিঠিখানি দ্বারা উক্ত পত্র ছাপিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, নীচে তাহাও প্রকাশ করিতেছি।

ওঁ

Uttarayan

Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার চিঠি ছাপতে পারেন, আপত্তি নেই। জানাতে পারেন শরৎ কখনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি, আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি। ইতি ১১।৭।৩৯

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯। আমি 'জনশ্রুতিটির' উৎপত্তি সম্বন্ধে আগে যে কারণে কিছু লিখি নাই, এখনও সেই কারণে কিছু লিখিব না।

১০। নরেন্দ্রবাবু কতকগুলি ভদ্রলোকের সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। কারণ, আমি আসামী, আমার কথা নির্ভর যোগ্য না হওয়াই বোধ করি আইনসংগত।

কিন্তু অনেকের ইহা জানিবার কৌতূহল হইতে পারে যে, সাক্ষীরা দল বাঁধিয়া কোন একদিন কোন এক সময়ে নরেন্দ্রবাবুকে সংগে করিয়া সকলে একত্র শরৎবাবুর নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকে নিবদ্ধ কথাগুলি 'অবিকল' বলিয়াছিলেন না তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে একা একা গিয়া 'অবিকল' ঐ কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। ইহা জানিতে কৌতূহল হইতে পারে যে, তাঁহারা শরৎবাবুর কথাগুলি শুনিবামাত্র 'অবিকল' টুকিয়া রাখিয়াছিলেন কি না। আমি দেখিয়াছি, অনেক রিপোর্টার যে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লন তাহার রিপোর্টও ক্বচিৎ "অবিকল" ঠিক হয়, ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টারের রিপোর্ট কিছু ভিন্ন ভিন্ন হয়, "অবিকল" এক হয় না এবং আমরা প্রতিভাহীন লোকেরা একই ঘটনার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করিলে বর্ণনার খুঁটিনাটি ও ভাষায় কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতি অনুমান করিয়া তাঁহার কথা নির্ভরযোগ্য নহে, কার্যতঃ ইহাই বলা হইতেছে—যদিও তিনি এখনও নিজের জীবনের বহু কথা বলিতেছেন, এবং জড়বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ বহি লিখিতেছেন। ভুলিয়া যাওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই তাহা সম্ভব অথবা নিশ্চিত—নরেন্দ্রবাবু সম্ভবতঃ ইহা বলিবেন না; কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ পড়িলে এরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্যের বিষয় হইবে না।

অবশ্য, আসামী ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর সকলের কথাই যে নির্ভর যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কারণ, আমাদের দেশে যাঁহাদের কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া যায় এবং যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি সাতিশয় বলবতী, তাঁহাদের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষ্যে কিছু বলা অনাবশ্যক। তিনি জানেন যে ইহা গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদীযুগ। এখন পাটীগণিতের প্রাধান্য যতটা স্বীকৃত হয়, কোন প্রকার বৈয়ক্তিক বৈশিষ্ট্য ও অসাম্য সেরূপ স্বীকৃত হয় না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২৫ শে শ্রাবণ, ১৩৪৬

পুঃ—প্রবাসীর নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে আর কোন বাদপ্রতিবাদ প্রবাসীতে ছাপা হইবে না।

[শরৎচন্দ্র ও প্রবাসী সম্পর্কিত এই অংশটি 'আলোচনা'য় মুদ্রিত হয়। বিবিধ প্রসঙ্গে নয়]

আশ্বিন, ১৩৪৬

বিশ্বভারতীর "লোকশিক্ষা সংসদ"

বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর লোক-শিক্ষা সংসদ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মারফৎ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

আজকাল বাংলাদেশে সর্বত্র লোকের মধ্যে জ্ঞানলাভের একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। কিন্তু সকলের পক্ষে বিদ্যালয়ে যোগ দিয়া সে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নহে। এইজন্য আচার্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ভারতীর কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন ও সেই সঙ্গে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা সচিব মহাশয়কে একখানি পত্রে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

"দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাঁদের পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সন্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অন্যত্র লিখিয়াছেন,

'একদা আমাদের দেশে কাশী প্রভৃতি নগরে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতিরক্ষা ও শিক্ষাচর্চা নানা প্রণালীতে পরিব্যাপ্ত ছিল গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। আধুনিক কালের শিক্ষার কোনো উপায়ে এ দেশে তেমন করে যদি প্রসারিত করে না দেওয়া যায় তবে এ যুগের মানব সমাজে আমরা নিজের বিদ্যাগত যোগ রক্ষা করতে পারব

না ; এবং না-পারা আমাদের সকল প্রকার অকৃতার্থতা ও অপমানের কারণ হবে একথা বলা বাহুল্য।'

দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্য বিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দিষ্ট করিয়াছি যথেষ্ট মনোযোগপূর্বক পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কি না, এই প্রদেশ ব্যাপী নানাকেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রমাণ গ্রহণ হইবে। এই সকল কেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষার ভার গ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ বোধ করেন, তাঁহারা আপন অভিমত সহ পত্র লিখিয়া জানাইলে উপকৃত হইব।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, লোকশিক্ষা সংসদের পরীক্ষার্থিগণকে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত লোকশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পুস্তকগুলি শতকরা ২৫ টাকা হার কম দামে বিক্রয় করিবেন। যে সকল পরীক্ষার্থী এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চান তাঁহাদিগকে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের সম্পাদকের নিকট আগামী পরীক্ষার দক্ষিণার অর্ধেক অংশ (প্রবেশিকা ও আদ্য পরীক্ষার জন্য) যথাক্রমে ॥০ এবং :॥০ টাকা মণি অর্ডার যোগে পাঠাইতে হইবে। সম্পাদক সেই টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে রসিদ দিবেন তাহা পরীক্ষার্থিগণকে পুস্তকের অর্ডারের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে :—

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকা[illegible]।

আগামী ফাল্গুন মাসের শেষাংশে লোকশিক্ষা সংসদের প্রবেশিকা ও আদ্য পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার নিয়মাবলী ও পাঠ্যপুস্তকের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, লোকশিক্ষা সংসদের বিবরণী পুস্তিকার জন্য দুই আনার ডাক টিকিট সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন। সম্পাদক, লোকশিক্ষা সংসদ, শ্রীনিকেতন, পোঃ সুরুল, বীরভূম।

আশ্বিন, ১৩৪৬

বর্তমান সঙ্কটে ভারতের ও বৃটেনের কর্তব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে য়ুনাইটেড প্রেস প্রচার করিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "যুদ্ধ ও ভারতের কর্তব্য" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

এই মহাসংকটের সময়ে যখন কেবলমাত্র কয়েকটি দেশ নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্যতাসৌধ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন ভারতবর্ষের কর্তব্য সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের সমবেদনা পোল্যাণ্ডের সপক্ষে। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বলপ্রয়োগ দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের যে সর্বনাশী নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিবে। নিজের দেশের স্বার্থের জন্যও কোন ভারতীয় এইরূপ কামনা করিবে না যে, ইংলণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হউক। ইংলণ্ড যদি যুদ্ধে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা পড়িবে। তখন নূতন বৈদেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের দাসত্বের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষকে যদি অন্যান্য দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহাকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে হইবে।

ভারতবর্ষ একান্ত অসহায়ভাবে নিরস্ত্র এবং সামরিক শক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে,—ইহাই আজ ভারতীয় জীবনের অন্যতম সাতিশয় দুঃখকর অবস্থা। সুতরাং জাতি ধর্ম ও প্রদেশ নির্বিশেষে দেশের যুবকগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই এখন প্রথম কর্তব্য। বাংলার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাংলার জন্য একটি নিজস্ব পৌরসেনা বিভাগ (militia) গঠন করিতে হইবে। সকলকেই, কথায় নহে,

কার্যে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে হইবে যে, তাহারা, যেমন অন্যদের, সেইরূপ তাহাদের নিজের দেশ রক্ষার জন্য এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে।

এই সংকটকালে ব্রিটেনের প্রতি ভারতবর্ষের কর্তব্য যদি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের যে কর্তব্য আছে, তাহাও কম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলেই বাঙ্গলার হিন্দুগণ তাহাদের জন্মভূমিতেই দাসশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। দেশের সর্ব-স্থান হইতে তাহারা সমস্বরে ন্যায় বিচার দাবী করিতেছে। ব্রিটেনের পক্ষে নূতন দিক হইতে নূতনভাবে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা নাই। যে জাতি পরাধীন, সে জাতি যদি একথা বুঝিতে না পারে যে, যুদ্ধ করিলে তাহার স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অন্য কোনও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে আগ্রহ বোধ করা স্বাভাবিক নহে। আমরা দর কষাকষির হীন মনোভাব লইয়া অথবা যে সময়ে ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয় সেই সময়ে বাদানুবাদ সৃষ্টির জন্য এই কথা বলিতেছি না। কিন্তু আমরা এই কথা মনে করি যে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের পক্ষে কোনও রূপ সংকোচ না রাখিয়া পরস্পরের মনোভাব অবগত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা যখন ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গলার প্রতি ন্যায় বিচারের কথা বলি, তখন আমরা এই কথাই বলি যে, আজ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড যে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, উহা রক্ষার নিমিত্ত আমরাও অঙ্গীকারবদ্ধ।

"গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে স্বাধীন ভারত যাহাতে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে পারে তজ্জন্য ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্বশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহা সুযোগ যেন না হারান।"

সমগ্র জগৎ ও ভারতের অবগতির নিমিত্ত মূল বিবৃতিটি ইংরেজীতে লিখিত। উপরে তাহার বাংলা তর্জমা দেওয়া হইল।

কার্তিক, ১৩৪৬

"রবীন্দ্র রচনাবলী"

"রবীন্দ্র রচনাবলী"র প্রথম খণ্ডে বিশ্বভারতীর গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার নিবেদনে লিখিয়াছেন :—

> রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম বয়সের অনেক রচনা অত্যন্ত অপরিণত বলিয়া বর্জন করিতে ইচ্ছা করেন, এই রচনাবলীতে সেগুলিকে স্থান দিতে চাহেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জানাইয়াছেন—
>
> "ভূরি পরিমাণ যে সকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলিয়া গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারবো না। আপনারা তর্ক করে থাকেন ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবান্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, একথা মানবসন্তানমাত্রেই স্বীকার করে থাকে।"

'উপমা রবীন্দ্রনাথস্য', ইহা আমরা মানি। কিন্তু উপমা সকল স্থলে যুক্তির আসন গ্রহণ করিতে পারে না। কবি নিজের বাল্যরচনাগুলি সম্বন্ধে যেরূপ কৌতুকজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। কিন্তু বাল্যরচনা মাত্রেই গাধার টুপি, ইহা স্বীকার্য নহে। তাঁহার মত জয়মাল্য পাইলে কেহই এরূপ গাধার টুপি পরিতে অসম্মত হইবে না।

যাহা হউক, চারুবাবু আশ্বাস দিয়াছেন, কবির সহিত একটা রফা হইয়াছে এবং তাঁহার বর্জিত অধিকাংশ রচনা পরিশিষ্টে স্থান পাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাঁচা বয়সের যে-সব কবিতা বর্জন না করিয়া স্বয়ং পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার সহিত তুলনীয় নহে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথের চীনকে সাহায্যের আবেদন

রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত আবেদন প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের সদস্যরূপে প্রত্যাগত ডাঃ দেবেশ মুখুজ্যের নিকট মাদাম সান ইয়াৎ সেন যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমার মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। জাপানের দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানের সর্বধ্বংসী হস্ত হইতে নিরীহ চীনবাসীদের জীবন রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। ভারত ও চীন এই দুইটি বিরাট দেশের মধ্যে অতীতের মৈত্রীবন্ধনের বিষয় যাঁহারা উপলব্ধি করিলেন তাঁহারা চীনবাসীদের রক্ষার কর্তব্যও স্বীকার করিবেন। চীনের বর্তমান দুর্দশার সময় আমাদের ডাক্তারগণ চীনে যে সেবা শুশ্রূষার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে—ডাঃ দেবেশ মুখুজ্যে ৩।১ কালী বাঁড়ুয্যে লেন, হাওড়া।

আমরা ইহার পূর্ণ সমর্থন করিতেছি।

মাঘ, ১৩৪৬

লোকশিক্ষা পাঠ্য গ্রন্থাবলী

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা পাঠ্য-গ্রন্থমালায় নিম্নমুদ্রিত সাধারণ ভূমিকা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার

সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্যে তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত মনে মনন শক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশংকা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্য সর্বাঙ্গীন শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার। আমাদের গ্রন্থ প্রকাশ কার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব জ্ঞানের সেই পরিবেষণ কার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

চৈত্র, ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ডের সাহিত্যাচার্য পদবী সম্মান দিবার প্রস্তাব

রয়টার তারে খবর পাঠাইয়াছেন, ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সংবাদে আমরা অবশ্য দুঃখিত হই নাই, কিন্তু উল্লসিতও হই নাই। অক্সফোর্ড খুব প্রাচীন ও বড় বিশ্ববিদ্যালয় বটে, কিন্তু যাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া সভ্য জগৎ সাহিত্যাচার্য বলিয়া সানন্দে স্বীকার করিয়া আসিতেছে, তাঁহাকে এতদিন পরে সাহিত্যাচার্য উপাধি দেওয়া কৌতুকজনক ব্যাপার।

মনে পড়ে, অনেক বৎসর আগে যখন বোম্বাইয়ে এক পারসী ধনিকের

ঢাকায় ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজ চলিত তখন তাহার ইংরেজ সম্পাদক একটি সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন, কবি রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানদর্শনার্থ ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি দিবেন এইরূপ একটা কথা উঠে, কিন্তু একজন ভারতীয় ব্যক্তি কবির বিরুদ্ধে গোপনে (অর্থাৎ খবরের কাগজে কিছু না লিখিয়া বা প্রকাশ্য বক্তৃতা না করিয়া) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড বড় অধ্যাপকদিগকে ও ফেলোদিগকে অনেক কথা বলায় প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ডেলী মেলের ঐ সংখ্যা এখন আমাদের নিকট নাই, এবং কাগজটি উঠিযা গিয়াছে। নতুবা উক্ত ভারতীযদের নাম ধাম সহ ঐ কাগজেব কথাগুলি উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। এখন অক্সফোর্ডের কর্তৃপক্ষ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। ওয়াশিংটন আর্ভিঙের স্কেচ বুকে রিপ ভ্যান উইঙ্কল বহুবৎসর ব্যাপী নিদ্রার পর জাগিযা দেখিয়াছিল, দুনিয়াটা বদলাইয়া গিয়াছে। অক্সফোর্ডের ডনেরাও নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন "তাই ত, আমবা যাঁহাকে সাহিত্যাচার্য বলিযা মানি নাই অন্য সবাই ত তাঁহাকে মানিতেছে ; অতএব তাঁহাকে তাড়াতাড়ি উপাধি দিয়া ফেলা যাক।" ঐ উপাধি পাওয়া না-পাওয়ায় কবির কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

চৈত্র, ১৩৪৬

মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার পূর্বেও গান্ধীজী বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন এবং তাহাতে ফলও হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে গান্ধীজী যাহা লিখিযাছেন তাহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার চেষ্টায় বিশ্বভারতী ভবিষ্যতে আরও আর্থিক আনুকূল্য পাইবে। তিনি বিশ্বভারতী দর্শনকে তীর্থদর্শন বলিয়াছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ও তাহার প্রতিষ্ঠাতার স্বাজাত্য ও সর্বজাতীয়ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বাংলাদেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্থাপিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ পরিচালিত হইতেছে—সমগ্র পৃথিবী

ইহার মঙ্গল ক্ষেত্র বলিলে ভুল হয় না। সুতরাং যে-কোন স্থান, যে-কোন দিক হইতে ইহার পুষ্টিসাধনার্থ আনুকূল্য আসিতে পারে এবং তাহার আশা করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান যে দেশ, প্রদেশ বা অঞ্চলে অবস্থিত, তথাকার লোকেরাই স্বভাবতঃ তদ্দ্বারা অধিকতর সংখ্যায় ও অধিকতর উপকৃত হয়। তাহার সুবিধা তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ না করিলে তাহার জন্য তাহারা দায়ী। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাহা আদর্শ তদনুসারে তাহা চালাইতে হইলে আধুনিক কালে বহু অর্থের আবশ্যক। তাহা, প্রতিষ্ঠানটি যে প্রদেশে অবস্থিত, তথাকার লোকেদেরই অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশ্বভারতী বাংলাদেশে অবস্থিত হইলেও এবং ইহার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা বেশি হইলেও, মহর্ষি ও কবিকে ছাড়িয়া দিয়া ইহা আর্থিক আনুকূল্য পাইয়াছে প্রধানতঃ অ-বাঙালীদের নিকট হইতে। ইহা বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। বাঙালী কেহই কিছু টাকা বিশ্বভারতীকে দেন নাই, এমন নয়; কিন্তু বাঙালীদের দান সামান্য। আমরা অহঙ্কার করিবার সময় বিশ্বভারতীকে বাঙালী জাতির কীর্তির ফর্দে ধরি; তাহার কারণ তাহাতে কোন খরচ হয় না—প্রশংসা খুব সস্তা দান, বিশেষতঃ যখন তাহা আত্মপ্রশংসার রূপান্তর।

যে সকল বাঙালী ও অন্য অধ্যাপক অল্প বেতনে বিশ্বভারতীর আন্তরিক সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ একদা সুভাষবাবুকেও বিশ্বভারতীর পার্শ্বে ও পশ্চাতে দাঁড়াইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন সুভাষবাবু কবিকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, বিশ্বভারতীর মধ্যে সত্য যাহা তাহা অবশ্যই টিঁকিবে। কবি বোধ হয় এই তত্ত্ব অনবগত ছিলেন না।

চৈত্র, ১৩৪৬.

বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে কখনও বাঁকুড়ায় যান নাই। সম্প্রতি গিয়াছিলেন।

তিনি অন্যান্য স্থানে গেলে, কোন কোন স্থানে—যেমন মেদিনীপুরে—তাঁহার বক্তৃতাদি কার্যকলাপের যেরূপ বিস্তারিত বৃত্তান্ত অনেক বাঙলা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া থাকে, তাঁহার বাঁকুড়া গমন দর্শন ও সেখানে তিন দিন অবস্থিতির সেরূপ বিবরণ কোন দৈনিকে দেখি নাই। এই জন্য 'প্রবাসী'তে সামান্য সেইরূপ কিছু বৃত্তান্ত দিতে হইতেছে। কারণ প্রবাসী-সম্পাদকের জন্মস্থান, বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্থান ও নিবাস বাঁকুড়া।

বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও বর্ধমান ডিবিশনের অস্থায়ী কমিশনার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার হালদারের পত্নী রবীন্দ্রনাথের স্নেহাস্পদা শ্রীমতী উষা হালদারের নিমন্ত্রণে কয়েকটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কবি বাঁকুড়া গিয়াছিলেন। তাঁহারাই তাঁহার বাঁকুড়া প্রবাসকালে তাঁহার আরাম ও স্বাস্থ্যের অনুকূল সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতিথিদের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছিলেন।

কবি বোলপুর হইতে খানা জংশন পর্যন্ত রেলওয়েতে আসেন। তাহার পর তাঁহাকে মোটরে বাঁকুড়া পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার পথপ্রদর্শক ছিলেন অক্লান্তকর্মী ডাক্তার পার্বতীচরণ সেন। বাঁকুড়ায় কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে যে গবেষণা হইতেছে, ডাক্তার সেন তাহার সুদক্ষ ভারপ্রাপ্ত কর্মী। তাঁহার নিষ্ঠা ও কর্মিষ্ঠতার জন্য রবীন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

খানা জংশন হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত পথে, যেখানে যেখানে লোক খবর পাইয়াছে সেখানেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় করিয়াছিল। রাণীগঞ্জে জনতা এত বেশি হইয়াছিল যে মোটর ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। রাণীগঞ্জে তাঁহাকে মোটর সমেত দামোদর পার করা হয়—কতক নৌকার উপর, বাকী অংশ বালুকাস্তীর্ণ নদীগর্ভের উপর দিয়া। রাণীগঞ্জের অপর দিকে মেজিয়া গ্রামের ঘাট। সেখানে তথাকার ও অন্য অনেক গ্রামের লোকেরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার গাড়ি দেখিবামাত্র শঙ্খধ্বনি ও 'কবিগুরুর জয়' ধ্বনি বার বার উত্থিত হয়। তাঁহারা যেখানে তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু গাড়ি হইতে নামাওঠা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বলিয়া বাঁকুড়া পৌঁছিবার আগে কোথাও তাহাকে নামান হয় নাই। বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিসাধন দত্ত, তাহার সম্পাদক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ মেজিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং কবি রাণীগঞ্জ পৌঁছিবার

আগে হইতে তাঁহাকে দামোদর পার করিবার বন্দোবস্ত পরিদর্শন করিতে-ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার হালদার ও শ্রীমতী ঊষা হালদার 'হিল হাউস' নামক কুঠিতে কবির অভ্যর্থনা সম্বর্ধনাদির বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কন্যা কল্যাণীয়া লক্ষ্মীকে কবিকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত মেজিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মেজিয়া বাঁকুড়া হইতে সাতাশ আটাশ মাইল।

এই পথের অনেক জায়গায় গ্রামবাসীরা পত্রপুষ্প শোভিত তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে যে খানে পথ ঠিক গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সেখানে অনেক গৃহ আম্র পল্লবাদি দ্বারা অলংকৃত হইয়াছিল। অনেক স্থানে গ্রামবাসীরা সারি বাঁধিয়া রাস্তার দুই দিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেজিয়া ও বাঁকুড়ার মধ্যপথে এক জায়গায় নিকটবর্তী গ্রামসমূহের অগণিত মহিলা ও পুরুষগণ তাঁহাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছিলেন। মহিলারা দর্শন ও প্রণাম করিবার নিমিত্ত এরূপ ভিড় করিয়াছিলেন যে, মোটরের দরজা বন্ধ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্বতঃউদীরিত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তাঁহাকে ক্ষণিকের জন্য অবতরণ করিয়া গ্রামটিকে ধন্য করিতে বার বার বলিতে লাগিলেন; "আমরা শতবর্ষ আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি, শেষে যদি আসিলেন একবার পায়ের ধূলা দিবেন না?" কিন্তু সেই ভীড়ের মধ্যে পথ শ্রমে অবসন্ন কবিকে মোটর হইতে নামান উচিত বা সম্ভবপর বোধ হইল না। গ্রামবাসিনী মহিলা ও গ্রামবাসী পুরুষদিগের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারা গেল না।

অবশেষে সাতাশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কবির মোটর বাঁকুড়া পৌঁছিল। তাঁহার অচিরে শুভাগমন বার্তা প্রচারার্থ আগেই, দামোদরে তাঁহার মোটর দেখিতে পাইবামাত্র একজন বার্তাবহকে মোটরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রপুষ্পখচিত কয়েকটি তোরণে অলংকৃত, উভয়দিকে পল্লবপূর্ণ ঘট ও কদলীবৃক্ষে শোভিত গৃহশ্রেণীর মধ্য দিয়া ও শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান শত শত মহিলা ও পুরুষের জয়ধ্বনি মুখরিত রাঙা মাটির পথ বাহিয়া ধীরে ধীরে কবির মোটর অগ্রসর হইয়া হিল হাউসে প্রায় ২টার সময় পেঁছিল। বহু জনতা সত্ত্বেও কোথাও বিশৃঙ্খলা হয় নাই। ইহার প্রশংসা বাঁকুড়ার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্য। যাঁহারা তাহাদের উপর সকল বন্দোবস্তের ভার দিয়াছিলেন তাঁহাদের বিশ্বাস সার্থক হইয়াছে।

হিল হাউসের বারান্ডা এবং কবির শয়ন ও অভ্যর্থনার কক্ষের মেঝে সুন্দর আলিপনায় অলংকৃত হইয়াছিল।

১৭ই ফাল্গুন কবি বাঁকুড়া পৌঁছেন। সেই দিন অপরাহ্নে হিল হাউসে মহিলারা তাঁহার সম্বর্ধনা করেন। কয়েকজন মহিলা ও কয়েকটি বালিকা তাঁহার উদ্দেশে লিখিত কবিতা পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে কবির রচিত কয়েকটি গান গাওয়া হয়। তাহার পর কবি তাঁহাদিগকে যাহা বলেন, তাহাতে বাঙালী নারীদের প্রতি তাঁহার মমতা ও করুণা সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়। শেষে তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, কিন্তু গান করিতে রাজী হন নাই। মহিলাদের সভা কিছু দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল। ততক্ষণ কুঠির সুদীর্ঘ বারান্ডায় বিস্তর ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। কবিকে তাহা জানানো হওয়ায় তিনি বাহিরে আসেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আর একটি নিজের কবিতা আবৃত্তি করেন।

বাঁকুড়া প্রদর্শনী খোলা কবির বাঁকুড়া আগমনের অন্যতম উপলক্ষ্য ছিল। ১৮ই ফাল্গুন প্রাতে তিনি এই কার্য সমাধা করেন। তাহার পূর্বে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বৃহৎ মণ্ডপটি নির্মিত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে কয়েকটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। মণ্ডপে যে উচ্চ মঞ্চে কবিকে বসান হয়, তাহাতে অভিনন্দন প্রদাতা সকলের বসিবার ব্যবস্থা শ্রীমতী ইলা দেবীর প্রস্তাব ও উপদেশানুসারে করা হয়। প্রথমে পৌরজনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিসাধন দত্ত অভিনন্দন পাঠ করেন। পরে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এবং বাঁকুড়া শিক্ষা সম্মিলনীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। বাঁকুড়া সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে আর দুটি অনুষ্ঠান হয়।

কথাশিল্পনিপুণা শ্রীমতী ইলা দেবী কবিকে মাল্য ও চন্দন প্রদান করেন এবং পরিষদের নিদর্শনী (badge) রেশমী কাপড়ে মুদ্রিত বংশীর ছবির নীচে চণ্ডীদাসের বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—কবিকে পরাইয়া দেন। তাহার পর বাঁকুড়ার জেলা জজ কবি শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে স্বরচিত একটি কবিতায় সুন্দর আবৃত্তি করেন।

উত্তরে কবি দীর্ঘ একটি বক্তৃতা করেন। তাহার পর ক্লান্তি সত্ত্বেও অনুরুদ্ধ হইয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। প্রদর্শনীক্ষেত্রে যাইবার ও সেখান

হইতে আসিবার পথে এবং মণ্ডপে খুব ভীড় হইয়াছিল, কিন্তু ছাত্রদের সুবন্দোবস্তে কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই।

১২শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ প্রাতে প্রসূতি ও শিশুদের কল্যাণ বিধায়ক একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহা শ্রীমতী উষা হালদার প্রমুখ বাঁকুড়ার মহিলাদের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে। কবি এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করেন।

অতঃপর প্রদর্শনীমণ্ডপে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দিত করা হয়। শ্রীমতী উমা গুহ অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ এইটির রচনার প্রশংসা করিয়াছেন। অভিনন্দনপত্র পঠিত হইবার পর তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তিনি ছাত্রদিগকে খুশী করিবার চেষ্টা করেন নাই, যাহা গণনায়কেরা অনেকে করিয়া থাকেন। তাহাদের এবং দেশের ও জাতির কল্যাণার্থ উচ্চারিত অনেক কঠোর সত্য তাঁহার বক্তৃতায় ছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা তাহাতে বিন্দুমাত্রও 'বিক্ষোভ প্রদর্শন' করে নাই—নীরবে সকল কথা শুনিয়াছিল। কবি পরে এই লেখককে বলিয়াছিলেন, "ছাত্রছাত্রীরা আমার কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে।" আমাদের বোধ হয় তাহারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাঁহার সব কথা কল্যাণকর উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পরোক্ষ প্রমাণ তাঁহার বক্তৃতার শেষে তাঁহাকে তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীমতী উমা গুহের তাঁহাকে কবিতা পড়িতে অনুরোধ। উমা তাঁহাকে একটি গদ্য কবিতা পড়িতে বলেন। কবি ইহাতে প্রীত হইয়া এই লেখককে বলিয়াছেন, "ইতিপূর্বে কেহ কোন সভায় আমায় গদ্য কবিতা পড়িতে বলে নাই।"

ছাত্র-সভার কাজ হইয়া যাইবার পর কবিকে বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুল হাঁসপাতাল দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি তাহা দেখিয়া অতীব প্রীত হইয়াছেন।

অপরাহ্নে কবির দর্শনলাভের জন্য একদিন পুরুষদের নিমিত্ত ও একদিন মহিলাদের নিমিত্ত ব্যবস্থা করা হয়। মহিলাদের নিমিত্ত ব্যবস্থা হয় হিল হাউসের হাতায়। তাঁহারা একে একে প্রণাম করিয়া যান। পুরুষদের জন্য ব্যবস্থা হয় হিল হাউসের নিকটবর্তী বাঁকুড়া জেলাস্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্রে। কবি বলিয়াছেন, এরূপ ভীড় তিনি কোথাও দেখেন নাই।

কবি কয়েকজন মুক্ত 'অন্তরীণে'র, বহু ছাত্রের, কতিপয় অধ্যাপকের এবং অন্য অনেকের সহিত লোকশিক্ষা ও অন্যবিধ লোকহিতকর কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এই লেখক বাঁকুড়ার কবির সমুদয় বক্তৃতাসভায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার শ্রুতিলিখনের অভ্যাস না থাকায় পাঠকদিগকে বক্তৃতাগুলি উপহার দিতে পারিল না।

কবি বাঁকুড়া জেলার দারিদ্র্যের কথা অবগত আছেন। তাহার গ্রামে থাকিয়া গ্রামের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

১৯শে ফাল্গুন দুপুর রাত্রে তিনি বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করেন। তখন অনেকে বাঁকুড়ার শূন্যতা অনুভব করেন।

চৈত্র, ১৩৪৬

"চিত্রাঙ্গদা" ও "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা' এই দুটি নৃত্যনাট্যের অভিনয় আমরা একাধিকবার দেখিয়াছি। সম্প্রতি বাঁকুড়াতেও দেখিয়াছি। উভয় নাট্যেরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজী চণ্ডালিকার অভিনয় দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। এই নাট্যটি করুণ ও মর্মস্পর্শী এবং ইহার দ্বারা হৃদয় নিম্নস্তর হইতে আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। সকল মানুষের মধ্যে যে সাধারণ মানবত্ব রহিয়াছে, ইহা হইতে তাহা উপলব্ধ হয়।

চৈত্র, ১৩৪৬

বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তিন দিন বাঁকুড়া সম্মিলনীর মেডিক্যাল স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া প্রীত হইয়া তিনি নিম্নমুদ্রিত মত প্রকাশ করেন।

> আজ প্রাতঃকালে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল স্কুল পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। কর্তৃপক্ষদের প্রসাদবঞ্চিত এই হিতানু-

ষ্ঠানটিকে বাঁকুড়ার গৌরবস্থান বলিলে অল্প বলা হয়, বস্তুত ইহা বাংলা দেশেরই একটি মহতী কীর্তি। যাঁহাদের অজস্র ত্যাগ ও কৃতিত্বের উপরে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত তাহারা সমস্ত দেশের সাধুবাদের যোগ্য, কারণ ইহা কর্ম-সফলতায় নহে, মহৎ দৃষ্টান্তের মূল্যে মূল্যবান। ইতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখ, ১৩৪৭

নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন

গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই চৈত্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্র শিলাইদহ পল্লীতে নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি ইহাই এরূপ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বাংলা দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই অধিবেশন সম্ভব হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণপত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন :—

> আমার যৌবনের ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরসসাধনার তীর্থস্থান ছিল, পদ্মা প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ আর সহজগম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে। সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে সে কথা এই উপলক্ষ্যে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখলুম।

নির্বাচিত সভাপতি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কাজ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার অভিভাষণে পল্লীসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাউল ও মুর্শিদা গানের রূপ, তত্ত্ব ও রসের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় শিলাইদহকে পৃথিবীর কবি ও সাহিত্যিকের তীর্থস্থান বলিয়া বর্ণনা করেন এবং প্রতি বর্ষে যাহাতে এখানে এইরূপ একটি অনুষ্ঠান হয়, সেজন্য বাংলার প্রত্যেক লোককে সচেষ্ট হইতে বলেন। রাত্রে বাউল ও মুর্শিদা গানের এক বিরাট জলসা হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় অনিবার্য কারণে চলিয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় পরদিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহাশয় বাংলার বাউল ও মুর্শিদা গানের মরমী অংশের কথা উল্লেখ করেন ও উহার ভাবসম্পদের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি মুন্সী নুরুদ্দিন আহম্মদ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় গৃহিত তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথমটি এই :—

(১) বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসাধনক্ষেত্র শিলাইদহ পল্লী অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের সাহিত্যতীর্থরূপে পরিণত হইবে মনেপ্রাণে ইহা অনুভব করিয়া, এই নিখিলবঙ্গ পল্লী-সাহিত্য সম্মেলন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবি-কুঞ্জ "শিলাইদহ কুঠীবাড়ী" যাহাতে জাতীয় সম্পদরূপে সংরক্ষিত হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ও "শিলাইদহ কুঠীবাড়ী"র বর্তমান সত্ত্বাধিকারী মহোদয়গণকে অনুরোধ করিতেছেন।

শিলাইদহে "কবির পুণ্যস্মৃতিকে বহন করিয়া তাঁহার ভবনখানি নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ওখানেই গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ হয়। ঐ গৃহখানি জাতির মহাসম্পদ—বাংলা সাহিত্যের একটি পীঠস্থান। শিলাইদহের কুঠী-বাড়ীকে ঘিরিয়া কবির বহু গীতিকবিতা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। বর্ষে বর্ষে যাহাতে ওখানে রবীন্দ্রভক্তদের সমাগম হয় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।" ইহা বড়ই আনন্দের সংবাদ। কবির শিলাইদহের কুঠীবাড়ীটি জাতীয় সাহিত্য তীর্থরূপে সংরক্ষিত হয় এবং তথায় সাহিত্য সাধকদের ও সাহিত্যরসপিপাসুদের সমাগম হয়, ইহা সর্বথা অতীব বাঞ্ছনীয়।

বৈশাখ, ১৩৪৭

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের শেষ রচনা

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সৌজন্যে তাহার সহিত মডার্ণ রিভিয়ুর বিনিময় হইয়া থাকে। ঐ দৈনিকে লেখা হইয়াছে, গত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ মহোদয় "পোলাণ্ড ও যুদ্ধ" শীর্ষক

যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ রচনা। তাঁহার লিখিত কোন্ প্রবন্ধটি তাঁহার শেষ রচনা জানিনা। কিন্তু বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ুতে তাঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

জানুয়ারী—The World Outlook Today : America

ফেব্রুয়ারী—The World Outlook Today : India

ফেব্রুয়ারী—Raja Rammohan Roy

মার্চ—Dadabhai Naoroji

এপ্রিল—Sir R. Venkata Ratnam Naidu

এপ্রিল—Lala Har Dayal

এতদ্ভিন্ন তিনি ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যায় কতকগুলি পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। "The World Outlook" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী শেষ করিবার পূর্বেই তিনি পীড়ায় শয্যাশায়ী হন।

বৈশাখ, ১৩৪৭

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী

গত ২৯শে ফাল্গুন শান্তিনিকেতনে "বড়দাদা" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দিবসে প্রত্যূষে আশ্রমের বৈতালিক দল দ্বিজেন্দ্রনাথের বিখ্যাত সংগীত "কর তাঁর নাম গান" গাহিয়া আশ্রম পরিভ্রমণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের বাসগৃহ নীচু বাংলা (সম্প্রতি "দ্বিজ-বিরাম" বলিয়া অভিহিত) প্রদক্ষিণ করেন। প্রাতঃকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনায় বড়দাদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন, তাঁহার ভাষণ বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। উপাসনান্তে কবি দ্বিজ-বিরাম গৃহে গমন করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দ্বিপ্রহরে দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের উদ্যোগে তাঁহার আত্মার সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে আশ্রমবাসীদিগের জন্য একটি ভোজের আয়োজন হয়। বৈকালে "দ্বিজ-বিরাম" প্রাঙ্গনে শ্রীক্ষিতি মোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহেমলতা দেবী লিখিত "বড়বাবু মহাশয়" প্রবন্ধ (প্রবাসী, চৈত্র), শ্রীক্ষিতীশ

রায় কর্তৃক পঠিত হয়। শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত কবিতাবলী পাঠ করেন। শ্রীকালীমোহন ঘোষ এবং শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যায় দ্বিজ-বিরাম গৃহ আলোকমালায় শোভিত করা হইয়াছিল। এই গৃহে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের চিত্র, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি, তাঁহার প্রস্তুত কাগজের বাক্স প্রভৃতির একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীগণ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রিয় কাঠবিড়ালী, শালিখ প্রভৃতির আলপনাচিত্রে গৃহের অঙ্গন সুশোভিত করিয়াছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি দ্বিজেন্দ্র শতবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

"নবজাতক"

বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্যগ্রন্থ "নবজাতক"ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সূচনায় কবি বিভিন্ন পর্বে তাঁহার কাব্যের গতি পরিবর্তন সম্বন্ধে লিখিতেছেন ;

> "আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু জোগান নূতন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারিদিগের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রং হয় রাঙা, কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র, আবার কোনো অরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।"...

নবজাতকের কবিতাগুলি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

"...এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত

অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।"...

গ্রন্থখানির বিস্তৃত আলোচনা প্রবাসীর আগামী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

মংপুতে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

মংপু হইতে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের গত ২৫শে বৈশাখ রচিত "অনন্ত আমি" কবিতাটি যে চিঠির মধ্যে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সেখানে কবির জন্মোৎসবের একটু বর্ণনা আছে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাহা ছাপিবার জন্য পাঠান নাই, আমরা তাহার কিয়দংশ ছাপিতেছি।

"এখানে ৫ই (মে) তারিখে গুরুদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা একটু উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলাম। ৩০০ পাহাড়ী ভুটিয়া লেপচা প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সব এদেশী গ্রাম্যলোক, কিন্তু কী তাদের আনন্দ! একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ বুদ্ধের বন্দনা করলেন, সকাল বেলায় ওঁকে মালা পরালেন—সেই কথা কবিতায় লিখেছেন। বিকেল বেলা সবাই এল। তাদের খাওয়ান হল চা লুচি ইত্যাদি। উনি তাদের মাঝখানে বসে দেখলেন। ওঁর খুব ভাল লেগেছিল। সকলেই একটি একটি ছোট ফুল এনেছিল। কেউ বা তিব্বতী খদা বলে এক রকম গাছের সুতোর স্কার্ফ (scarf) পরাল। সেটা ওদের খুব সম্মানের জিনিষ। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন মেঘলা হয়ে অন্ধকার হয়েছিল। ছবি হয়ত ভাল ওঠে নি, যদিও অনেকবার চেষ্ঠা করা হয়েছে। যদি প্রিন্ট ভাল হয় আপনাকে পাঠাব।"

প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যার ২২৫/২২৬ পৃষ্ঠায় কবি মংপুর এই উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেক বৎসর আগে কবি যখন তাঁহার এক জন্মদিনে চীন দেশে ছিলেন তখন সেখানকার লোকেরা আপনাদের শিশুদের জন্মদিনে তাহাদিগকে সবুজ রঙের কাপড়ের যে রকম পোষাক দেয় তাঁহাকেও সেই পোষাক দিয়াছিল। চীন

হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর কলিকাতায় তাঁহার যে সংবর্ধনা সভা হয় কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে, তাহাতে তিনি ঐ চৈনিক পরিচ্ছদ পরিয়া সভাস্থ সকলকে দেখাইয়াছিলেন। মংপুর লোকেরাও দেখিতেছি তাঁহার জন্মোৎসবে তাহাদের স্থানীয় রীতি অনুযায়ী কিছু অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

যাহারা কবির ভাষা বুঝে না, তাঁহার কবিতা ও অন্য রচনাবলী অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আনন্দ ও কল্যাণের অংশী হইতে পারে না, তাহারা যে তাঁহাকেও প্রীতি করে ও সম্মান প্রদর্শন করে, ইহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ব্যাপক প্রভাব উপলব্ধ হয়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র মনীষী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাংলা দেশ—বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইল। বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা কিরূপ ছিল, তিনি কিরূপ মনস্বী ও হৃদয়বান ছিলেন, তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও দেশহিতৈষণা কিরূপ ব্যাপক, প্রবল ও সর্বদিগদর্শী ছিল, তাহার কোন বাহ্য চিহ্ন অবস্থা বৈগুণ্য ও আত্মপ্রকাশ বিমুখতাবশতঃ তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাংলায় তিনি "একটি সদ্য প্রস্ফুটিত সাকুরা পুষ্প" নাম দিয়া একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং মহাভারতের প্রধান ... পটি সাধুভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ ও ছোট গল্প তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ইংরেজী মাসিকে "গোরার" পিয়ার্সন সাহেব কৃত যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ মনোজ্ঞ ইংরেজীতে খুব দ্রুত অনুবাদ করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের লিখনভঙ্গী এবং চিন্তাধারা ও ভাবধারার সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ ও পরিচয় ছিল যে, তিনি অনুবাদে কোন স্থানে অক্ষরে অক্ষরে মূলের অনুসরণ না করিলেও তাঁহার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ও অনুমোদন লাভ করিত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর যেমন

বহুজনের অধিগম্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা বাংলার ও বাঙালী জাতির বাইরের লোকদের অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা না করিলে কবির বহু রচনা বাংলা-না-জানা লোকদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

অনেক গুরুতর বিষয়ে কবি তাঁহার পরামর্শ লইতেন।

তিনি যে কেবল সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যক্ষেত্রেই অবাধ বিচরণক্ষম ছিলেন তাহা নহে, জীবন বীমার কার্যেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওর্যান্স সোসাইটি প্রধানতঃ যাঁহাদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বাংলা রচনা একত্র করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসরে উহার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে কবিতা ও গান বিভাগে সোনার তরী, নাটক ও প্রহসন বিভাগে চিত্রাঙ্গদা ও গোড়ায় গলদ, উপন্যাস ও ও গল্প বিভাগে চোখের বালি, এবং প্রবন্ধ বিভাগে আত্মশক্তি সংকলিত হইয়াছে। এই খণ্ডে পাঁচখানি ছবি মুদ্রিত হইয়াছে—যৌবনে রবীন্দ্রনাথ (আনুমানিক পঁচিশ বৎসর বয়সে), জ্যেষ্ঠা কন্যা সহ রবীন্দ্রনাথ (১৮৮৭ সালে শিল্পী আর্চার অঙ্কিত প্যাস্টেল চিত্র), "ঝুলন" কবিতার পাণ্ডুলিপির এক অংশ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধু প্রিয়নাথ সেন, ও ১২৯৭ সালে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ছবি।

এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণ আত্মশক্তি গ্রন্থখানি। বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে স্বদেশী সমাজ প্রভৃতি যে-সকল বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন ও বিভিন্ন সভায় পাঠ করেন, তাহা এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; ইহার কয়েকটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গদ্যগ্রন্থে খণ্ডিত ভাবে মুদ্রিত হইত বটে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অন্য প্রবন্ধগুলি পড়িবার এবং রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয়

মতামত বুঝিবার, ও স্বদেশী যুগে তিনি দেশবাসীকে কি মন্ত্রে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা জানিবার সুযোগ ছিল না।

"আত্মশক্তি" কথাটিকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক আদর্শের মূলমন্ত্র বলা যাইতে পারে; দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি যে-সম্বন্ধেই অভাব বা সমস্যা উপস্থিত হউক না, বিদেশীয় সরকারের কাছে তাহার সমাধানের জন্য আবেদন-নিবেদনকে তিনি সর্বদাই অবজ্ঞেয় বলিয়া জানিয়াছেন, এবং আত্মশক্তির উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া সকল সমস্যা সমাধানের ভার দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে সকল মানবকর্তব্যবিস্মৃত সৌন্দর্যের পূজারী বলিয়া জানেন। "ব্রতধারণ" প্রবন্ধ হইতে তাঁহাদের অবগতির জন্য কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করি—এই প্রবন্ধটি "কোনো স্ত্রী সমাজে জনৈক মহিলা কর্তৃক পঠিত" হইয়াছিল। বঙ্গমহিলাদিগকে স্বদেশী ব্রতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> ভগিনীগণ…আমরা পরণের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিল্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতী দোকানের…আমরা এতদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া বিলাত দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।… আমরা কি একথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়,—আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাস বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার সখ মিটাইব না? আমরা ভালো হউক মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিস ব্যবহার করিব।
>
> ভগিনীগণ, সৌন্দর্য চর্চার দোহাই দিবেন না। সৌন্দর্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিস আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিসে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে; কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেইরূপই ধারণা হয়, তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিবার দিন আজ নহে—সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত, তখন জননী বেনারসী শাড়ীখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হন না—তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্যবোধের দাবি?…

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে, তখন সুবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই—ইহা হইতে আমরা এই শিখিয়াছি যে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে,—সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যখন ভাবি, তখন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্র-শক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে লজ্জিত হইতে হয় নাই—স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্য দ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।"

১৩১২ সালে লিখিত "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধের একটি অংশ বাঙালী লোকনায়কদের স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন ১৩৪৭ সালেও রহিয়াছে :

যে গুণ মানুষকে একত্র করে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলই অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারও চেয়ে ন্যূন মনে না করা, একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস—এইগুলিই সেই শয়তানের প্রদত্ত বিষ, যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে।... বাঙালিকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণ রূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বদা অন্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

গ্রন্থ পরিচয় বিভাগে এই খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলিত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা সংকলিত হইয়াছে। এগুলি অনুসন্ধিৎসু ও রসগ্রাহী পাঠকের বিশেষ সহায় হইবে ॥

আষাঢ়, ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ছুটির প্রস্তাব

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসব কয়েক বৎসর হইতে ব্যাপক ভাবে হইতেছে। এ বৎসরও হইয়াছিল। যদি উৎসবের প্রাচুর্যের সংগে সংগে পুস্তকাকারে ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার রচনাবলীর পাঠক বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলেই মনে করা যাইতে পারিবে যে, তাঁহার প্রতিভার বোদ্ধা দেশে বাড়িয়াছে। বাঙালীদের মধ্যে রবীন্দ্র প্রশস্তি অনেক স্থলে স্বজাতির বড়াইয়ের নামান্তর ;—"আমরা অতবড় একটা জাতি যে তাহার একজন কবি বিশ্ববন্দিত।"

তাঁহার জন্মদিন পালন সম্বন্ধে আমাদের নিকট একটি প্রস্তাব আসিয়াছে যে, তাঁহার জন্মদিন একটি দেশব্যাপী ছুটির দিন বলিয়া ঘোষিত হউক। ইহা হইলে আনন্দের বিষয় হয় বটে ; কিন্তু গবর্নমেণ্ট তো তাহাতে রাজী হইবেন না। সুতরাং কেবল এই অনুরোধই করা যাইতে পারে, যে সমুদয় বেসরকারী কলেজ ও বিদ্যালয় এবং অন্য সমুদয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (আপিস আদি) যেন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে বন্ধ রাখা হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া চাই বলিয়া, নানাবিধ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁহার জন্মদিনে বন্ধ রাখার প্রস্তাব সম্বন্ধে দুটা আশংকার কথাও মনে উদিত হইতেছে। যদি কোন বেসরকারী কলেজ বা স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঐদিন ছুটি দিতে না-চান, তাহা হইলে তাহার ছাত্রেরা ধর্মঘট করিলে তাহা সাতিশয় অশোভন হইবে। আবার ইহা লইয়া যদি কোথাও হিন্দু ছাত্র ও পাকিস্তানি ছাত্রদের মধ্যে বিবাদ বাধে, তাহাও অত্যন্ত অনিষ্টকর হইবে। এবং উভয়ই কবিকে মর্মান্তিক বেদনা দিবে।

আষাঢ়, ১৩৪৭

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতিরক্ষা চেষ্টা

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সুপণ্ডিত, সুলেখক, ত্যাগী, মানবপ্রেমিক, দরিদ্রের বন্ধু এবং ভারতভক্ত ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিবার যে চেষ্টা

হইতেছে তাহা সর্বথা সমর্থনযোগ্য। বিশ্বভারতীর সম্পর্কে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবেদন কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক 'হরিজন' কাগজে দেখিয়াছি, তাহার তিনটি অংগ আছে। (১) শ্রীনিকেতনে প্রয়োজনীয় সমুদয় সরঞ্জামবিশিষ্ট অস্ত্রোপচার কক্ষ সমন্বিত একটি হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণ, (২) বীরভূম জেলার জলাভাবক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে 'দীনবন্ধু কূপ' (৩) খ্রীস্টের উপদেশ ও চরিত্র অনুশীলন এবং সার্বজাতিক সমস্যা সমূহের সমাধানার্থ তাহার প্রয়োগ কল্পে শান্তিনিকেতনে একটি খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতি ভবন নির্মাণ ও পরিচালন। এতদর্থে যে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা সহানুভূতিসম্পন্ন ভারতীয় ও বিদেশী লোকদের নিকট চাওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা আবেদনটিতে বলা হইয়াছে। তাহা, বর্তমানে বিশ্বভারতীর যে সকল কাজ চলিতেছে তাহার স্থায়িত্ব বিধান ("ensuring the permanence of the present established work")। ইহাও খুব প্রয়োজনীয়। ইহাকে পরিকল্পনাটির চতুর্থ অংগ বলা যাইতে পারে।

এই চারটি অংগের কোন্‌টির আপেক্ষিক গুরুত্ব কিরূপ, তাহা নিরূপণের চেষ্টা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, হাসপাতালটি স্থাপন ও কূপ-খনন সর্বাপেক্ষা জরুরী, এবং এই দুটির দীনবন্ধুতা সর্বাপেক্ষা সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে বোধ্য। জগতের বর্তমান বিক্ষুব্ধ অবস্থায় পাঁচলক্ষ টাকা শীঘ্র পাওয়া না যাইতেও পারে। কিন্তু হাসপাতাল ও কূপের জন্য আবশ্যক কয়েক হাজার টাকা অপেক্ষাকৃত সহজে ও শীঘ্র পাওয়া যাইতে পারে। এই সব কারণে উদ্যোক্তাদের নিকট আমাদের নিবেদন, হাসপাতাল ও কূপ খননের জন্য আবশ্যক অর্থের একটি আনুমানিক পরিমাণ তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দৈনিক কাগজ গুলির সাহায্যে জ্ঞাপন করুন। তাঁহাদের আপত্তি না থাকিলে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতি ভবনের জন্য আনুমানিক কত টাকা আবশ্যক এবং বিশ্বভারতীর বর্তমান কাজ গুলির স্থায়িত্ব বিধানের জন্য কত টাকা তাঁহারা রাখিতে চান, তাহারও আনুমানিক পরিমাণ এই সংগে জানাইলে ভাল হয়।

উদ্যোক্তাদের মনঃপূত হইলে, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইলে ভাল হয়, যে, যে-কোন দাতা ইচ্ছা করিলে সমুদয় অংগের বা কেবল একটি বা দুইটি অংগের নাম করিয়া টাকা দিতে পারেন।

উদ্যোক্তাদের অবগতির নিমিত্ত আমাদের এই নিবেদন আমরা ইংরেজীতেও করিব।

আষাঢ়, ১৩৪৫

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ও ঔপনিবেশিক ভারতীয়গণ

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ মহোদয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তাঁহার হৃদয়ের কথা যেরূপ জানিতেন, আমরা তাহা না জানিলেও তাঁহার বাহ্য কর্মশীল জীবনের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রাদিতে যেরূপ পড়িয়াছি, তাহা হইতে আমাদের এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, যে ভারতবর্ষের বাহিরে নানা ব্রিটিশ ও অন্য য়ুরোপীয় উপনিবেশের অধিবাসী ভারতীয়দের দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাঁহার মর্মে বিঁধিয়াছিল। এই আন্তরিক সমবেদনা তাঁহাকে কতবার কত দূরদেশে লইয়া গিয়াছে, তাহা সংবাদপত্র পাঠকেরা জানেন। অনেকবার তিনি অসুস্থ দেহে বিদেশযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জানিয়াও একবার গিয়াছিলেন। প্রত্যেক সমুদ্র যাত্রায় তিনি সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। সাগরপারের ভারতীয়দের পক্ষ অবলম্বন করাতে তিনি যত দুঃখ পাইয়াছেন ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এমন আর কিছুতে নহে। ব্রিটিশ গিয়ানা প্রভৃতি হইতে প্রত্যাগত ও মাটিয়াবুরুজে অতি দীন অবস্থায় স্থিত ভারতীয়দের দুঃখ লাঘবের জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিতেন।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হইয়াছে, তাঁহার পবিত্র ও চরিতের এই দিকটির স্মারক কিছু থাকিলে ভাল হয়। গান্ধীজী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আমরা চাহিতেছি না। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতীয়েরা যদি শান্তিনিকেতনে নিজ ব্যয়ে একটি এণ্ডরুজ আলয় (Andrews Home) স্থাপন করেন, সেখানে যদি তাহাদের সমস্যাসমূহ অনুশীলিত (Studied) হয়, এবং সেখানে সাগরপারের দুই চারিটি ভারতীয় ছাত্রী ও ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহা শোভন হইবে।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মারকরূপে না হইলেও ভারতবর্ষে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। সেই প্রতিষ্ঠান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতি

রবীন্দ্রের নিজনকেন্দ্র বিশ্বভারতীর অন্যতম অংশ হইলে, ব্যবস্থাটি সর্বাপেক্ষা যথাযোগ্য ও শোভন হইবে।

আষাঢ়, ১৩৪৭

গ্রাম-পুনর্জীবনের ঐকান্তিক প্রয়োজন

আমরা সবাই জাতিগঠনের কথা বলি। এই যে জাতি ইহার বাস কোথায়? বাংলাদেশের প্রত্যেক ১০০০ (এক হাজার) লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৭৩ জন শহরে বাস করে। বাকী হাজার-করা ৯২৭ জন গ্রামে বাস করে। শহরগুলারও অধিকাংশ গ্রাম। কারণ, যে-সকল লোকালয়ের লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার মাত্র, তাহাদিগকেও শহর ধরা হইয়াছে। সুতরাং ইহা কবি উক্তি নহে যে, আমাদের জাতি বাস করে গ্রামে।

আমরা যদি বঙ্গে জাতিগঠন করিতে চাই, যদি জাতির উন্নতি করিতে চাই, গঠনমূলক কার্য করিতে চাই, তাহা হইলে গ্রামবাসী হাজার-করা ৯২৭ জন মানুষের কথা ভুলিয়া থাকিলে তো চলিবেই না, প্রত্যুত প্রধানতঃ তাহাদের উন্নতি সাধনেই আমাদিগকে ব্যাপৃত হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ইহা বহু পূর্বে বুঝিয়াছিলেন এবং প্রধানত নিজের জমিদারীতে গ্রামোন্নতির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। পরে তিনি বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কার-বিভাগ খুলিয়া সুরুল গ্রামের শ্রীনিকেতনকে তাহার কেন্দ্র করেন। স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া গ্রামের জন্য আত্মোৎসর্গের মহনীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

আষাঢ়, ১৩৪৭

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী

গত বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিক সভার কাজ শেষ হইবার পর শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক দ্বিজেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। এ পর্যন্ত তাহা না-হওয়ায় মনে হইতেছে, বসুমহাশয় হয়ত ইহা ব্যক্তিগতভাবে

বলিয়াছিলেন, পরিষদের সম্পাদকরূপে নহে; কিংবা হয়ত পরিষদ কলেজ ও স্কুলসমূহের গ্রীষ্মাবকাশ-অন্তে কলিকাতার পুনরায় অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাগমে 'গরম' হইয়া উঠিলে এই শতবার্ষিক উৎসব করিবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

শ্রাবণ, ১৩৪৭

সেকালে ও একালে মাতৃভূমির অপমানবোধ

বর্তমান যুদ্ধে ও অতীতকালের বহু যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মাতৃভূমি ও মাতৃভূমির সম্মানরক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছে। সে-বিষয়ে অতীতের মানুষ ও বর্তমানের মানুষে কোন প্রভেদ নাই।

ফ্রান্সের বর্তমান গবর্মেণ্ট রাজধানী ও দেশের কতকটা অংশ জার্মানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য বিষয়েও জার্মেণীর তাঁবেদারি করিতে রাজী হইয়াছেন। বহু ফরাসী মাতৃভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছেন। সেইরূপ বহু সহস্র ইংরেজ তাঁহাদের মাতৃভূমি গের্নসী ও যর্সী দ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছেন। সেখানে জার্মেনরা অবতীর্ণ হইয়া দম্ভ করিতেছে। এই ফরাসী ও ইংরেজরা স্বদেশপ্রেমিক ও সাহসী নহেন বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু মাতৃভূমির অপমান সম্বন্ধে সেকালের ও একালের ধারণা একটু প্রভেদ আছে। তাহার আভাস দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। তাহা "নকলগড" শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পুরাতন কবিতাটি হইতে বুঝা যাইবে।

জলস্পর্শ করব না আর—
চিতোর-রাণার পণ—
বুঁদির কেল্লা মাটির পরে
থাকবে যতক্ষণ।
কী প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধবে তা আজ,
কহেন মন্ত্রীগণ।

কহেন রাজা, সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।
বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে
যোজন তিনেক দূর
সেথায় হারাবংশী সবাই
মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে হানা
ভয় কারে কয় নাইকো জানা,
তাহার সদ্য প্রমাণ রাজা
পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি
যোজন তিনেক দূর
মন্ত্রী কহে যুক্তি করি—
আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী।
মন্ত্রী দিল চিতোর মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য
হারাবংশী বীর
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনুতীর
খবর পেয়ে কহে—কেরে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে

হারাবংশী রাজপুতেরে
করবে নতশির।
নকল বুঁদি রাখব আমি
হারাবংশী বীর।

মাটির কেল্লা ভাঙতে আসেন
রাণা মহারাজ
দূরে রহ—কহে কুম্ভ
গর্জে যেন বাজ।
বুঁদির নামে করবে খেলা
সইব না সে অবহেলা—
নকল গড়ের মাটির ঢেলা
রাখব আমি আজ।
কহে কুম্ভ—দূরে রহ
রাণা মহারাজ।

ভূমির পরে জানু পাতি
তুলি ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে
নকল বুঁদি গড়।
রাণার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে,
খেলা-গড়ের সিংহ দ্বারে
পড়ল ভূমি পর
রক্তে তাহার ধন্য হল
নকল বুঁদি গড়।

রাণার ভৃত্য কুম্ভ একালের স্বদেশভক্তদের মত বুদ্ধিমান ছিল না। কিন্তু তথাপি তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। একালে লোকে আসল মাতৃ-

ভূমি ও তাহার রাজধানী বিধ্বস্ত হইতে দিতে বাধ্য হয় সেকালে তাহার নকলের উপর উদ্যত আঘাতও অসহনীয় মনে হইত।

শ্রাবণ, ১৩৪৭

স্বামী পরমানন্দ

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরমানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ৩৪ বৎসর সেখানে অগণিত বক্তৃতা, গদ্যে ও পদ্যে ২৬টি গ্রন্থ রচনা, মেসেজ অব্ দি ইস্ট নামক পত্রিকা সম্পাদন, বহু প্রবন্ধ রচনা, কয়েকটি আশ্রম স্থাপন এবং সর্বোপরি, নিজ আত্মোৎসৃষ্ট পবিত্র জীবন দ্বারা ঐ মহাদেশে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে যে সভা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের নিম্ন মুদ্রিত বাণী পঠিত হয়।

> "আমেরিকায় ভ্রমণকালে একদিন স্বামী পরমানন্দের আথিত্য লাভ করেছি এবং দেখেছি সেখানে জনসমাজে তাঁর কী সম্মান। আমাদের দেশের পক্ষে তাঁর অকালমৃত্যু শোচনীয়। পাশ্চত্য মহাদেশে তিনি ভারতবর্ষের নামকে জয়যুক্ত করেছেন। এই তাঁর কীর্তির জন্য তাঁর স্বদেশের সকৃতজ্ঞ স্মৃতিকে তিনি সংগে বহন করে নিয়ে গেলেন একথা ভোলবার নয়।"

শ্রাবণ, ১৩৪৭

হলওএল-স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের দাবী

হলওএল-স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন দ্বারা কাহার কলংক চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা হইয়াছে, অথবা, অনভিপ্রেত হইলেও, তাহার দ্বারা কাহার কলংকের স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে এই মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ পড়া আবশ্যক।

এই মনুমেণ্টটার ধ্বংস বা অপসারণ যে উচিত সে বিষয়ে অনেকেই একমত। ...লর্ড কার্জনের আমলে যে দিল্লী দরবার হয়, তাহার উদ্যোগকালে রবীন্দ্রনাথ

"অত্যুক্তি" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি ভারতীয় অত্যুক্তি ও বিলাতী অত্যুক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ও উভয়ের দোষ দেখাইয়া তাহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখান। এই প্রবন্ধটি তাঁহার 'রাজা প্রজা' গ্রন্থে আছে। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

ঠিক খাঁটি বিলাতী অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেণ্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সামনে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়ীভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামী। আমরা কিছু প্রাচুর্যপ্রিয়, আঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখো না আমাদের কাপড় গুলা ঢিলাঢিলা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি—ইংরাজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই—এমন কি, আমাদের মধ্যে আঁটিতে আঁটিতে ও কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা হয় প্রচুর রূপে নগ্ন, নয় প্রচুর রূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্তাও সেই ধরণের, —হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি, নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত, নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য নাই,—তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটি চাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির অতিটুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলঙ্কার, তাহা অসঙ্কোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির অতিটুকুই গভীর ভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়—বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পড়ে।

আমরা হইলে বলিতাম অন্ধকূপের মধ্যে হাজার লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে এক ঠেলায় অত্যুক্তির মাঝদরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হলওয়েল সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট হিসাবে গণনা করিয়াছেন। সে সত্যের কোথাও কোন ছিদ্র নাই। ওদিকে যে গণিতশাস্ত্র তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে, সেটা খেয়াল করেন

নাই। হলওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কতরূপে ধরা পড়িয়াছে তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ভালরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।

ভাদ্র, ১৩৪৭

রবীন্দ্র-রচনাবলী-চতুর্থ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী—চতুর্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকতা। মূল্য—কাগজের মলাট ৪॥০, রেক্সিনের বাঁধাই ৫॥০, মোটা কাগজে ছাপা ও রেক্সিনের বাঁধাই ৬।।০, কবির সাক্ষরসহ বিশিষ্ট সংস্করণ চামড়ার বাঁধাই ১০ টাকা।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই বড় বড় খণ্ডগুলির নিয়মিত প্রকাশ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের প্রশংসার বিষয়।

এই চতুর্থ খণ্ডে স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার রবীন্দ্রনাথ, 'সাধনা'-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, ত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথ, এবং পিতৃশ্রাদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ, কবির এই চারিখানি ছবি আছে। তদ্ভিন্ন 'বিদায়-অভিশাপ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার ছবি আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার রবীন্দ্রনাথের ফোটো গ্রাফটিতে যে কঠোর দৃঢ় সংকল্পের ব্যঞ্জনা লক্ষিত হয়, তাঁহার অন্যান্য ফোটোগ্রাফে তাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না।

এই খণ্ডে আছে—কবিতা ও গান "নদী" ও "চিত্রা"; নাটক ও প্রহসন "বিদায়-অভিশাপ," "মালিনী" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা"; উপন্যাস "প্রজাপতির নির্বন্ধ" এবং প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ" ও "চারিত্র পূজা"।

"ভারতবর্ষ" গ্রন্থখানি কবি স্বদেশী আন্দোলনের সময় লিখিয়াছিলেন। ইহার অনেক প্রবন্ধ পরে আর কোনও গ্রন্থে প্রচলিত ছিল না। রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে আছে 'নববর্ষ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ব্রাহ্মণ', 'চীনেম্যানের চিঠি', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা', 'বারোয়ারি মঙ্গল', 'অত্যুক্তি', 'মন্দির', 'ধম্মপদং', ও

'বিজয়া-সম্মিলন'। 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে হলওয়েল মনুমেণ্ট সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন, আমরা শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

"চারিত্র পূজা" গ্রন্থে আছে 'বিদ্যাসাগর চরিত ১, 'বিদ্যাসাগর চরিত' ২, 'রামমোহন রায়' 'মহর্ষি জন্মোৎসব', 'মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রার্থনা' ও 'মহাপুরুষ'।

শ্রাবণ মাসে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভা অনেক জায়গায় হইয়া গিয়াছে। সেই গুলির অন্ততঃ কোন কোন বক্তা ও শ্রোতা তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুটি পড়িয়া থাকিলে উপকৃত হইয়াছেন।

চতুর্থ খণ্ডের 'গ্রন্থ পরিচয়'টি সাতিশয় মূল্যবান। অনেক রচনা প্রথমে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, পরবর্তী কোন কোন সংস্করণে তাহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের উল্লেখ ও পুনঃপ্রকাশ এই গ্রন্থ পরিচয়ে পাওয়া যাইবে। কোন কোন রচনার কবির স্বকৃত ব্যাখ্যাও ইহাতে আছে।

(পুস্তক পরিচয় অংশ থেকে উদ্ধৃত)

ভাদ্র, ১৩৪৭

কবির অভয়বাণী

যে ২২শে শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্নে রবীন্দ্রনাথ উক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই দিন প্রাতে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনা কালে তিনি যে মহৎ উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন, তাহার অনুলিপি তাঁহার দ্বারা সংশোধিত হইয়া আসিলে প্রকাশিত হইবে।

জগৎজোড়া একটা আতঙ্কের আবির্ভাব হইয়াছে বুঝি বা বর্তমান যুদ্ধের ফলে মানব-সভ্যতা লুপ্ত হয়। কবি এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁহার মহতী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে পুরাকালে বহু জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূভাগের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। যখন সেই সমুদয় ঘটিয়াছিল, তখন মানুষ ভাবিয়া থাকিবে সৃষ্টি বুঝি লোপ পাইল, প্রলয় উপস্থিত। কিন্তু সেই সমুদয়ের মধ্য দিয়া পৃথিবী পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেইরূপ নানা বিপ্লব, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষ ও তাহার সভ্যতা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বস্তুতঃ মানবসৃষ্টি এখনও শেষ হয় নাই। সভ্যতায় ভাঙণ ধরে নাই, সভ্যতা এখনও পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কবির বাণীর কিয়দংশ আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি।

তাহার একটি অসম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত, অসংশোধিত অনুলিপি নীচে মুদ্রিত হইল।

> সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা প্রথমে একটা আবরণ রচনা করেন। সেই আবরণের ভিতর দিয়ে সৃষ্টির কার্য চলে এবং তারই ভিতরে হয় সৃষ্টির পরিণতি। প্রথমে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থাকে কিন্তু নানা কাজের মধ্য দিয়ে আসে তার পরিণতি—যেমন করে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে জ্যোতি। আদি সৃষ্টির মূলে অংগার-বাষ্প আবিল করে রেখেছিল এই পৃথিবীকে। প্লাবনের মধ্য দিয়ে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছিল এর প্রকৃত রূপ। সূর্যকে প্রথমে অবরুদ্ধ করেছিল প্রকাণ্ড বাষ্প-আবরণ, কিন্তু তার আলোক এসে পৌঁছেছিল নবসৃষ্টির উদ্যমে পীড়িত পৃথিবীর বুকে ঐ প্রকাণ্ড আবরণ ভেদ করে। তেমনি করে মানবলোকে এসে পৌঁছেছে মহামানবের বাণী। অনেকে বলেন পৃথিবীর সৃষ্টি এখন জরাগ্রস্ত—ভাংগনের চিহ্ন পড়েছে তাতে। কিন্তু আমি তা মনে করি নে। মানবের সম্পূর্ণ সৃষ্টি এখনও হয় নি, মানবের মধ্যে এমন কিছু আছে যার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি, এখনও যা রয়েছে অসম্পূর্ণ। বস্তুতপক্ষে মানব-সৃষ্টি এখনও শেষ হয় নি।
>
> যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা দিয়েছেন আশার বাণী। যেমন করে আদিম সৃষ্টিতে দেখা গিয়েছে মহাসমুদ্রের ভিতর হতে দেশ-মহাদেশের ক্ষীণ আভাস, যেমন করে সূর্য আপনার আবরণকে পেরিয়ে এসেছে পৃথিবীতে তেমনি করে মহাপুরুষরা এনেছেন আশার বাণী। সমস্ত প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে সে কাজ করবে। সে রোপিত হয়েছে মাত্র কিন্তু অংকুরিত হয়নি। বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষরা ঐতিহাসিক নির্দেশ-ক্রমে জন্মেছিলেন গত দিনে, কিন্তু তাঁদের কাজ তো গত হয়নি। তাঁরা যে ভাবী কালের তাঁরা চিরকালের, ভবিষ্যতের। তাঁদের যথার্থ তারিখ হবে সে দিন যখন দেখা যাবে তাঁদের কর্মের ধারা পেয়েছে যথার্থ সুন্দর রূপ—যেদিন তাঁদের বাণী হবে প্রতিষ্ঠিত।

কোথা হতে এই মহামানবেরা প্রেরণা পেয়েছেন? কে তাঁদের পাঠিয়েছিল এই পঙ্কিল আবিলতাপূর্ণ পৃথিবীতে? ভবিষ্যৎ কালের জন্য যে বাণী তাঁরা রেখে গেছেন, অতীতকালে সেই বাণী তাঁরা কোথায় পেয়েছিলেন? যাঁরা বলেন তাঁদের বিশ্বাস করা যায় না, যাঁরা এর প্রতিবাদ করেন, তাঁরা ত বলতে পারেন না কোথায় পেয়েছেন এই মহামানবেরা বাণী। এ তো প্রতিবাদ করার সময় নয়—সে বাণী যে আজও শুনতে পাচ্ছি। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি মানুষ, এখনো রয়েছে তারা আদিম হয়ে; তাই তারা পায় না শুনতে সেই মহান বাণী। এই অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে উঁকি মেরেছে সেই মহাপুরুষদের মহান মন্ত্র—তাঁরা অভয় দিয়ে গিয়েছেন। তাতে সত্যতা নেই বলে উপেক্ষা করলে চলবে না। মানুষ এখনও প্রস্তুত হয়নি সেই মহান আদর্শ গ্রহণ করতে। তারা এখনও পঙ্কসলিলে অধঃনিমজ্জিত। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম যেদিন মানুষ গ্রহণ করবে এই বাণীকে—উপলব্ধি করবে তার সত্যতাকে। এখন যারা প্রতিবাদ জানাবে তারা অশ্রদ্ধেয়—তাদের প্রতিবাদের কোন মূল্য নেই। তাদের প্রতিবাদ দাঁড়াতে পারে না—উপেক্ষা করতে পারে না সেই মহা মন্ত্রকে। যাঁরা সর্বমানবকে স্বীকার করেছেন—যাঁরা সর্বপীড়িতের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের সেই বাণী রয়েছে চিরন্তন সত্য হয়ে, তা যে মিথ্যা হতে পারে না। তাঁরা যে এই পঙ্কিল পৃথিবীর অনেক উর্ধে। তাই আজ বিশ্ব নৃশংসতার মধ্য দিয়ে আমি তাঁদের বার বার প্রণাম করি।

মানবের সভ্যতাকে আমরা হাতড়ে বেড়াই, কিন্তু খুঁজে পাই নে। সেই জন্য আমাদের প্রার্থনা—হে জ্যোতির্ময় পুরুষ, তুমি মানবের চিরন্তন সত্যকে আমাদের কাছে নিয়ে এস। আমরা যে অসত্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই অসত্যকে ঘুচিয়ে দাও; আমরা যে অন্ধকারে আবদ্ধ, সেই অন্ধকারলোকে জ্যোতি নিয়ে এস। তোমার আবির্ভাব আমাদের মধ্যে হউক, তোমার ও আমাদের বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে তোমার সত্য রূপ, তোমার জ্যোতির্ময় রূপ আমাদের আত্মাতে প্রকাশ কর।

ভাদ্র, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথের নূতন 'সম্মান'

উক্তীর্থ বিশ্ববিদ্যালয় (Oxford University) রবীন্দ্রনাথকে সম্মানার্থ সাহিত্যাচার্য (Doctor of Literature, *honoris causa*) উপাধি দিয়া যে স্বয়ং সম্মানিত হইয়াছেন, তাহা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দাতা প্রতিনিধি ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর মরিস গোয়াইয়ার (Sir Maurice Gwyer) তাঁহার বক্তৃতায় স্বয়ং বলিয়াছেন ("the University whose representative I am has in honouring you, done honour to itself.")। ইহাও সত্য যে এই সম্মান রবীন্দ্রনাথ না পাইলে তাঁহার কিছুই অগৌরব হইত না, পাওয়াতেও গৌরব বাড়িল না। তথাপি ইহা তুচ্ছ নহে। উক্তীর্থ বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার জ্ঞানগৌরব আছে। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী জাতির প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়াও ইহার একটা লৌকিক প্রতিষ্ঠা আছে। তাহার পক্ষে পরাধীন ভারতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় কবিকে সম্মান প্রদান দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। বিদ্যা সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক প্রতিভায় শ্রেষ্ঠতা অস্তিত্বের অন্ততঃ পরোক্ষ প্রমাণ, ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা না মানিতে পারে, কিন্তু উক্তীর্থের মত রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় যখন এ-সকল বিষয়ে যোগ্যতার আদর করিয়াছেন, তখন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও এই উৎকর্ষ মানিয়া লওয়ার প্রভাব পড়িবেই।

কবির ব্যক্তিত্বে ও জীবনে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সহিত তাঁহার স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক মত ও কার্যের যোগ যে মধ্যে মধ্যে হইয়াছে তাহা বিচারপতি হেওয়ার্স স্বরচিত ও স্বকথিত কবিসার্বভৌমের সত্য প্রশস্তিতে বলিয়াছেন।*

*"Let it also be said that he has not valued a sheltered life so far above public good as to hold himself wholly aloof from the dust and heat of the world outside; for there have been times when he has not scorned to step down into the market-place; when if he thought that a wrong had been done, he has not feared to challenge the British raj itself and the authority of its magistrates; and when he has boldly corrected the fault of his own fellow-citizens."

রবীন্দ্রনাথকে সম্মানদানের নিমিত্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং মরিস গোয়াইয়ারের সমক্ষে উপস্থিত করা উপলক্ষ্যে লাটিন ভাষায় লিখিত এই প্রশস্তিটি পঠিত হয়। ইংরেজী অনুবাদে ইহার উৎকর্ষ কতকটা বুঝা যায়। মূল লাটিনে বোধ হয় ইহা আরও উৎকৃষ্ট। কিন্তু বিচারপতি হেণ্ডার্সন যেরূপ গড়গড় করিয়া লাটিন পড়িয়া গেলেন, তাহাতে কোন বাগ্মিতা না-থাকায় শুনিয়া রচনাটির বিষয়গৌরব বা ভাষায় উৎকর্ষ কিছুই বুঝা যায় নাই। সর মরিস গোয়াইয়ারের বক্তৃতা এবং কবির প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যক্তিগত আচরণ ও ভঙ্গী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সংস্কৃত লাটিন ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা না মানিলেও তাহাতে সত্য আছে এবং তাহাতে বক্তার বিজেতৃজাতিসুলভ দম্ভের অভাব সূচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্যাচার্য' পদবী সম্মান দিবার কথা অনেক বৎসর পূর্বে উঠিয়াছিল। তখন তাহা দেওয়া হয় নাই। এখন দিবার রাজনৈতিক কারণ হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রতীচ্য এক প্রভুজাতির রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বারা প্রাচ্যের এক পরাধীন দেশের কবিঋষিকে সম্মানপ্রদান স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া থাকিবে।

ভাদ্র, ১৩৪৭

গান্ধীজীর বর্তমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের পন্থানুযায়ী

মালিকান্দায় গান্ধী সেবাশ্রম সংঘ ভাঙিয়া দিবার আগে হইতেই গান্ধীজীর গ্রামিক "গঠনমূলক" কাজে ঝোঁক ছিল। পরে তাহা বাড়িয়া চলিছে। মান্দ্রাজের দৈনিক "হিন্দু"তে প্রকাশিত নিম্নমুদ্রিত টেলিগ্রামটিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি বলিয়াছেন,

> সেবাগ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করা নিশ্চয়ই তাঁহার বর্তমান 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা'। এক জন মানুষের পক্ষে কোন দিন একটি গ্রামসম্পর্কে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা সম্ভব হইলেও সমগ্র ভারতবর্ষকে ঐরূপ সফল কার্যক্ষেত্রে পরিণত করার পক্ষে একজন মানুষের আয়ু অত্যন্ত

অল্প। কিন্তু যদি কেহ একটি আদর্শ গ্রাম উৎপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তদ্বারা শুধু সমগ্র দেশকে নহে, হয়ত সমগ্র পৃথিবীকে একটি আদর্শ দিয়া যাইতে পারেন।

TO MAKE SEVAGRAM AN IDEAL VILLAGE

GANDHIJI'S PRESENT AMBITION

BOMBAY, Aug. 4

Referring to his own example Gandhiji says that his present ambition is certainly to make Sevagram an ideal village. "While it is possible for one man to fulfil his ambition with respect to a single village some day," he adds, "one man's life-time is too short to overtake the whole of India. But if one man can produce one ideal village he will have provided the pattern not only for the whole country but perhaps for the whole world."—United press.

বৎসরাধিক পূর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে ছিলেন, তখন তথাকার কর্মীদের কাছে তাহার ইতিহাস ও আদর্শ বিষয়ে যাহা বলেন, তাহার অনুলেখন গত বৎসরের ভাদ্রের প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল তাহার উপসংহার নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

সব শেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই; চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোট গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্রে কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয় খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে—এই কথা তখন মনে জেগেছিল এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই ক-খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে—সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান বাজনা কীর্তন পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক-খানা গ্রামকে এই ভাবে তৈরি করে দাও।

রবীন্দ্রনাথের এক বৎসর আগেকার উক্তি এবং গান্ধীজীর কয়েকদিন আগেকার উক্তির মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা ভাব ও চিন্তার মিল ত বটেই, অধিকন্তু ভাষারও মিল। ইহাকে আকস্মিক বলা যায় কি ?

ভাদ্র, ১৩৪৭

শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

গত ২২শে শ্রাবণ ৭ই আগস্ট অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় শান্তিনিকেতনে সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য (ডি. লিট.) উপাধিদান উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস গোয়াইয়ার ও সর্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি পদে বৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রগণ, বিশ্বভারতী সংসদের সদস্যগণ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধিগণ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ ও বিশ্বভারতীর সুহৃদ্ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সূচনায় নিম্নলিখিত স্বস্তিবাচন করেন :

স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সংগমেমহি ॥

সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমরা কল্যাণের পথ অনুসরণ করিব, মহানুভব জ্ঞানীজনদিগের সহিত সম্মিলিত হইব।

যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥

অমরগণ যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন এবং মানবলোকদ্বারাও যাঁহারা সম্মানিত যাঁহারা নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা আমাদিগকে মহত্ত্বের পথ প্রদর্শন

করুন। হে জ্ঞানীবৃন্দ, আপনাদের মঙ্গলকামনার দ্বারা আমাদিগকে পরিচালিত করিতে থাকুন।

অতঃপর আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণ নিম্নমুদ্রিত অভিনন্দনসংগীত গান করেন।

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে
বরপুত্রসংঘ বিরাজ হে।
ঘনতিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহ জ্যোতিদীক্ষা
যাত্রীদল সব সাজ হে,
দিব্যবীণা বাজ হে।
এস কর্মী, এস জ্ঞানী
এস জনকল্যাণধ্যানী,
এস তাপস-রাজ হে।
এস হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে॥

অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হেণ্ডার্সন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সর্ মরিস গোয়াইয়ারকে সম্বোধন করিয়া, নিম্নমুদ্রিত কবি প্রশস্তি পাঠ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী উহা মূলত লাটিন ভাষায় পঠিত হয়; সর্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উহার একটি ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন।

"অক্সফোর্ড-জননী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপমাণ্ডলিক ও অধ্যক্ষবর্গের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত মাননীয় মহাশয়, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান অদ্য আপনার সম্মুখে বর্তমান, "মহৎ বংশধারা মহৎ পিতৃপুরুষগণেরই পরিচায়ক," হোরেসের এই বাণীর যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

"অদ্য আমি তাঁহার পিতামহকে স্মরণ করি, তিনি এক নবধর্মমণ্ডলীর ভ্রাতৃসঙ্ঘের অন্যতম ছিলেন, যে-সকল ভারতীয় সর্বপ্রথম সমুদ্র পার হইয়া ব্রিটেনে গিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদেরও একজন। দৃঢ়চেতা, গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ধর্মনায়ক, তাঁহার পিতৃদেবকে স্মরণ করি, মনীষা ও ধর্মপরায়ণতায় যিনি দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভাশালিনী জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে [স্বর্ণকুমারী দেবী] স্মরণ করি, ভারত-মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় জীবনযাত্রা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতৃত্রয়কে স্মরণ করি, তাঁহাদের মধ্যে একজন [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রথম ভারতীয় ; একজন [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] দার্শনিক রূপে, একজন [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর] সাহিত্যে ও কলাবিদ্যার চর্চায় সম-সাময়িক যুগে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিনি আজ আপনার সম্মুখে বর্তমান, তিনি তাঁহার জীবনে, তাঁহার চরিত্র-গৌরবে, তাঁহার প্রতিভাবলে, তাঁহার বংশগৌরব বহুগুণে বর্ধিত করিয়াছেন ; বিনয় ও সাধুতা তাঁহাকে গর্বিত হইতে দিবে না, নহিলে, "আমার জীবন আমার পুণ্য বংশের শ্রেষ্ঠ ভূষণ" স্কিপিয়োর এই উক্তিতে অধিকার তাঁহার অপেক্ষা অন্য কাহারও অধিক নাই। তিনি একজন বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ, গদ্যে ও পদ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; কাব্য, ইতিহাস, ব্যঙ্গরচনা, উপন্যাস. সকলই তিনি লিখিয়াছেন ; সাহিত্যের কোন বিভাগই তাঁহার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় নাই, সাহিত্যের যে-বিভাগেই তিনি হাত দিয়াছেন তাহাকে অলংকৃত করিয়াছেন। কল্পনার সম্পদের সহিত রচনারীতির সৌষ্ঠবের এইরূপ সম্মিলন অসাধারণ। তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা ও বিস্তার, হাসির সঙ্গে মনীষার, ভীষণের সহিত আনন্দের এমন মিলন, আমাদের হৃদয়ের গভীরতম আবেগকে উদ্বোধিত করিবার এমন ক্ষমতা—এ অতি বিস্ময়কর। সর্বোপরি স্মরণ করিতে হয়, তাঁহার ঐকান্তিক মানব ধর্মের কথা—মানবজাতির সহিত যে কোন ভাবে সম্পর্কিত এমন কিছুই তাঁহার কাছে তুচ্ছ নহে। গীতিকাররূপে যিনি কোনো বন্ধনই মানেন না, তিনিই আবার অসংখ্য সুর-রূপের স্রষ্টা ; শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তিনি তত্ত্ববিদ্যাকে অধি-গত করিয়াছেন ; বহুজনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু স্বল্পজনসাধ্য সুদুর্লভ চিত্তস্থৈর্য লাভ করিয়া তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। এই বিচিত্র সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াও তিনি একান্তভাবে আত্মগত জীবন যাপন করেন নাই ; তরুণবয়স্কদিগের সুশিক্ষার জন্য তিনি এই সুবিশ্রুত শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছেন ; বিচক্ষণ প্রণালীতে ছাত্রদের অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পিপাসা জাগরূক করাই এই বিদ্যালয়ের আদর্শ। মানবকল্যাণের ঊর্ধ্বে নিভৃত জীবনকেই কাম্য বলিয়া মানিয়া বৃহত্তর জগতের তাপ-মলিনতা হইতে তিনি একান্তভাবে দূরে থাকেন নাই ; প্রয়োজন যখন হইয়াছে তখন তিনি হাটের ধূলার মধ্যেও নামিতে দ্বিধা করেন নাই ; অন্যায় ঘটিতে যখন দেখিয়াছেন

ব্রিটিশরাজ ও তন্নিযুক্ত শাসকদিগের কাজের বৈধতা অস্বীকার করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই, এবং দেশবাসীর দোষত্রুটির সমালোচনাও তিনি নির্ভীকভাবেই করিয়াছেন। আর কি বলিব? বিচিত্রমনা কবি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুরগুরু, কায়মনোবাক্যে দার্শনিক, জ্ঞান ও তত্ত্বের ধারক, স্বাধীনতার সাধক আপনার সম্মুখে বর্তমান, জীবন ও চরিত্রবলে ইনি বিশ্বমানবের শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই তিনি নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপমাণ্ডলিক, আচার্য ও অধ্যক্ষবর্গের সকলের সম্মতিক্রমে অক্সফোর্ডের জয়মাল্যে বিভূষিত ও সম্মানহেতুক সাহিত্যাচার্য পদে বৃত হইবার নিমিত্ত সর্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রীবৃন্দের প্রিয়তম রবীন্দ্রনাথকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।"

সর্ মরিস গোয়াইয়ার অতঃপর নিম্নানূদিত মন্তব্য দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ডের সম্মানিত সাহিত্যাচার্যপদে বরণ করেন।

হে ভক্তিভাজন মনীষী, বাণীর প্রিয়তম সাধক, সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারবলে ও উপমাণ্ডলিকের পক্ষ হইতে আমি আপনাকে সম্মানিত সাহিত্যাচার্য উপাধিতে বরণ করি।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নিম্নমুদ্রিত অভিভাষণটি পাঠ করিয়া এই উপাধি গ্রহণ করেন:

ভবন্ত উক্সতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিভূব!

এবোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য। তং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রথা বিদ্যাভূমিনন্দনমাত্মনো মানবধর্মায়াযমেব মহান্তমাবিষ্কর্তুমীহতে যস্য খল্বর্থঃ সাম্প্রতমতিতরাং গম্ভীরশ্চানতিপাত্যশ্চ সংবৃত্তঃ। গর্ব্বোত্তানং মে চিত্তং প্রতিপদ্যাস্য বাচিকং প্রতিপত্তি চৈতাং প্রহিতাং প্রতীকমিবানশ্বরং মানবধর্মাত্মনঃ। সভাজয়ামি ভবতোঽত্র শান্তিনিকেতনে। যদেতদনর্ঘমুপায়ন মানীতম্ ভবদ্ভির্মদর্থং মদ্দেশার্থঞ্চ চিরং তদবস্থাস্যতেঽস্মৎ হৃদয়েষু সম্পৎস্যতে চ তত্ত্ববতামস্মাকং চ সাধারণসংস্কৃতি সম্পত্তয় ইতি প্রতিযন্তু ভবন্তঃ।

স খল্বয়ং কালঃ প্রবর্দ্ধতে যত্রাতঙ্কঃ। তিরোধত্তে গুণঃ। প্রসরত্যশিষ্টত্বং নিরঙ্কুশম্। প্রবর্ত্ততে চ পশুচিতা স্পৃহা ভোগে সমুপচীয়মানা ভূতবিদ্যয়া।

অস্মিন হি ব্যতিকরে কস্যাপি ভুবনব্যাপিনঃ সম্বন্ধস্য বীজসমুদ্গমোক্তির্নাম কদাচিৎ কবিজনোচিতেব প্রতীয়তে।

তথাপি তু সংযম্যতে কালস্তর্জ্জয়ন্নপি নিরন্তরম্। কিঞ্চ যে নাম বয়মতীত্যাপ্যেনং জীবামঃ প্রতীমশ্চ যদার্য্যধর্ম্মশ্চরমার্থসম্পত্তয়ে বর্দ্ধতৈব নিত্যমতি তৈরস্মাভিঃ সেয়ং প্রতীতিরবশ্যং প্রত্যগ্রীকরণীয়া।

ক্ষেমং বতেদং নিমিত্তং কস্যাপ্যনাগতস্য সময়স্যেতি প্রতিগৃহ্যতে ময়ৈষা প্রতিপত্তির্বিহিতোক্সতীর্থবিশ্ববিদ্যালয়েন। নূনং ন জীবিষ্যাম্যহমবলোকয়িতুমেনং প্রতিশ্ঠিতম্। সভাজনীযস্তেন তস্য সপ্রণয়ঃ সঙ্কেতঃ সংগর ইব দিবসানাং প্রশস্যতরাণামিতি শিবম্॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংস্কৃত অভিভাষণের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেন। নিম্নে তাহার মর্মানুবাদ মুদ্রিত হইল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ,

ভারতবর্ষের কবি আমাকে সম্মানিত করিয়া আপনাদের প্রাচীন বিদ্যাভূমি স্বীয় মানবধর্মের মহৎ ঐতিহ্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। আজিকার দিনে এই ঐতিহ্যের একটি গভীর ও গুরুতর দ্যোতনা আছে। ইহার বাণী যে সম্মান বহন করিয়া আনিয়াছে, অবিনশ্বর মানবধর্মের প্রতীকরূপে আমি গর্বিত হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিলাম। শান্তিনিকেতনে আপনারা সুস্বাগত; আমার ও আমার স্বদেশের জন্য আপনারা যে সৌহৃদ্যের অর্ঘ্য আনিয়াছেন তাহা চিরদিনের জন্য আমাদের হৃদয়ে আসন লইল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের উভয়কে ঐক্যবদ্ধ হইতে তাহা সহায় হউক।

আজিকার যুগে চারিত্রবল অন্তর্হিত, বেদনা পুঞ্জীভূত, দেশ-মহাদেশ সর্বনাশের কবলিত, বর্বরতা মুক্তবন্ধ, পাশবিক অধিকার-তৃষ্ণা বিজ্ঞানের সহায়ে বিস্তারিত—এ সময়ে বিশ্বমানবের ঐক্যতত্ত্বের কথা হয়ত কবিজনোচিত শুনাইবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কালের রূপ যতই ভয়ংকর হউক, তাহার প্রকোপ চিরন্তন নয়—এই বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া কালের বৃহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে আমরা যাহারা বাঁচিবার প্রয়াসী, মানব-সংস্কৃতি নিরন্তর এক চরম লক্ষ্যের অভিমুখে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, হৃদয়ে এই প্রত্যয় আমরা দৃঢ় রাখিব। অনাগত যুগের সূচনাস্বরূপ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিনন্দন আমি গ্রহণ করিলাম; আমার

জীবিতকালে সে-যুগ আমি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারিব না, তথাপি মহত্তর ভবিষ্যতের নির্দেশকরূপে এই প্রীতির অর্ঘ্যে আমার মন আনন্দিত।

অতঃপর সর্ মরিস গোয়াইয়ার রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধনপূর্বক তাঁহার ইংরেজী অভিভাষণ পাঠ করেন। নিম্নে তাহার অনুবাদ মুদ্রিত হইল।

মহাশয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে আমি তাঁহার তরুণতম আচার্যকে প্রণতি জ্ঞাপন করি। আমি যাঁহার প্রতিনিধি সেই বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে সম্মানিত করিয়া নিজেই সম্মানিত হইয়াছেন—এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিয়া আমি কৃতার্থ। যে-ভাষা আমি বলিতেছি এবং যে-ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার স্বীয় বাণী প্রেরণ করিয়াছেন উভয়েরই সম্মানার্হা জননী যে-ভাষা সেই প্রাচীন ভাষায় আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপহার গ্রহণ করিয়াছেন—আপনার সুললিত বাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়কে নিবেদন করিতে আমি বিস্মৃত হইব না।

মহাশয়, আপনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে-যুগের আপনি অলংকারস্বরূপ, সে-যুগে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের আসন অপরাপর কালের তুলনায় অতি উর্ধে ; কিন্তু তাহাই যে যথেষ্ট নয়, যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার সহিত সরলতা, সৌন্দর্য ও মাধুর্যকেও যে স্থান দিতে হইবে, এ-কথা আপনি সর্বদাই বলিয়াছেন। শান্তিনিকেতন ও আমার বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উভয়ের মধ্যে এই ঐক্যসূত্র বিদ্যমান যে, উভয়ই মানব ব্যক্তিত্বকে স্বীকার ও সম্মানকেই শিক্ষার প্রতিষ্ঠাভূমি করিয়াছে। অন্যের ব্যক্তিত্বকে স্বীকার না করিলে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রত্যাশা করা চলে না। তাই উভয় বিদ্যালয়ই পরমত-সহিষ্ণুতাকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া জানিয়াছে। ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি ; বস্তুত গণতন্ত্রের একটা আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, গণতন্ত্র শুধু একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো মাত্র নয়—গণতন্ত্রে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ সম্বন্ধে যত দূর সজাগ, সেই অনুপাতেই ইহা সাফল্য লাভ করিয়াছে ও করিবে।

আপনি ও আপনার সমধর্মীগণ যে-সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন ও নিজ জীবনে পালন করিয়াছেন, আজ এই দুঃস্বপ্নবেষ্টিত পৃথিবীতে তাহার বিষম বিপৎকাল উপস্থিত ; আজ দেখিতেছি যুক্তিকে কণ্ঠরোধ

করিবার প্রয়াস, পরমতসহিষ্ণুতাকে নিবারণ করিবার ও দানবিক জড়বাদের দ্বারা মানবতাকে নিষ্পিষ্ট করিবার চেষ্টা। এই দ্বন্দ্বে মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্যই বিনষ্ট হইবে এমন আশঙ্কা আছে। যদি পৃথিবীকে অন্ধকারময় যুগের পুনরাবর্তন হইতে রক্ষা করিতে হয় তবে শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চালাইতে হইবে—ইহাতে সন্ধির কোন অবসর নাই। একান্তমনে এতদিন যে-সকল বিশ্বাস লালন করিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা পরিহাস ছলনা না হয়, তবে এই দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি কি, সে-সম্বন্ধেও আমাদের কোন সংশয় থাকিতে পারে না—যদিও বহু রক্তপাত ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়া হয়ত সেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। কিন্তু জয়লাভ নিষ্ফল হইবে, চিত্তের যে সংযম দ্বারা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে সেই সংযমের মধ্যে নূতন যুগের মানুষ যদি না গড়িয়া উঠে। যে-সকল দুর্মতি আজ ইউরোপকে বিধ্বস্ত করিতেছে তাহারা নিজেদের কাজ ভালো করিয়াই জানে, তাই তাহারা যে-সব দেশ ধ্বংস করিয়াছে সে-সকল স্থানে বাছিয়া বাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলিকেই আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধ মহান উদ্দেশ্য লইয়া করা চলিতে পারে—যেমন বর্তমান যুদ্ধ চলিতেছে, এবং যুদ্ধের ফলে মানবের অনেক মহত্তম বৃত্তি উদ্বোধিত হইতে পারে সত্য কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুদ্ধ অতীব অকল্যাণকর অভিশাপ, এবং নিজে বিনষ্ট না হইলে ইহা সভ্যতাকেই বিনষ্ট করিবে। মিল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে, "শক্তিপ্রয়োগ করিয়া শত্রুকে জয় করিতে গেলে শত্রুকে পূর্ণ জয় করা যায় না, অংশতঃ জয় করা যায় মাত্র"; কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করিলে চলিবে না, চিন্তার রাজ্যে ও মনের ক্ষেত্রেও জয় করিতে হইবে—দার্শনিক ও শিক্ষাগুরুগণই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত সহায় হইতে পারেন।

বর্তমান যুদ্ধের পূর্ব হইতেই আমরা নৈরাশ্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, ভাবালুতা চিন্তার স্থান অধিকার করিতেছে, এবং স্বৈরপন্থী নায়কের ইচ্ছার নিকট অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছে। বিচিত্র কর্ম ও চিন্তার ধারা দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংস্থা যদি উজ্জীবিত না হয়, তবে গণতন্ত্র বা চিত্তের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত কোনও সমাজই বাঁচিয়া থাকিতে পারেনা। সুদৃঢ় মননশক্তি, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, বাস্তবের মুখোমুখি

দাঁড়াইবার সাহস, যে-সকল সমস্যার সমাধান জড়তাবশত আমরা করিতে পারি নাই তাহাকে স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি, অতীতের দাস না হইয়া বা ক্রমবিকাশের গতিরোধ না করিয়া প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা—ইহাই কি আজিকার দিনে আমাদের একান্ত প্রয়োজন নয়? শান্তিনিকেতনে ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, উভয় স্থানেই এই সকল নীতিই শিক্ষাদানপ্রণালীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

মহাশয়, আপনার স্বাগতবাণীর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, অদ্য এক প্রাচীন ও এক নবীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বন্ধন স্থাপিত হইল সেই সূত্রপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তি একীভূত হইয়া ধাবমান হউক এবং ভগবানের ইচ্ছায় উভয় দেশই পরস্পরের নিকট হইতে শক্তিলাভ করুক। সত্যজিজ্ঞাসা সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, নব-জীবন লাভের আশা ও শক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ততিদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হউক।"

নিম্নমুদ্রিত শান্তিবাচন উচ্চারিত হইলে অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হয়।

পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তি দ্যৌঃ
শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ
শান্তিঃ সর্ব্বৈঃ মে দেবাঃ শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ ॥
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ
শময়ামোহং যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং
তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ ॥

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে, জলে ওষধি বনস্পতিতে শান্তি বিরাজ করুক, দেবতারা আমাদের শান্তিদান করুন, যাহা ক্রূর, যাহা ভয়ানক তাহা শান্ত হউক, মঙ্গলকর হউক।

ভাদ্র, ১৩৪৭

লণ্ডনে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি ও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

প্রায় এক বৎসর কাল হইল, লণ্ডনে একটি বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিমাসে ইহার অধিবেশন হয় ও সাহিত্য আলোচনা ও নাটকাভিনয়াদি হয়। এই সমিতির উদ্যোগে এই [বৎসর] রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর শশধর সিংহ প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীমতী আশালতা ভট্টাচার্য এই সমিতির সভানেত্রী, ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাক্ষা-গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রামকান্ত ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক।

(দেশবিদেশের কথা)

আশ্বিন, ১৩৪৭

সম্মানীয়া প্রফুল্লময়ী দেবী

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ পরলোকগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ও পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতা শ্রীযুক্তা প্রফুল্লময়ী দেবী চুরাশি বৎসর বয়সে ঠাকুর পরিবারের জোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতীতের সহিত তাঁহাদের আর একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইল। প্রফুল্লময়ী দেবীর কিছু পুরাস্মৃতি কয়েক বৎসর পূর্বে 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আশ্বিন, ১৩৪৭

ভ্রম সংশোধন

শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে উপাধিদানের বিবরণে গত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

মহাশয় এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এই অনুষ্ঠানে মাল্যচন্দন দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিচারপতি হেণ্ডার্সন সাহেব এই অনুষ্ঠানে যে লাটিন বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রচিত ও মুদ্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছিল, সর্ মরিস্ গোয়াইয়ার উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মূল লাটিন বক্তৃতাটি যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রচিত হইয়া আসিয়াছিল তাহা আমরা জানিতাম না। ঐ বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমণ্ডলী যে রবীন্দ্রনাথকে এত গভীরভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়।

কার্তিক, ১৩৪৭

ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে তাঁহার বাল্যকালের কথা কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট বলেন নাই। "জীবনস্মৃতি" তাঁহার যে বয়সে আসিয়া থামিয়াছে, তাহাতেও পাঠকদের কৌতূহল অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। এই গ্রন্থ রচনার পরে তাঁহার কোন কোন মুদ্রিত বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে এবং অনুলিখিত কথোপকথনে তাঁহার জীবনের ঐ উভয় দিকের কিছু কিছু কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধে "ছেলেবেলা" বহিখানি লিখিয়া তিনি যে কেবল ছোট ছেলেমেয়েদেরই আনন্দসম্ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নহে, যে-সকল বৃদ্ধের মন একেবারে বুড়া ও পাকা হইয়া যায় নাই তাহাদিগকেও আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেবেলার কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে যত অল্প বয়সের কথা তাঁহার মনে আছে তখন হইতে এবং শেষ হইয়াছে লণ্ডনে অধ্যাপক হেনরি মর্লের ছাত্ররূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বৃত্তান্ত দিয়া। ভাষা মনোজ্ঞ ও বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে বলাই বাহুল্য। বহিখানি শুধু সুখপাঠ্য নহে, শুধু কবির ব্যক্তিত্ব বুঝিবার আবশ্যক নহে, ইহা হইতে ৭০।৭৫, ৬০।৬৫ বৎসরের আগেকার কলিকাতার, বাংলার ও সমাজের উপর

আলোকপাত হওয়ায় তখনকার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণও ইহার মধ্যে রাখিয়াছে।

কবি কিছু দিন পূর্বে তাঁহার জোড়াসাঁকোর ভবনে এই বহির কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। কাহিনীর মনোহারিত্বের সহিত তাঁহার পাঠনৈপুণ্যের সংযোগে তখন অনেক শ্রোতার মনে হইয়াছিল, ইহা কি বাস্তব কিছুর বৃত্তান্ত, না উপন্যাসের গোড়াপত্তন?

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ আরোগ্যের পথে

রবীন্দ্রনাথের পীড়ার আত্যন্তিক আশংকাজনক অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে এবং তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন, এই সুসংবাদে আমরা, অগণিত অন্য বহুজনের সহিত, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিধাতার করুণায় যে কবির আয়ু বাড়িল, তাহার জন্য আমরা বিশ্বপতির চরণে সভক্তি কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। কবি যতদিন আমাদের মধ্যে থাকিবেন, তাঁহার জীবন মানবের কল্যাণ ও আনন্দ বিধানে উৎসর্গীকৃত হইবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

অন্ধদের দুঃখলাঘব শিবির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা

কলিকাতায় অন্ধজনের যে দুঃখলাঘব শিবির (Blind Relief Camp) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও যাহা কলিকাতার লর্ড বিশপ ও ভারতের মেট্রোপলিটান উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা সাতিশয় প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত হিতকর প্রতিষ্ঠান। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিতেছি।

এই উদ্যোগে ব্যবহারের নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রসাদে পাইয়া নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

আলোকের পথে প্রভু দাও দ্বার খুলে
আলোক পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে।

প্রদোষের ছায়াতলে
হারায়েছে দিশা
সম্মুখে আসিছে ঘিরে
নিরাশার নিশা ।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে
আলোকের পথে ।

জোড়াসাঁকো । ২. ১১. ৪০.

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

রবীন্দ্রসকাশে চীন শুভেচ্ছা দূত

ভারতের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চীন দৌত্যের নেতা মনীষী তাই চী-তাও সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে ও তাঁহাকে চীনরাষ্ট্রপতি চিয়াংকাই-শেকের চিঠি দিতে গিয়াছিলেন। চিঠিতে চিয়াংকাই-শেক কবির পীড়ার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে কবির উপদেশ চাহিয়াছেন। কবি ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাচীন যোগ পুনঃস্থাপন করিয়া তাহার রক্ষার উপায়ও করিয়াছেন। তিনি এই উপদেশ দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া যে অগণিত চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি নির্বাচন করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সম্প্রতি একটি চিত্রসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আঠারো-খানি ছবি আছে। গ্রন্থারম্ভে কবির ভূমিকা এবং গ্রন্থের শেষে কবির স্বহস্তাক্ষরে মুদ্রিত বাংলা ও ইংরেজি ১৮টি কাব্যকণিকা, ছবিগুলি সম্বন্ধে

কবির মন্তব্য স্বরূপ সংযুক্ত হইয়াছে। এই লেখাগুলির দু-একটি উদ্ধৃত হইল।

"প্রতি দিবসের যত ক্ষতি যত লাভ
পশ্চাতে ফেলি প্রকাশে সহসা পরম আবির্ভাব।
ভাসিয়া চলে সে কোথায় কেহ না জানে।
আঁধার হইতে সহসা আলোর পানে॥"

"পসরাতে কী আছে তা নাই বা জানিলাম
চিরকালের তুমি বিদেশিনী,
ধ্যানের পটে ধরা দিলে শুনালে না নাম,
চিনি, তবু নাহি বা তোমায় চিনি।"

এই "চিত্রলিপি" সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পরসিক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ আগামী ডিসেম্বর মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইবে; প্রবাসীতেও বিশেষজ্ঞ-লিখিত একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পৌষ, ১৩৪৭

"রবীন্দ্র-রচনাবলী" পঞ্চম খণ্ড

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় রবীন্দ্রনাথের যে সমগ্র রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন তাহার পঞ্চম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে কবিতা অংশে 'চৈতালি', নাটক-অংশে 'কাহিনী' ("গান্ধারীর আবেদন", "লক্ষ্মীর পরীক্ষা", "নরকবাস", "সতী" প্রভৃতি), উপন্যাস অংশে "নৌকাডুবি" এবং প্রবন্ধ-অংশে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'প্রাচীন সাহিত্য' মুদ্রিত হইয়াছে। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত ছবি আছে: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্যাস্টেল চিত্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সুহৃদ ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর দেবমাণিক্য, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ, ও কবির বোট "পদ্মা" ('চৈতালি' ও 'ছিন্ন-পত্রে'র অধিকাংশ এই বোটে লিখিত হয়)। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেরও কোনো কোনো গ্রন্থের সূচনা কবি লিখিয়া দিয়াছেন। 'চৈতালি'র সূচনায় কবি লিখিতেছেন:

"...পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর,

মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা শস্যক্ষেত ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে পড়বার মত অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপরে রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যেই।…"

'চৈতালির' প্রথম সংস্করণে গ্রন্থ-সূচনায় "তুমি যদি বক্ষ মাঝে থাক নিরবধি" এই কবিতাটি কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ছিল। 'চৈতালি'র আধুনিক সংস্করণ গুলিতে এটি আর ছাপা হইত না। 'চৈতালি'র প্রথম সংস্করণ হইতে কবির তৎকালীন হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে কবিতাটি রচনাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত কিন্তু পরে বর্জিত "অভিমান" কবিতাটিও রচনাবলী সংস্করণ 'চৈতালি'তে পুনর্মুদ্রিত আছে। সব বইগুলিরই পুরাতন নানা সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পাঠ নির্ণয় ও পাঠসংশোধন করা হইয়াছে।

মাঘ, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ও প্রবাসী বাঙালী সমাজ

রেঙ্গুন ও জামসেদপুর উভয় স্থানেই বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের আরোগ্যলাভে ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হইয়াছিল।

মাঘ, ১৩৪৭

"সংস্কৃত শিক্ষা"

রবীন্দ্রনাথ অগণিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ যেমন লিখিয়াছেন, তেমনই বালক

বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়পাঠ্য মনোজ্ঞ গ্রন্থও অনেকগুলি রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে যখন নূতন প্রণালীতে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন তিনি তাঁহার অবলম্বিত শিক্ষাপন্থার উপযোগী এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন, পরেও চিত্তাকর্ষক এইরূপ বহি কয়েকখানি লিখিয়াছেন। বিশ্বভারতী যে "রবীন্দ্ররচনাবলী" খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন এই পাঠ্যগ্রন্থগুলিও তাহার অন্তর্গত হওয়া উচিত। এইরূপ পাঠ্য গ্রন্থে তাঁহার এমন অনেক রচনা আছে যাহা বয়স্করাও পড়িয়া আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতে পারে। কতকগুলিতে তাঁহার অভিনব শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষানৈপুণ্যের পরিচয় আছে। আমরা জানিলাম "রবীন্দ্র রচনাবলী"র একটি খণ্ডে এই পাঠ্যগ্রন্থগুলি সন্নিবিষ্ট করিবার অভিপ্রায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনাধ্যক্ষ মহাশয়ের আছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তকতালিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "সংস্কৃত শিক্ষা" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের উল্লেখ আছে। এই বই দুই খণ্ড প্রবাসীর পাঠক মহাশয়দের কাহারও নিকট থাকিলে তাহা বিশ্বভারতীর গ্রন্থনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে দেখিতে দিলে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলিকাতা, এই ঠিকানায় বহিগুলি প্রেরণ করিলে তিনি পাইবেন।

চৈত্র, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বর্ষ পূর্তি উৎসব

আগামী ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অশীতিতম বৎসর পূর্ণ হইবে। সেই উপলক্ষে কলিকাতায় এবং বঙ্গের অন্য নানা স্থানে উৎসব হইবে। বাংলা দেশের বাহিরেও হইবে। শুধু বাঙালীরাই যে এই উৎসব করিবেন তাহা নহে, অন্য ভারতীয়েরাও করিবেন। যাঁহারা ভারতীয় নহেন, তাঁহারাও কেহ কেহ উৎসবে যোগ দিবেন। কারণ, তিনি পৃথিবীর কবি।

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি।
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।
এই স্বরসাধনায় পোঁছিল না বহুতর ডাক,

রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।"

কবির ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর যেরূপ উৎসব করিতে পারা গিয়াছিল—পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বহু মনীষীর লিখিত কবি-প্রশস্তি সংগ্রহ করিয়া যেরূপ একটি অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ করা গিয়াছিল, এবার ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের জন্য সেরূপ কিছু করিতে পারা যাইবে না। তথাপি উৎসব যথাসাধ্য করা হইবে। তাহার প্রস্তুতি কলিকাতার বাহিরেও হইতেছে। প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দুই দিনের অধিবেশনের পর এই প্রস্তুতির অংশ স্বরূপ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজিয়ানাগ্রাম হলে "প্রবাসী"র সম্পাদক কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি সর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে সভাপতির কার্য করেন।

চৈত্র, ১৩৪৭

ভৌগোলিক প্রদর্শনী ও ভূগোল শিক্ষা

কলিকাতায় একটি ভৌগোলিক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর পরীক্ষাগুলিতেও ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভূগোল সম্বন্ধে অজ্ঞতা মানুষকে কূপমণ্ডূক থাকিতে সাহায্য করে। বাংলা দেশের পথঘাটের অবস্থা এরূপ যে, কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর যাইতে হইলেও ট্রেণ বদলাইতে হয়, যদিও বোম্বাই মান্দ্রাজ দিল্লী লাহোর পেশাওয়ার হইতে সোজা কলিকাতা আসা যায় এবং সোজা সেই সব জায়গায় যাওয়াও যায়। ইহার উপর যদি আমরা ভূগোল না-জানি, তাহা হইলে আমাদের শরীরটা যেমন ঘরকুনো হইয়া আছে, মনটাও সেইরূপ ঘরকুনো হইয়া থাকে।

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি তিনি পৃথিবীর সকল মহাদেশে গিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, পৃথিবীকে জানিবার তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। আশী বৎসর বয়সে তিনি লিখিয়াছেন :-

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু,
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময় বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষা লব্ধ ধনে।"

চৈত্র, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথের শীঘ্র প্রকাশ্য গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। তিনি সম্প্রতি মোটরে শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন।

তাঁহার নবরচিত কতকগুলি কবিতা শীঘ্র "আরোগ্য" নাম দিয়া পুস্তকের আকারে বাহির হইবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত তাঁহার ছোট গল্পের একটি বহিও প্রস্তুত হইতেছে।

বৈশাখ, ১৩৪৮

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথ

গত বৎসর ৫ই এপ্রিল দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ মর্তলোক হইতে অমর্তলোকে যাত্রা করেন। তিনি বংশতঃ ইংরেজ হইলেও সমগ্র মানবমণ্ডলীকে আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর যেখানে যে-কোন

জাতির যে-কোন লোকদের দুঃখ, নির্যাতন, অপমানের কথা তিনি শুনিতেন, তাহাতেই তিনি বেদনাবোধ করিতেন ; এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করিতেন। বিশেষ করিয়া তিনি ভারতভূমিকেই নিজের—দ্বিতীয় মাতৃভূমিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং দুর্গত ভারতীয়দের দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টাই অধিক পরিমাণে করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁহার মন যেমন শান্তি পাইত এমন আর কোথাও না। সবরমতীর আশ্রমও তাঁর প্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনেই আগে আগে বেশি সময় থাকিতেন ; জীবনের শেষের দিকে দীর্ঘকাল দক্ষিণভারতে থাকিয়া মৃত্যুর পূর্বে কলিকাতায় হাসপাতালে যাইবার আগে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনেই বাস করিয়া আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব বলিতেন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা কিরূপে হইল এবং কেমন করিয়া শাসক-ইংরেজসুলভ ঔদ্ধত্য বা মুরুব্বিয়ানার পরিবর্তে তাঁহার মনে ভারতপ্রীতির অভিব্যক্তি ("evolution") ক্রমে ক্রমে হইল, তাহা তিনি ১৯৩৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর ওরিয়েণ্ট ইলাস্ট্রেটেড উইক্লিতে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাতের কথাও তাহাতে আছে। তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। স্থান ও সময়ের অল্পতাবশতঃ অনুবাদ দিতে পারা যাইবে না। প্রবন্ধটি আরম্ভ এইরূপ :—

> It would be difficult to describe in adequate terms the debt which I owe to Gurudev Rabindranath Tagore. Let me try to explain in this week's causerie for The Orient Illustrated Weekly, some small fraction of what that debt has been ; for it has changed the whole course of my life in India and made me able to understand her people.
>
> The first great reaction came before I met Tagore himself ; and it happened in a remarkable manner through reading those translations of his writings which appeared from time to time in The Modern Review. Every word which he thus gave to the press, seemed to have its powerful effect on me and made me long to see the author.

ভারতবর্ষের ও ভারতের লোকদের প্রতি প্রভু ও শাসক ইংরেজ জাতির অনেকেরই মনে একটা অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের ভাব আছে। যেমন ইংরেজ কতকটা ভাল, তাহাদের মনে তাহার পরিবর্তে আছে মুরুব্বিয়ানার ভাব। এই মুরুব্বিয়ানার ভাবটা এণ্ডরুজের মন থেকে কেমন করিয়া গেল, সে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন :—

This note of 'patronising' had to be entirely obliterated in my own case if sincerity and reality were to come into the perspective of Indian affairs. Here, Sushilkumar Rudra, the Principal of St. Stephens College, Delhi, who was the first and greatest among my Indian friends, did me an inestimable service. As a true friend, he pointed out to me this bad habit of mine of assuming a patronising attitude, when I ought really to be understanding how very far from my father's own idea of perfection the administration of India by the civil service had been; how there was a haughtiness and arrogance in this very idea of one race being set to rule over another, as if the race that ruled was 'superior' and the race that was ruled over was 'inferior'.

বিদেশী শাসকদের আমলে বাণিজ্যিক উপায়ে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহাও সুশীল রুদ্র মহাশয় তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। তাহার পর "জনৈক ভারতপ্রেমিকের ক্রমবিকাশ" ("The Evolution of a Lover of India") উপশীর্ষ নাম দিয়া ঐ প্রবন্ধে এণ্ডরুজ লিখিয়া গিয়াছেন :—

A second influence was that of Ramanada Chatterjee, the Editor of The Modern Review. From the first day that it was published, I used to be one of its most enthusiastic supporters and readers. Also, from time to time, the editor kindly allowed me to contribute an article. All this going on year after year, formed an admirable training

for me in getting rid of that old conceit about the perfection of British rule with which I had started, owing chiefly to my home upbringing.

তাহার পর "রবীন্দ্রনাথের প্রভাব" ("Tagore's Influence") সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহার গোড়ার কয়েকটি বাক্য এইরূপ :—

Without all this preparation, I should not have been able to appreciate, immediately and instinctively, Tagore's writings, when I came accross them in The Modern Review. But with Principal Rudra by my side, it was not difficult to do so. Whatever I read (and it was only a very small amount) at once struck me as coming from one who had a perfectly balanced mind and a depth of vision far beyond that of any one I had read before on the Indian problem. He also had evidently a style as a writer which even in an English translation was manifest.

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

উপরে উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফগুলিতে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ কয়েকবার মডার্ন রিভিয়ুর নাম করিয়াছেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই মাসিক পত্রে বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; কিছু কবিতাও লিখিয়াছিলেন। মাসিক কাগজের জন্য লিখিত তাঁহার শেষ লেখা মডার্ন রিভিয়ুতেই বাহির হয়। যে এপ্রিল মাসে তাঁহার দেহান্ত হয়, সেই এপ্রিলের মডার্ন রিভিয়ুতেও তাঁহার লেখা ছিল।

শান্তিনিকেতন তাঁহার প্রিয় "হোম" এবং প্রধান কার্যক্ষেত্র ছিল। তাঁহার স্মারক যাহা কিছু হইবে, তাহা এইখানেই করিবার প্রস্তাব অতি উত্তম। মহাত্মা গান্ধী এইজন্য পাঁচ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন। এই টাকা সংগৃহীত হইলে আনন্দিত হইব। না হইলে তাহা লজ্জার বিষয় হইবে।

বৈশাখ, ১৩৪৮

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের রাজনৈতিক মত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অনুকূল মত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কুড়ি বৎসর পূর্বে ১৯২১ সালে প্রকাশ করেন। তাহার পর তিনি গত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে পুনর্বার এই মত প্রকাশ করেন। তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

In order to avoid any wrong impression let me add that I entirely agree with Prof. Seeley, when he says that 'prolonged submission to a foreign yoke is one of the most potent causes of national deterioration'. I quote from memory. The emphasis there is on the word 'prolonged'. Every year that now passed in India, without the removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote, in 1921, called 'The Immediate Need of Independence, where I emphasized the word 'immediate', and I hold fast to every word which I then wrote. Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India have deteriorated, as Prof. Seeley prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once.

এণ্ড্রুজ পনর মাস পূর্বে এইসব কথা লিখিয়াছিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষে উপদ্রব ও অশান্তি এবং নানা সমস্যার জটিলতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থার এই ক্রমাবনতির সহিত দেশের পরাধীনতার যে সম্পর্ক আছে তাহা স্বীকার্য।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বর্ষপুর্তি

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের পক্ষে অপরিমেয় আনন্দ ও কল্যাণের আকর তাঁহার দীর্ঘজীবনের অশীতিতম বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে উৎসব হইয়াছে ও হইবে। আমরা এই উৎসবে যোগ দিতেছি। সকলের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি এবং ভগবচ্চরণে তাঁহার আরোগ্য ও দীর্ঘতর জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গণ্য করা হউক

রবীন্দ্রনাথের অশীতিপূর্তি উপলক্ষ্যে এই প্রস্তাব সকল স্থান হইতে হওয়া উচিত যে, বিশ্বভারতীকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট গণ্য করুন। ইহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। অতএব ভারত-সরকার ইহাকে এই মর্যাদা দিতে পারেন। অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহা পৃথক প্রকারের এবং ইহার নিজের বৈশিষ্ট্য আছে। এই নিমিত্ত ইহাকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাইবার ইহা প্রকৃষ্ট পন্থা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

"সভ্যতার সংকট"

ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার উপর এক সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের ১লা বৈশাখের "সভ্যতার সংকট" নামক অভিভাষণে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিশ্বাস যে নষ্ট হইয়াছে এবং কেমন করিয়া নষ্ট হইয়াছে, তাহাও অভিভাষণটিতে আছে। তিনি বলিয়াছেন, "আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের

মনোবৃত্তির পরিণতি বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।"

দাদাভাই নওরোজী তাঁহার দীর্ঘ জীবন ভরিয়া ইংরেজ জাতির ন্যায়বুদ্ধির প্রতি আবেদন ("appeal to the sense of justice of the British nation") করিয়াছিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর আশাভঙ্গের দিনের জন্য তিনি বাঁচিয়া ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের সেই দুঃখকর দিন আসা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণটি প্রথমতঃ যে আকারে লিখিত ও দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন এবং নূতন কিছু বাক্যও ইহাতে যোগ করিয়াছেন। "প্রবাসী"র এই সংখ্যায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এই পরিবর্তিত ভাষণ। ইহা আলাদা পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে বিক্রীর জন্য রাখা হইয়াছে।

ইহার যে ইংরেজি অনুবাদ "Crisis of Civilization" নাম দিয়া দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, কবি তাহারও সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। সেই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পাঠ মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে তাহাও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে কিনিতে পাওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে "গীতালীর" গান

রবীন্দ্রনাথের গান শিখাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় "গীতালি" নামক একটি সমিতি আছে। তাহার কার্যস্থান ৯০ নিউ পার্ক স্ট্রীট। ইহা গত বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত হয়। তাহার কিছুকাল পূর্বে কবি স্বয়ং "বিচিত্রা" ভবনে তাহার উদ্বোধন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে নিজের গান সম্বন্ধে কিছু বলেন। তার মধ্যে তাঁহার এই একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল যে অনেক সময় স্বরচিত সংগীত পরের মুখে শুনিয়া তিনি নিজের গান বলিয়া চিনিতেই পারেন না। সম্প্রতি কবির অশীতিপূর্তি উপলক্ষ্যে "গীতালি" যে রবীন্দ্র-গীতোৎসব করিয়াছেন, তাহাতে গীত গানগুলি পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় বলা হইয়াছে :—

"কবিবরের এই অভিযোগের নিষ্পত্তি, অর্থাৎ তাঁহার গান যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে শেখাবার উদ্দেশ্যেই গীতালির প্রতিষ্ঠা। এই পথে বাধা বিঘ্ন অনেক তা যাঁরা এ কাজে হাত দিয়েছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন। কারণ মুখে মুখে গান রচনার ও শেখাবার পদ্ধতি এদেশে বহু কাল যাবৎ প্রচলিত থাকায়, কোন এক স্বরলিপিকে অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করা কঠিন। কবির নিজের দেওয়া সম্পদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে চরম নিষ্পত্তি তাঁর নিজেরই করবার কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ বিষয়ে শ্রুতিধর কোনকালেই নন ; সুর রচনা করেই খালাস।

"ইতিপূর্বে তাঁর গানের ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের উপর তাঁর সুর লিপিবদ্ধ করবার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। এবং এই অফুরন্ত গানের অধিকাংশ সম্বন্ধেই দিনেন্দ্রনাথ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে গেছেন। তথাপি সেখানে বিবাদের কারণ রয়ে গেছে, যে গান লিপিবদ্ধ করা বাকি আছে, বা নতুন যে গান এখনো রচিত হচ্ছে—সে-সব সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তী রবীন্দ্রসংগীত-ভক্তগণ তাঁদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করবেন না, এ আশা করা যেতে পারে নাকি ?

"সেই রকম সংগীত ভক্তের একটি কেন্দ্র হওয়াই গীতালির অন্যতম লক্ষ্য।

আমরা উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখাবার ব্যবস্থা করেছি এবং কবিবরের নূতনতম সঙ্গীত শেখবার ও শেখাবার জন্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার আশা রাখি। বলা বাহুল্য সাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি ভিন্ন এ রকম প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়, উন্নতি তো দূরের কথা। কেবল মাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান বোধ হয় কলকাতা সহরে এইটিই প্রথম।"

"গীতালি"র মত একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মফঃস্বলের যাঁহারা শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথের গান ভাল করিয়া শিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এই রূপ গান শিখাইবার কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের নানা রকমের শত শত গান যে, বাংলা দেশকে তাঁহার কত বড় দান, তাহা একটু চিন্তা করলে কিছু বুঝা যায়। ইয়োরোপে সকলের চেয়ে বেশি গান শিখাইয়া গিয়াছেন জার্মেনীর শুবার্ট (Schubert)। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা ছয় শত। রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। তাহা বাড়িয়া চলিতেছে। তৎসমুদয়ের ভাবের বৈচিত্র্য, গভীরতা, ও সূক্ষ্মতা অসাধারণ। ঠিক সুরে গাওয়া না হইলে গানগুলির রস অনুভূত হয় না এবং তাহা হইতে যে অনুপ্রাণনা পাইবার কথা, তাহা পাওয়া যায় না। বিকৃত সুরে গাওয়া গান শুনিলে বিরক্তিই জন্মে—যেমন নানা স্থানে 'বন্দে মাতরম্' গানের ভেংচান শুনিবার দুঃখকর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

সাধারণ লোকদের জন্য রবীন্দ্রগীতসভা

অন্যতম ভূতপূর্ব ভারতসচিব মন্টেগু সাহেবের ভারত ভ্রমণের বিবরণে এক জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাংলা দেশের এক জায়গায় গ্রাম্য লোকদের একটি মজলিসে গান বেশ জমিতেছিল না, কিন্তু একজন একটি গান ধরায় বেশ জমাট ভাব আসিল ; জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সেটি রবীন্দ্রনাথের গান।

ইহা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথোচিত জ্ঞান এবং মননশীলতা ও ভাবুকতা আবশ্যক।

কিন্তু সেই সকল গানের কথা সম্যকরূপে বুঝিতে না পারিলেও ঠিক সুরে গাওয়া হইলে সেগুলি "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে।

এরূপ গান ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার অন্য এরূপ গানও বিস্তর আছে যাহার কথা ও সুর উভয়ই নিরক্ষর লোকদের পর্যন্ত বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কোন কোন গানও ঠিক চাষীদের জন্যই রচিত। যেমন "আমরা চাষ করি আনন্দে" "ফিরে চল মাটির পানে", ইত্যাদি।

সেকালে আমাদের যেসব যাত্রার পালা ছিল, তাহাদের অনেক গানে দুরূহ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বও থাকিত। সেগুলি যে নিরক্ষর শ্রোতারা মোটেই বুঝিতে পারিত না, এমন নয়।

২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" ভবনে "গীতালি"র মনোজ্ঞ রবীন্দ্র গীতোৎসব উপভোগ করিবার পর আমাদের মনে হইয়াছে, তাঁহার যে গানের ভোজ তাহা কেবল শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একচেটিয়া থাকা উচিত নহে। তিনি গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও শ্রী ফিরাইয়া আনিয়া সেগুলিকে আনন্দ মুখরিত করিবার নিমিত্ত শ্রীনিকেতন স্থাপন করিয়াছেন। দেশের সাধারণ লোকদের জন্য তাঁহার যে প্রাণের টান, তাহা কত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এখনও তাঁহার রচনায় দেখা দিতেছে। তাঁহার খুব আধুনিক কবিতাগুলির মধ্যে "ঐকতান" নামক তাঁহার যে-কবিতাটি গত ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা "জন্মদিনে" নামক সদ্যঃপ্রকাশিত পুস্তকে আছে, তাহাতে তিনি বলিতেছেন:—

সব চেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার ;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হোলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা,
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

সেই কবির আবাহন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :—

এসো কবি, অখ্যাত জনের,
নির্বাক মনের। মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ, সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

আমাদের আবেদন এই যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গান জানেন তাঁহারা এই দেশের "গানহীন" "নিরানন্দ" গ্রামে সাধারণ লোকদের মধ্যে তাঁহার গানগুলিকে "সর্বত্রগামী" করুন। তিনি যে তাহাদের কত দরদী তাহা অনুভূত হউক গানগুলির দ্বারা। গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রামগুলির নিমিত্ত এই চেষ্টা বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা করিয়া এই আকারে তাঁহারা কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করুন। তাঁহারা আরম্ভ করিলে কাজটি অন্যত্রও প্রসার লাভ করিবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ও মণিপুরী নৃত্য

এই মাসের "প্রবাসী"তে একটি প্রবন্ধে ছবি ও মনিপুরী নৃত্যের কিছু বর্ণনা আছে। ঘটনাক্রমে আমাদের হাতে একটি চিঠি আজ, ২৬শে বৈশাখ আসিয়াছে যাহাতে রবীন্দ্রনাথের মণিপুরী নৃত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবার কিছু বৃত্তান্ত আছে।

বঙ্গের নানা স্থানে যেমন রবীন্দ্র-জয়ন্তী হইতেছে, শ্রীহট্টেও সেইরূপ হইয়া গিয়াছে। সেখানে "বাণীচক্র" সাহিত্য সংসদ নামক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। তাহাতে রীতিমত সাহিত্যচর্চা হইয়া থাকে। তাহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র (তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হইয়াছে) আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অভিনন্দন পত্র এবং কবির সঙ্গে আমার আলাপের অংশবিশেষ একত্রে ছাপাইয়া সভায় বিতরণ করা হয়। এই চিঠির সঙ্গে তাহা পাঠাইলাম।" ১৩৪২ সালের শেষের দিকে কলিকাতায় কবির সহিত উঁহার কিছু কথাবার্তা হয়। তাহার মুদ্রিত অংশটি নীচে দিলাম। কবির জীবনের যাহা কিছু তথ্য যেখানে পাওয়া যায়, সমস্তই সংগৃহীত পাওয়া আবশ্যক।

বিশেষ আগ্রহ সহকারে কবি জিজ্ঞেস করলেন, "মণিপুরের নৃত্যকলা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে?"

বললাম—"অভিজ্ঞতা কিছুটা আছে, খাস মণিপুর রাজ্যেই আমি মণিপুরী কুমারীদের রাসনৃত্য দেখেচি, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমার রাত্রে। সেদিন এই অপূর্ব মনোহর নৃত্যকলা দেখে আমার মনে হয়েছিল এ যেন যথার্থই "সঙ্গীতে" ও "ভঙ্গীতে" জীবন দেবতার চরণমূলে আত্মনিবেদন।"

"তুমি কি নিজে নাচ শিখেচ" কবি প্রশ্ন করলেন।

"না, সে সুযোগ আমার হয়নি, আর এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা কতটুকু সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।"

আমার কথা শুনে কবি মৃদু হেসে খানিক পরে বললেন—"তুমি তো সিলেট থেকে আসচ? চৌদ্দ পোনের বছর আগে যখন সিলেটে যাই, তখন

প্রথম দেখেছিলাম মণিপুরী নাচ, সেই নাচ আমার মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর কল্পলোকে, মনে জেগেছিল নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা। সে যেন আমার মনকে পেয়ে বসেছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুরী নাচ শেখাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৬ সন থেকে ১৩৩৬ সন, এই দশ-বছরের মধ্যে তিন তিন বারে সবশুদ্ধ ছয় জন নৃত্যশিক্ষককে আনিয়েছি শান্তিনিকেতনে। সম্প্রতি আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক নবকুমার। 'নটরাজে'র অভিনয়ে প্রথম সংযোজনা করলুম একটু অদল বদল করে মণিপুরী নাচ। নৃত্য-নাট্যের একটা বিশেষ রস আছে যা…"

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বিশেষত্ব তাহার নিম্নমুদ্রিত বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

আগরতলা, ৮ই মে

আগরতলা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে মহা সমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী দরবারের অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় জয়ন্তী কমিটির পক্ষ হইতে মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ এক বক্তৃতা করেন। অতঃপর চীফ সেক্রেটারী এই উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুরের "রোবকারি" অর্থাৎ ঘোষণা বাণী পাঠ করেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বাংলা তথা সমগ্র ভারতের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে 'ভারত-ভাস্কর' আখ্যায় ভূষিত করা হইল এবং প্রার্থনা শ্রীভগবান তদীয় আশীর্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

ত্রিপুরা দরবারের ঘোষণা বাণী

যেহেতু বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত ;—

যেহেতু মর্ত দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ—'মর্ত্যো-ঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্' ঋষিরা কাব্যের ভেতর দিয়া ভগবৎসত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগৎকে দিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় অংকুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃপ্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধিশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়—তিনিই তরুণ রবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব যুগ আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃ-কার্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার অশোকস্তম্ভ-স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যোগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুরারাজের কর্তব্য—"জ্যোৎস্না ভরাহত মহন্ধুদয়ান্ধকারম্"—অতএব এই উৎসব-জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে "ভারত-ভাস্কর" আখ্যায় ভূষিত করা যায় ;—এবং শ্রীভগবান তদীয় আশীর্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

বর্তমান মহারাজের খুল্লতাত মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ত্রিপুরা রাজ্য ও রাজপরিবারের সহিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার বিষয় উল্লেখ করেন ও কবিগুরুর নিজের রচনা হইতে ঐ সম্পর্কে একটি অংশ উদ্ধৃত করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত ইয়োরোপের যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে স্থানীয় সর্বসাধারণের দ্বারা কবির অলোকসামান্য সম্বর্ধনার বিষয় ও বর্ণনা করেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

রবীন্দ্রকাব্যে রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী"র প্রথম খণ্ডের উৎসর্গপত্রের উল্টা পিঠে এই কয়টি পংক্তি মুদ্রিত আছে :—

"বাহির হইতে দেখো না অমন করে,
দেখো না আমায় বাহিরে !
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে !

* * *

কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে ।"

বড় বড় কবির বড় বড় কাব্যে যে তাঁহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায় । তাঁহারাই আবার কেহ কেহ ছোট ছোট গীতি-কবিতায় বা অন্য কবিতায় আত্মগোপন করেন না, বরং আত্মপ্রকাশই করেন বলা যাইতে পারে । সেগুলির মধ্যে তাঁহাদের অন্তর্জীবনের সন্ধান ও ইতিহাস পাওয়া যায় ।

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি যে-সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্জীবনের পরিচয় ব্যতীত কোন কোনটিতে তাঁহার বহির্জীবনের কোন কোন ঘটনাও আসিয়া পড়িয়াছে । যেমন, "জন্মদিনে" গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতাটিতে—

"বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনাকে বিচিত্ররূপের সমাবেশে ।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার পরে শূন্য নীলিমায়

ভটকে করিয়েছে অস্বীকার।" ইত্যাদি

ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয় কবিতায় আছে—

"একদা গিয়েছি চিন দেশে
অচেনা যাঁহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা বলে।" ইত্যাদি

ষষ্ঠ কবিতাটিতে আছে—

"কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল আতিথ্য বাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনি।" ইত্যাদি

সপ্তমটিতে—

"অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।" ইত্যাদি।

অষ্টমটিতে—

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যু বিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ,
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।"

উনবিংশ কবিতাটি তাঁহার বাল্যকালের আত্মচরিতের একটি অধ্যায়—তাহাতে ছবির পর ছবি, কত ছবি।

এই সকল কবিতাতে কবির বাহ্য-জীবনের যে সব ঘটনার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহাই কবিতাগুলির প্রধান বস্তু নহে। সেই সব ঘটনার দিনে ও উপলক্ষে কবি অন্তরে যে সত্য, ভাব, চিন্তা, রস পাইয়াছিলেন, তাহাই কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত রত্ন।

অষ্টাবিংশ কবিতার গোড়াতেই তিনি বলিতেছেন, "নদীর পালিত এই জীবন আমার।" ইহার আভ্যন্তরীণ অর্থ কবিতাটি শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝা যায়, কিন্তু ইহা তাঁহার বহির্জীবনেরও সত্য বর্ণনা। তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি নিজেকে গাঙ্গের বলে থাকি।"

একবিংশ কবিতাটিতে যুধ্যমান পৃথিবীর ভীষণ ও বীভৎস চিত্রের পরে কবির আশা—তপস্বীবেশী মহামানবের আগমনের আশা—প্রকাশ পাইয়াছে।

"সভ্যতার সংকট" ভাষণে দেশের দারিদ্র্যে কবির যে মর্মবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, দ্বাবিংশ কবিতাটিতেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

"গল্পসল্প" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক অনেক কবিতাতেই যে তাঁহাকে পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে, গদ্যকাব্যেও পাওয়া যাইতেছে। যেমন "গল্পসল্প" গ্রন্থটিতে। ইহার সহজ সরল ভাষা ইহার অসাধারণত্ব ঢাকিয়া রহিয়াছে। একটি ইংরেজী বাক্য আছে, শ্রেষ্ঠ আর্ট হইতেছে আর্টকে গোপন করা। কবি তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয় কাব্যেরই ভাষা কত সরল সুন্দর অনাড়ম্বর করিয়াছেন কত নৈপুণ্যে ও কত পরিশ্রমে, তাহা "গল্পসল্প" বহির মতো বহি পড়িবার সময় মনে হয় না।

ইহার ভাষা যে শুধু ইহার জন্য তাঁহার পরিশ্রম এবং শব্দচয়ন ও শব্দগ্রহণ কলাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা নহে, ইহাতে তিনি যে সোজা কথায় 'ছেলেমানুষি' গল্পের মধ্যে অনেক মহৎ সত্য নিহিত করিয়াছেন, তাহাও ইহার ভাষা ঢাকিয়া রহিয়াছে।

বড় বড় উপদেষ্টারা বলিয়াছেন, মানুষের মহত্ত্ব ও সাধুতা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সব দেশেই পাওয়া যায়। কবি এই সত্যটি সোজা দুই ছত্র কবিতায় বলিয়াছেন,—

"আর শোনো, ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো '

অতি বড় গণতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরাও প্রত্যেক মানুষের অসাধারণত্ব, খুব নগণ্য মানুষেরও অসাধারণত্ব, এমন পরিষ্কার ভাষায় বলিতে পারেন নাই যেমন কবি বলিয়াছেন "গল্পসল্পের" নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে :—

"বিধাতা লক্ষ কোটি মানুষ বানিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন।"

এই রকম আরও কত বাক্য উদ্ধৃত করিতে পারা যায়।

কিন্তু আমরা যাহা বলিব বলিয়া এই প্রসঙ্গটার উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহা হইতে দূরে আসিয়া পড়িলাম। তাহা এখন বলি।

"গল্পসল্প" বহিতে কবির কিছু কিছু আত্মজীবনস্মৃতি আত্মগোপন করিয়া আছে ; যেমন মুনশীর গল্পে ; ম্যাজিসিয়ানের গল্পে, গোলাবাড়ির কথাতে, সাতমহল রাজবাড়ির কথায়… ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কীর্তি ও বাঙালির কর্তব্য

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের (personalityর) কথা, তিনি মানুষটি কিরূপ, তাহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার কথা, তাঁহার কৃতির কথা, বলিতে গেলে তাহাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ;— প্রথম, তিনি যাহা লিখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার রচনাবলী (গানগুলি তাহার অন্তর্গত) ; দ্বিতীয়, বিশ্বভারতী । এই উভয়ের মধ্যে যোগ আছে ।

যাঁহারা তাঁহার কৃতির এই দুই অংশেরই গুণগ্রাহী, তাঁহাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী করা বা তাহাতে যোগ দেওয়া পুরা আন্তরিক । যাঁহারা তাঁহার কৃতির মধ্যে অন্ততঃ রচনাবলীর বা অন্ততঃ বিশ্বভারতীর গুণগ্রাহী, রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সহিত তাঁহাদেরও যোগ অনেকটা আন্তরিক ।

তাঁহার রচনাবলীর গুণগ্রাহিতার প্রমাণ দেওয়া যায় ও পাওয়া যায় যদি আমরা সেগুলি পড়ি, অধ্যয়ন করি । বাস্তব প্রমাণ আরও ভাল করিয়া দেওয়া যায়, যদি ক্রয়সমর্থ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষ তাঁহার বহি গুলি কিনিয়া বাড়িতে রাখেন ও পড়েন । তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ ও চিত্তোৎকর্ষ হইবে । অনেকে পান তামাক বিড়ি সিগারেট সিনেমায় খরচ করিতে পারেন, কিন্তু কবির পুস্তকগুলি কিনিতে বলিলে কল্পনা করেন তাঁহাদের সামর্থ্য নাই । অথচ আমরা ইয়োরোপের কোন কোন হোটেলের ভৃত্যদিগকে তাহাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বহির অনুবাদ কিনিয়া তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর লইতে দেখিয়াছি ।

কবির বহিগুলি ক্রয় করিবার আর এক দিক দিয়া হিতকারিতা আছে । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সমুদয় লাভ বিশ্বভারতী পান । বিশ্বভারতী যত টাকা পাইবেন কবির শিক্ষা পরিকল্পনা সেই পরিমাণে বাস্তব আকার ধারণ করিতে পারিবে । সুতরাং যাঁহারা কবির গ্রন্থসমূহ ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রতিভার গুণ

গ্রাহিতার ও তাঁহার কবিত্বের রসজ্ঞতার প্রমাণ দিবেন তাঁহারা তদ্দ্বারা বিশ্ব ভারতীরও গুণগ্রাহিতার প্রমাণ পরোক্ষভাবে দিবেন।

বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেন, তাহা অতি সংক্ষেপে বলি। গান্ধীজীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ১৯৪০ সালের ২রা মার্চের "হরিজন" পত্রিকায় বাহির হয়। সেই চিঠির মধ্যে কবি বলিয়াছেন, "Visvabharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure." "বিশ্বভারতী একটি নৌকার মত যাহা আমার জীবনের সর্বোত্তম ধনরত্ন বহন করিয়া চলিতেছে।" ইহা কবির একটা খেয়াল নহে। আমরা কখনও ইহাকে সে চোখে দেখি নাই।

বাঙালী জাতির মধ্যে কাহারও রবীন্দ্রনাথের কৃতির গুণগ্রাহিতা নাই, আমাদের ধারণা এরূপ নহে। অগণিত লোকের আছে। আমাদের আবেদন এই যে যাঁহাদের আছে তাঁহারা "কেজো" হউন, তাঁহাদের গুণগ্রাহিতা বাস্তব রূপ ধারণ করুক। তাঁহারা অনেকেই বিশ্বভারতীর আজীবন বা সাধারণ সভ্য হইতে পারেন, কবির রচনাবলী কিনিতে পারেন, অন্ততঃ প্রতি মাসে তাঁহার একখানি করিয়া ছোট বহি কিনিতে পারেন। যাঁহাদের এরূপ সামর্থ্য নাই, তাঁহারা তাঁহার কোন-না-কোন আদর্শের সফলতার জন্য পরিশ্রম করুন। আমরা সকলে এইভাবে কাজ করিলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আন্তরিকতাপূর্ণ ও সার্থক হইবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

চিয়াং কাই-শেকের অভিনন্দনে রবীন্দ্রনাথের উত্তর

রবীন্দ্রনাথের আশী বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে চীনের প্রধান সেনাপতি ও প্রকৃত রাষ্ট্রপতি মার্শাল চিয়াং কাইশেক তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তাহার উত্তরে কবি লিখিয়াছেন :—

আমার জন্মতিথি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আপনার ও চীনের অধিবাসীদের শুভেচ্ছা সম্বলিত বাণী পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি। আমার বিষয় আপনি যে গভীর প্রীতির সহিত স্মরণ করিয়াছেন উহাই অনুষ্ঠান দিবসের একটি বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আপনার প্রতি এবং আপনি যে জাতির প্রতিনিধি তাহাদের প্রতি আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপক বাণীর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কবিগুরু অতঃপর জানাইয়াছেন, বাংলা নববর্ষ দিবসে শান্তিনিকেতনে আমার জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয় এবং উহা ১৪ই এপ্রিল, সুতরাং অতীত ঘটনাবলীর সমালোচনা এবং ভবিষ্যতের আশায় উদ্বুদ্ধ হইবার সময়। চীনের বীর ও ধৈর্যশীল অধিবাসীবৃন্দ এবং তাহাদের অবিরাম দুঃখ বহন করিবার সহিষ্ণুতা সর্বদাই আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। কেবলমাত্র ধন্যবাদ নহে —নববর্ষের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবারও সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমি আনন্দিত। যে সকল গুণাবলী দ্বারা মহৎ জাতি গড়িয়া উঠে, উহাদের কার্যকলাপ তাহা দ্বারাই মহনীয় হউক। উহাদের কর্তব্যপরায়ণ নেতৃবৃন্দের শ্রমও যেন ঐরূপ ফল প্রসব করিতে পারে। নির্দোষ জনগণ যাহাতে শান্তিতে আপন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য যেন বিপদ হইতে রক্ষা পায়। এই প্রার্থনার সহিত আপনার মহান বাণীর জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

ছোট সাহিত্যিক কাজও রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ মনে করেন নাই

রবীন্দ্রনাথ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "প্রবাসী"র জন্য বিলাতী ও আমেরিকান বহু মাসিকপত্রের ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া তাহার কোন কোন অংশ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাহাকেও কাহাকেও অনুবাদ করিতে দিতেন, সমুদয় অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন, এবং কোন কোন অনুবাদ সন্তোষজনক না হইলে স্বয়ং সমস্তটি লিখিয়া দিতেন, তখন তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলেন না—তখনও তিনি বিখ্যাত কবি। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যখন তাঁহার সম্বন্ধে কত বড় বড় কথা লিখিত ও কথিত হইতেছে, তখন এই ছোট কথাটি লিখিলাম ইহা দেখাইবার নিমিত্ত যে, বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনার্থ কোন কাজকেই তিনি তাঁহার প্রতিভার অযোগ্য তুচ্ছ কাজ মনে করেন নাই। ইহা হইতে কেবল তরুণ সাহিত্যসেবীরাই যে কিছু শিখিতে পারিবেন তাহা নহে, আমরা বৃদ্ধেরাও পারিব।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

"রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে মুদ্রণভ্রম

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী"র শেষ পংক্তিতে "বৈধব্যের খোঁটা"র পরিবর্তে পড়িতে হইবে "বৈধব্যের খোঁটা"। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত এবং প্রবাসীর সম্পাদক কর্তৃক সংশোধিত প্রুফে শুদ্ধ পাঠ "বৈধব্যের খোঁটা"ই ছিল।

আষাঢ়, ১৩৪৮

তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

কয়েকদিন আগে একখানি মাসিক কাগজে অন্য এক মাসিকের একটা গল্পের সমালোচনা চোখে পড়িল। সমালোচনাতেও ঐ গল্পের কোন কোন অংশের যে চুম্বক দেওয়া হইয়াছে ও যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইলাম, বাঙালী শিক্ষিত সমাজে কেমন করিয়া এরূপ গল্প স্থান পায়। ঐ রকম গল্প বোধ হয় তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্যের নমুনা।

গত ডিসেম্বর মাসে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহার নিমিত্ত আমরা "সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে শ্রীহট্টে একটি সাহিত্য সম্মেলনে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাতে নূতন কিছু জিনিস যোগ করিয়া ঐ প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। উক্ত বক্তৃতা ও উক্ত প্রবন্ধে এই কথা বলা হইয়াছিল যে, "প্রগতি" সাহিত্য যদি কোন প্রকার দুর্গতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতির ফল হয়, তাহা হইলে সেই সহানুভূতির ফলে দুর্গতদের উন্নতির জন্য নানা সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে দেখা যাইত। তাহা ত দেখা যায় না। আমরা বলিয়াছিলাম ও লিখিয়াছিলাম—

> যদি এই সমস্ত সাহিত্যিকরা বাস্তবিকই দরদী হন, তাহলে [তাঁরা এবং] তাঁদের রচনা পড়ে অন্য লোকেরা দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্রতী হবেন।...এঁদের রচনার ফলে পতিতাদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্যে কটা

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও চলছে সন্ধান লওয়া আবশ্যক। এঁদের রচনা পড়ে গরীব লোকদের জন্যে যদি কারো প্রাণ কাঁদে, তা হলে তাঁরা ধন্য। আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন যদি এঁদের রচনায় থাকে, তাহলে এঁদের সাহিত্য হবে সত্য। কিন্তু তা [নিকৃষ্ট] প্রবৃত্তিপ্রসূত আর বণিগ্‌বৃত্তি থেকে প্রসূত হলে কারো লেখা সত্য হবে না। প্রকৃত করুণাপূর্ণ সহানুভূতি দেখান হলেও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাতে বড় হতে পারে সে চেষ্টা না করলে সবই ব্যর্থ।

আমরা কবি নহি, গল্প ও উপন্যাস লিখিতে পারি না। সেইজন্য আমাদের কথা উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকায় আমরা আমাদের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ভাষা পরিচয়" গ্রন্থ হইতে নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম :—

> সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালোমন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তার শুভ বুদ্ধি, যে-বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্ত দেখা দেয় তার ব্যাধি রূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে, তখন পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে। সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই রকম কোন কোন জাতির চরিত্রকে যখন আততায়ী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে, তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে।
>
> তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে, তারা মানুষের শত্রু। কেননা, সাহিত্যকে, শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।
>
> মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে

তা নয়, তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান হয়ে সকল প্রকার অমংগলের সংগে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান না হয় নাই তৈরি হল।

এই মাসের প্রবাসীতে "সাহিত্য, গান, ছবি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

> বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে, বললেন আমি তো এই দিলুম, এবার নিজেকে সম্পূর্ণ করো। সেই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট। আর্ট যেখানে বড়ো সেখানে মহৎকে, সুন্দরকেই সে এঁকেছে। তোমরা আজকাল এসব আদর্শ মানতে চাও না। তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের সমস্ত মলিনতা সমস্ত দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্য গড়তে। কিন্তু মানুষের দুঃখে মানুষের দারিদ্র্যে সত্যি যদি তোমাদের মন টলতো তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিকী, বার্ষিকী বের করতে না, কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে। তোমাদের কাজ সাহিত্য। হয় তোমরা ভালো করে সাহিত্য গড়ো, নয় তো এসব ছেড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন, কিন্তু তাঁরা মহাপ্রাণ, আমাদের প্রণম্য। তুমি কি বলবে আজ আমাদের জীবনে এত দুখ দারিদ্র্য বলে আকাশে চাঁদ ওঠে না, মানুষ ভালবাসে না? কাব্যকে বিকৃত করে লাভ কী? তাতে তো কোন মানুষের কোন উপকার হবে না, কারো পেট ভরবে না, অথচ সাহিত্যের ও নিজেদের ক্ষতি করবে।

রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে, "তাতে তো…কারো পেট ভরবে না," তাহার অর্থ আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি যে কাব্যকে বিকৃত করিলে দেশের অন্নাভাব সমস্যার সমাধান হইবে না। "প্রগতি"-সাহিত্যিকের পেট অবশ্য ভরিতে পারে।

আষাঢ়, ১৩৪৮

বিদেশে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্য বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মা বাহাদুর যে দরবারে গত ২৫শে বৈশাখ "ভারত ভাস্কর" উপাধি দিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেন :—

আমি প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই যাই। ভারতীয় কবিকে ঐদেশের সর্বশ্রেণীর লোকেরা তখন কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইটালীতে রাজকীয় সম্মানকে দূরে রাখিয়া পল্লীবাসী বালক-বালিকা যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যখন সসম্ভ্রমে পথিপার্শ্ব হইতে নতজানু হইয়া কবির পরিধেয় পোষাক অতি সন্তর্পণে গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিত, তখন ভারতীয় যুবক আমি, আমার প্রাণ, গর্বে ভরিয়া উঠিত। এই প্রকার সম্মান সে দেশের পোপ অথবা সম্রাটেরই কেবল প্রাপ্য!

ইহার পরেও আমাকে কিছুকাল সুইজারলেণ্ডে কাটাইতে হইয়াছিল। সেখানে বিভিন্ন দেশের লোকের সম্মিলন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে-ই শুনিয়াছে আমি ভারতবাসী; অমনি আমার সঙ্গে তাহারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়াছে। প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়াছে। আমি আশ্চর্য হইয়াছি, তাহাদের শ্রদ্ধা দেখিয়া।

আষাঢ়, ১৩৪৮

"লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা"র "আহার ও আহার্য"

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য "আহার ও আহার্য" বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার জন্য এই বইটি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"পরিভাষা বর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে, তোমার

লেখাটি আমার ভালো লেগেছে বলে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সংগে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সংগে ব্যবহার করবে।"

এই বইখানি বাংলা দেশের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহার সর্বত্র ব্যবহারে দেশের লোকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে মনে করি।

আমরা অনেক বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের বাড়ীতে বসিয়া জ্ঞানলাভের সুবিধার নিমিত্ত বিলাতী হোম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরির অনুরূপ কতকগুলি বাংলা বহি লিখাইবার ও প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগিয়াছিল, একখানি চিঠিতে জানাইয়াছিলেন। যে-রকম বহি মনে রাখিয়া ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালাতে সেইরূপ বহি অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। "আহার ও আহার্য" বহিখানির ঠিক আগে বাহির হইয়াছিল "পৃথ্বী-পরিচয়"। তাহার সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"বিজ্ঞান প্রসারের যে পন্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথ যে শীঘ্র লোকপ্রিয় হয়ে উঠবে, তা নিঃসন্দেহ। "লোকশিক্ষা" গ্রন্থমালার আশু-প্রকাশ্য বইগুলি যে 'পৃথ্বী-পরিচয়ে'র মত সুখপাঠ্য ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকবে তা আমরা সহজেই আশা করতে পারি।"

আষাঢ়, ১৩৪৮

"রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা" নামক গ্রন্থটির এখন প্রকাশ সময়োচিত হইয়াছে। এই বৎসর নানা স্থানে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হইয়াছে, আরও অনেক জায়গায় হইবে। তাহার ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকের মনে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ

কতকগুলি লোক সত্য সত্যই রবীন্দ্র সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা এই বৃহৎ গ্রন্থটি হইতে এই সাহিত্য বুঝিতে অনেক সাহায্য পাইবেন। ইহাতে "কবি রবীন্দ্রনাথ", "রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বজীবন", "কাব্যপ্রবাহ", ছোট গল্প", "নাটক ও নাটিকা", এবং "উপন্যাস", এই কয়টি অধ্যায় আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশাল, তাহার বিশালতা এখনও বাড়িতেছে, এবং এই গ্রন্থখানিতে কবির নানাবিধ রচনার বিস্তারিত আলোচনা আছে। সুতরাং ইহাতে হাল-নাগাদ সকল গ্রন্থের আলোচনা নাই, থাকিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহা আছে, তাহা বহু অধ্যয়ন ও মননের ফল।

আষাঢ়, ১৩৪৮

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ইয়োরোপীয় অনুবাদের প্রচার

ত্রিপুরার মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের সম্মানের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, সুইজারল্যাণ্ডে নানান লোকের সঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কথা হত, তিনি দেখতেন তাঁরা সবাই তাঁদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ পড়েছেন। আমরাও এর অন্যরকম প্রমাণ জার্মেনীতে পেয়েছিলাম। ড্রেসডেনে যে হোটেল কবি কয়েকদিন ছিলেন, সেখানে তাঁকে তাঁর কোন-না কোন বহির জার্মান অনুবাদ পুস্তকে স্বাক্ষর করতে দেখেছি। সে একটা দুটোতে নয়, অনেকগুলোতে এবং যারা দস্তখত করাত, তাদের মধ্যে হোটেলের চাকরাণীরাও ছিল।

রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, জার্মেনীতে তাঁর বই বিক্রী এত হয়েছিল, যে মার্কের বিনিময়-মূল্য অত্যন্ত বেশি কমে না গেলে তিনি এত বেশী টাকা পেতেন যে, তাঁকে বিশ্বভারতীর জন্যে ভিক্ষা করতে হত না। মার্কের দাম কমে যাওয়ায় তিনি জার্মান অনুবাদের রয়্যালিট নেন নি।

ইয়োরোপের জার্মেনী ও অন্য অনেক দেশে তাঁর কোন কোন বইয়ের যে অনুবাদ হয়েছে তা প্রায় সবই ইংরেজী অনুবাদ থেকে অর্থাৎ সেগুলো তর্জমার তর্জমা। তাঁর ভাল ভাল বিস্তর বইয়ের কোন বিদেশী ভাষাতেই অনুবাদ হয়নি। যা অনুবাদ হয়েছিল, তারই এত আদর হয়েছিল। আর আমাদের দেশে তাঁর গুণগ্রাহী অগণিত লোক আছেন, তিনি যে-ভাষায় কাব্য লিখেছেন,

তাও আমাদেরই ভাষা, অথচ আমাদিগকে দমদমায়, বর্ধমানে ও অন্যত্র রবীন্দ্র-জয়ন্তী সভায় বলতে হয়েছে, যে, সভায় উপস্থিত অনেক শিক্ষিত লোক আছেন যাঁদের একখানাও নিজস্ব রবীন্দ্ররচিত বই নেই। কেউ কোথাও এ কথার প্রতিবাদ করেননি। আমাদের গুণগ্রাহিতা বাস্তব ও "কেজো" হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আষাঢ়, ১৩৪৮

মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি

মিস্ রাথবোন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একজন নারী সদস্য। তিনি অন্য অনেক ইংরেজের মত ভারতহিতৈষী বলে মুরুব্বিয়ানা আত্মপরিচয় দিয়েছেন। ১লা বৈশাখের রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের অভিভাষণ "সভ্যতার সংকট"—এ ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তাঁর যে মত প্রকাশ পেয়েছিল, মিস্ রাথবোনের চিঠির জবাবে সেই মত অন্য আকারে ও অন্যভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। মিস রাথবোন নিজেই বলছেন তাঁর অভিযোগটা এক পেশে, অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তার উল্টো দিকেও অনেক বলবার আছে।

তিনি বলছেন, "আপনাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও আমরা যুদ্ধ জিতব—যাঁদের চিন্তাধারা আপনাদের থেকে ভিন্ন তাঁদের সাহায্য আমরা পাচ্ছি।" তাই যদি হয়, তা হলে এত বড় লম্বা চিঠিটা তিনি নাই ঝাড়তেন।

আষাঢ়, ১৩৪৮

মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ ইংরেজীতে ভারতবর্ষের সব দৈনিকে ছাপা হয়েছে। মিস্ রাথবোনের ও অন্য ইংরেজদের রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি পড়া উচিত বলে ইংরেজীতে লেখাই ঠিক হয়েছে। এখানে যে বাংলাটি দেওয়া হচ্ছে, এটি কবির লেখা নয়, তাঁর দ্বারা সংশোধিতও নয়। কিন্তু এর থেকে তার মন্তব্যের তাৎপর্য মোটামুটি বোঝা যাবে।

ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস রাথবোনের 'খোলা চিঠি' পড়িয়া আমি গভীর বেদনা বোধ করিয়াছি। মিস রাথবোন কে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি ধরিয়া লইতেছি, তিনি এই চিঠিতে, 'সদুদ্দেশ্যশালী' সাধারণ ব্রিটেনবাসীর মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই পত্র প্রধানতঃ জবাহরলালের উদ্দেশ্যেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস রাথবোনের দেশবাসিগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা হইলে তিনিই মিসের এই অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগ-শয্যা হইতেও, এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে। মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুতঃ ধৃষ্টতার সহিত যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহার দেশ-বাসীদের অভীষ্টসিদ্ধির কোনও সাহায্য হয় নাই। "ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও" গরীব দেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস রাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক, ততটুকু হইতে বাস্তবিক আমরা বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু একথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন, আমাদিগকে অল্পশিক্ষিত করিবার সর্ব প্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাঁহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্য যে কোন ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল? আমাদের যে সকল তথাকথিত ইংরেজ বন্ধু মনে করেন যে তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতে ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার জ্যেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ।

তাহাতে তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিতই হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজী ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে দুই শতাব্দী ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজী ভাষায় লিখনপঠনক্ষম (literate) হইয়াছে। অন্য দিকে রাশিয়ায় মাত্র ১৫ বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ৯৭টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ প্রকাশিত স্টেটস্‌ম্যান্স ইয়ার বুক হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহিব রাশিয়াব অনুকূলে পক্ষপাতভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।)

কিন্তু এই তথাকথিত সংস্কৃতিব চেয়ে আজ জীবনধারণের সম্বল চাই আগে। জীবনোপায়ের ভিত্তির উপরই জ্ঞানালোকদানের নিমিত্ত শিক্ষায়তন নির্মিত হইতে পারে।

আমাদের দেশেব টাকার থলি দুই শতাব্দীকাল দৃঢ়-মুষ্ঠিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদেব ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাঁহারা আমাদেব দেশেব দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নেব জন্য ক্রন্দন করিতেছে। আমি পল্লী-নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি;—কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কূপ বিরল। আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে, খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে, এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে, এদেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক গাড়ী খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পৌঁছিতে দেখি না তখন আমি বিলাতেব ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখিয়া থাকিতে পারি না।

ব্রিটিশ রাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু

আমাদের দেশে 'আইন ও শৃংখলা' রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্যই কি তবে আমরা ইংরেজদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। যখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অস্ত্র তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে ইংরেজরা চীৎকার করিয়া আমাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছে, তোমরা তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না !

ইতিহাসে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই যে, সশস্ত্র যোদ্ধারাও ভয়ে প্রবলতর শক্তির সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধেও এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, ফরাসী এবং গ্রীক সৈনিকগণও প্রবলতর অস্ত্রশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া ইউরোপে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের দরিদ্র, নিরস্ত্র, অসহায় কৃষক, রোরুদ্যমান শিশুর ভারে ভারাক্রান্ত কৃষক, সশস্ত্র গুণ্ডার আক্রমণ হইতে ঘরবাড়ী রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, তখন বোধ হয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ আমাদের কাপুরুষতা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসেন। ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক তাহার ঘরবাড়ী শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ফতোয়া জারি করিয়া লাঠি চালনা শিক্ষা পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চিরকাল সন্ত্রস্ত এবং তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের কৃপার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগকে ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত্র ও পৌরুষহীন করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতকাল ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে আজ নাৎসীরা তাহাকে সেই প্রভুত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে স্পর্ধিত আহ্বান করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ নাৎসীদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে; কিন্তু মিস রাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্তচুম্বন করিব কেননা তাহাদের সেই হাত আমাদিগের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। কোন একটি গবর্ণমেণ্ট ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের কথা শুনিয়া

বিচার করা চলে না, সেই গবর্ণমেণ্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা দ্বারাই বিচার করিতে হয়। ইংরেজরা যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এইজন্য নহে যে তাহারা বিদেশী, যতটা এইজন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে। আমার এরূপ মনে করা অনুচিত হইত না যে, ভদ্রগোছ ইংরেজরা ভারতীয়দের এই সকল ক্ষতি ও অনিষ্ট মনে রাখিয়া অন্ততঃপক্ষে নীরব থাকিবেন এবং আমরা যে নিষ্ক্রিয় আছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন ; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের অনিষ্ট সাধনের উপর আবার আমাদের অপমানও করিবেন এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন, তাহা একেবারে শালীনতার সকল সীমার বাহিরে।

আষাঢ়, ১৩৪৮

বালকবালিকাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী

ভারতী সাহিত্য সভা কলকাতায় বালকবালিকাদের জন্যে বালকবালিকাদের দ্বারা রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বন্দোবস্ত করে যথাযোগ্য কাজ করেছেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা যাতে আনন্দের সঙ্গে হয়, তার জন্য কবি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করেন এবং স্বয়ং সেখানে নানা রকমে তাদের চিত্তবিনোদনও করেছেন। তাছাড়া তাঁর নানা গদ্য ও পদ্য কাব্য গান ও অভিনয়ের দ্বারা তিনি ছেলে-মেয়েদের নানা রকম আনন্দের যে স্থায়ী আয়োজন করে রেখেছেন, তা অতুলনীয়। ভারতী সাহিত্য সভার সঙ্গে এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছিলেন "পাঠশালা", "রংমশাল", "মৌচাক", "মাস পয়লা", "ভাইবোন", "কৈশোরক", "রূপকথা", "রামধনু", "কিশোর বাংলা", "আনন্দ মেলা" প্রভৃতি। এতে বালক বালিকাদের যে অনাবিল সুখ হয়েছিল, তা তারা অনেকটা প্রত্যহ ঘরে বসে পেতে পারবে যদি কবির "শিশু", "শিশু ভোলানাথ", "শারদোৎসব", "মুকুট",

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা" "খাপ ছাড়া", "সে", "ছড়ার ছবি" প্রভৃতি বই তারা পড়তে পায়। ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসীমা, মা, দিদি—এঁরা সবাই যোগানদার হতে পারবেন।

সংযোজন

প্রবাসী, ১৩২০ অগ্রহায়ণ

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে যদি কেহ নতুন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া করেন, তাহা হইলে তাহা নূতন কিনা এবং নূতন হইলে আবিষ্ক্রিয়াটির মূল্য কি, তাহা জানিবার জন্য আমরা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতের অপেক্ষা করিতে বাধ্য হই, কারণ আমাদের দেশে এরূপ বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বড় কম যাঁহাদের মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। এখন এরূপ আশা হইতেছে যে আমাদের এই দুরবস্থা চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না।

সুকুমার শিল্পক্ষেত্রেও আমরা এইরূপে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষিতা করিয়া করিয়া এখন স্বাধীনভাবে ললিতকলার রসগ্রহণে সাহসী হইয়াছি।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা করিবার প্রয়োজন বাংগালীর বহুকাল হইতেই ছিল না। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাত গিয়া তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনেক পূর্ব হইতেই তাঁহাকে জগতের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ সমঝদার লোকের, বা এরূপ রসজ্ঞের মত বুঝিয়া সুঝিয়া জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করিবার লোকের একান্ত অভাব বংগদেশে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও শেষোক্ত ব্যক্তিদের মত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগৌরব কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাই আজ তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ দ্বারা জগতের সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হওয়ায় আমরা অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছি। "আমরা তাঁহাকে মোটেই চিনিতে পারি নাই; বিদেশী তাঁহাকে চিনাইয়া দিল, তবে চিনিলাম," এরূপ চিন্তাপ্রসূত লজ্জায় ও ক্ষোভে আমাদিগকে মাথা হেঁট করিতে হইতেছে না। বাস্তবিক স্বদেশীয় মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব অনুভব করিতে না পারার মত হীনতা সেই দেশবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? সেই দীনতা হইতে ভগবান আমাদের রক্ষা করিয়াছেন।

একথা কিন্তু বলিতে পারা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বঙ্গের

'মান্যগণ্য' ব্যক্তিরাও বুঝিয়াছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রশংসিত হইবার পর, তথায় ভারতের সহকারী সচিব মন্টেগু সাহেব তাঁহার গুণগান করার পর, বড়লাট সাহেব রবীন্দ্রনাথকে 'Poet Laureate of Asia' বা 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি' বলার পর, কিছুদিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য (Doctor of Literature) উপাধি দিবেন। কিন্তু তিনি এবার বিলাত যাইবার পূর্বে তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার কতগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বালকদিগের উপযোগী করিয়া সম্পাদন করিয়া 'পাঠসঞ্চয়' নামে একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁহাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার জন্য পাঠান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ কিন্তু ঐ পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কিংবা উহার লিখনরীতির (Style) মধ্যে কোন প্রকারের গুণ দেখিতে না পাইয়া উহা অগ্রাহ্য করেন। সেই নামঞ্জুর পুস্তকের লেখককে আজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কি উপাধি দিবেন বা না দিবেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু আমাদিগকে ইহা লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাহিত্যরসজ্ঞতা রাজপুরুষদের মোসাহেবীর সহিত হয়ত অভিন্ন, এরূপ সন্দেহ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও চাপা যাইবে না। অবশ্য ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে সত্য সত্যই বিশ্বপণ্ডিতদের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদের প্রভাবেও যে বাংলা সাহিত্যের সম্মান হইতেছে ইহা শুভ লক্ষণ।...

রবীন্দ্রনাথের সম্মানে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইল। মানবজাতির লাভ এই হইল যে সাহিত্যের মনোনয়নরাজ্যে কার্যতঃ জাতিবর্ণদেশ নির্বিশেষে মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইল। মানবাত্মা স্বরূপে আশায় আকাঙ্ক্ষায় যে সর্বদেশে এক, তাহা আবার একবার নূতন করিয়া বুঝা গেল। বাঙালী বুঝিতে পারিল, তাহার সাহিত্য প্রাদেশিক নয়, বিশ্ববাসীর আদরের জিনিস তাহাতে আছে। এই বোধ যদি আমাদিগকে সর্ববিষয়ে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, ভীরুতা এবং আশাহীনতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ করে তাহা হইলেই মঙ্গল।

তথ্য সংযোজন

পৃষ্ঠা ৭।

চৈত্র ১৩২০

শান্তিনিকেতন স্কুল সম্বন্ধে পুলিশের দৃষ্টি বরাবরই সজাগ ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতেও শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট পুলিশকে গুরুতরভাবে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিরস্ত করেছে। ১৯২৫ সালে বাংলা সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা ওটেন সাহেব লিখেছিলেন,—

While at points one may criticise or question, the scheme as a whole is not at all fantastic ; it is the project of an independent and lofty, yet practical mind, that has endeavoured to provide for youth in wholesome conditions, fare for body and mind and spirit.

ঐ সময়েই লর্ড লিটন ভারতবর্ষের ভাইসরয়। তিনিও তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন,—

I am not satisfied to base our opinion of Sir Rabindranath Tagore's university at Bolepur solely upon police reports. I am personally acquainted with this institution and I do not wholly endorse the police opinion of it···my opinion of it is based rather on my knowledge of Sir Rabindranath's own influence, aims and ideals than upon the presence either on the staff or among the students of individuals with anti-British sentiments.

এই মন্তব্যগুলি জাতীয় মহাফেজখানার (Home Dept. 181/1925—Poll) একটি ফাইলে বিধৃত আছে।

পৃষ্ঠা ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

'নন্দলাল বসুর অভিনন্দন' প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে যে 'অচলায়তন' নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ

আছে সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে—"অচলায়তন অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন আচার্য অদীনপুণ্য, সন্তোষবাবু (মজুমদার) সাজিয়াছিলেন উপাচার্য। দিনেন্দ্রনাথ পঞ্চকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন এবং জগদানন্দ রায় মহাশয় সাজিয়াছিলেন মহাপঞ্চক। ক্ষিতিমোহনবাবু দাদাঠাকুর সাজিয়াছিলেন। অভিনয়ের ভিতর একজায়গায় আচার্য দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন, ইহা অভিনয়ের মধ্যেও ভালো লাগিল না। অচলায়তন অভিনয়ের সময় স্বর্গীয় পিয়র্সন সাহেব শোনপাংশু সাজিয়া কেমন উদ্দাম নৃত্য করিতেছিলেন তাহা এখনও মনে আছে। তিনি তখন বাংলা শিখিয়াছিলেন যদিও উচ্চারণের অনেক ত্রুটি তখনও ছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও দমেন নাই। আচার্য অদীনপুণ্যরূপী রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সুন্দর মূর্তি চোখে ভাসিতেছে। সাজটা একটু নূতন ধরণের হইয়াছিল। একটা সাদা রেশমের চাদর বুকের উপর দিয়া ঘুরাইয়া পিছনে গ্রন্থি বাঁধিয়া তিনি পরিয়া আসিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৭১-৭২ ১৩৭১ সং)

পৃষ্ঠা ৯। চৈত্র ১৩২০।

যে অংশটি chaste and elegant Bengali-তে লিখতে বলা হয়েছিল সেটি হল :—

> যেদিন লিখবার ঝোঁক চাপে সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। এক সালে কোকিল, পাপিয়া, হাঁস সকলগুলি ডাকতে আরম্ভ করে আর বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ ছুটে এসে পড়ে। কাকে যদি বা বলা হয় ত অনেক পড়ে থাকে। একটা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন।

১৯১৬ সালে মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন—"প্রশ্নপত্রের বাংলা নমুনার টুকরোটি কার আমি তাই ভাবছিলুম। অনেক চিন্তা করে শেষকালে ভাবলুম হয়তো বা ছিন্নপত্রের কোন চিঠির মধ্যে ঐ কটা লাইন লিখে থাকব।" প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

পৃষ্ঠা ১৩। লেখিকার আদর।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা তাঁর স্বামী বসন্তরঞ্জনের স্মরণে 'বসন্ত প্রয়াণ' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন (৮ই চৈত্র ১৩২০)।

প্রভাতকুমার জীবনীতে মন্তব্য করেন, "লেখার মধ্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় ছিল বলিয়াই যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন তাহা নহে, ব্রজেন্দ্রনাথের কন্যা বলিয়াও মমতাবশত এটি লেখেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়।" প্রভাত কুমার লেখিকার কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা করেছেন তা সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে কারণ ১৯১৪ সালের ২৯ শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ রদেনস্টাইনকে লিখছেন,

"She has written a book in Bengali which is a remarkable production, destined to take a very high place in our literature." (Imperfect Encounter, Ed. Mary M. Lago. পৃষ্ঠা ১৬১)

পৃষ্ঠা ১৯। জাপানে রবীন্দ্রনাথ।

এই প্রসংগে অধ্যাপক নিকি কিমুরার নাম উল্লিখিত আছে। অধ্যাপক কিমুরা এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে এসেছিলেন। জাপান যাত্রার কথা মনে হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক কিমুরাকে সংগে নিতে চান। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ কিমুরাকে লিখলেন,

Dear Mr. Kimura,

Instead of starting for Japan immediately my intention is to wait a few months longer. Meanwhile sending you there to make necessary preparations. I want to know Japan in the outward manifestation of its modern life and in the spirit of its traditional past. I also want to follow the traces of ancient India in your civilisation and have some idea of your literature if possible. I doubt not that you will be able to help me. I must ask you to protect me, while I am there, from pressure of invitation and receptions and formal meetings. I want to live very simply and quietly with as little (word illegible) as possible.

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore

[স্টিফেন হে-র Asian Ideas of East and West গ্রন্থে ৫৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত]

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিমুরার স্মৃতিচারণায় আছে—I called on him at his Jorasanko home every day ; sometimes several times in a day from my boarding house...Next year [1915] he told me that he had long cherished a desire to go to Japan and that he would like to visit Japan by all means within one or two years. He requested me to accompany him to act as his interpreter and also asked me to make all necessary arrangements beforehand. (Rashbehari Bose : His struggle for Indian Independence গ্রন্থে কিমুরার প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।)

পৃষ্ঠা ২০। রবীন্দ্রনাথ কানাডার মাটি মাড়াইবেন না।

কানাডায় যাতে ভারতীয় শ্রমিক প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষ সদাই সচেষ্ট ছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বাধা দেওয়ার কিছু অসুবিধাও ছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে 'কোমাগাটামারু' নামে জাহাজে একদল পাঞ্জাবী কানাডায় গেলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়দের প্রতি অপমান বলে মনে করেছিলেন। তাই কানাডার নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

পৃষ্ঠা ২০। প্রিয়নাথ সেন।

কবির যৌবনকালের বন্ধু প্রিয়নাথ সেন সম্বন্ধে তিনটি গ্রন্থ উৎসাহী পাঠকেরা দেখতে পারেন। 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি' (১৩৪০), 'দুই কবি'—প্রমোদনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড। প্রিয়নাথ সেনের মৃত্যু হয় ১৯১৬ সালের ২৫শে অক্টোবর। রামানন্দ লিখেছেন 'দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সম্ভবতঃ বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সম্বন্ধে আর কিছু লেখেন নি। প্রিয়নাথের মৃত্যুর আঠারো বছর পরে 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'র একটি সামান্য ভূমিকা লেখেন মাত্র।

পৃষ্ঠা ৩৩। দলাদলির মিটমাট।

১৯১৭ সালের কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার কথা হয় অ্যানি বেশান্তের। কিন্তু হোমরুল আন্দোলন এই সময়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠলে ইংরেজ সরকার অ্যানি বেশান্ত ও তাঁর দুই সহকর্মী অরুণ্ডেল ও ওয়াদিয়াকে গ্রেপ্তার

করে। কলকাতার টাউন হলে প্রতিবাদ সভার অনুমতি না পেয়ে দেশের নেতারা চুপ করেই থাকলেন। একা রবীন্দ্রনাথ নিজের নামে সভা ডেকে ১৯১৭ সালের ৪ঠা অগস্ট রামমোহন লাইব্রেরী হলে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' নামে প্রবন্ধ পাঠ করে প্রতিবাদ জানালেন।

বাংলা কংগ্রেসের একটা বড় অংশ মডারেট নামে পরিচিত ছিল। তাঁরা বেশান্তের হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতাকে পছন্দ করতে পারছিলেন না। একজন প্রবীন সম্মানিত মডারেট রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করবেন এতে তাঁর আপত্তি ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে তখন সভাপতি নির্বাচনের ঢেউ চলছে। অ্যানি বেশান্ত এবং মাহমুদাবাদের রাজার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশান্তের পক্ষেই সমর্থন বেশি দেখা গেল।

কলকাতায় তখন কংগ্রেসের আর এক পক্ষ—একস্ট্রিমিস্টদের সংখ্যা বেশ ভারি। সে দলে রয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। তাঁরা বেশান্তের সভাপতিত্বই চান। ফলে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯১৭, তারিখে অভ্যর্থনা সমিতির একটা রিকুইজিশন সভা ডাকা হলো এবং অভ্যর্থনা সমিতির পাল্টা সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাবিত হল। রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদ যদি খালি হয় এবং বেশান্ত যদি সভাপতি নির্বাচিত হন তবেই তিনি অভ্যর্থনা সমিতির পদ নিতে পারেন। দুপক্ষের বিরুদ্ধতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়লেন। মডারেট কাগজপত্রে তাঁর নামে বিরূপ সমালোচনা করতে লাগলো। একস্ট্রিমিস্টরাও রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে নিজেদের সংগে যুক্ত করে রাখতে চেষ্টা করলেন। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাও বল্লেন যে বেশান্তকে সভাপতি করতে হবে বলেই তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ নিয়েছেন।

অবশেষে হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের মধ্যস্থতায় এই দ্বন্দ্ব মেটাবার চেষ্টা হল। বেশান্ত সভাপতি হবেন—এ প্রস্তাবে সবাই রাজী হলে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্বের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে পরপৃষ্ঠার চিঠিটি দিয়ে—

Calcutta 1st. oct. 1917

To Mr. Surendranath Banerjea.

Dear Mr. Banerjea,

As the time for coming to a final decision about the compromise between the two parties is extremely narrow, I hasten to send you a copy of the Bengali letter conveying my resignation of the chairmanship to the secretaries of the Reception Committee. I earnestly hope that this pave the way to the compromise desired by the whole country.

Yours sincerely

(sd) Rabindranath Tagore

(অক্টোবর ২, ১৯১৭ সালের 'দি বেংগলী' থেকে উদ্ধৃত)

এই প্রসঙ্গে Tagore Studies 1972-73 পত্রিকায় Rabindranath and the 1917 Calcutta Congress প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৪২। রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক সমস্যা।

এই বিষয়ে ১৯১৭ সালের ৪ঠা আগস্টের The Bengalee পত্রিকায় নিম্নলিখিত খবরটি পাওয়া যায়।

SIR RABINDRANATH AT THE INDUSTRIAL CLUB

The members of the Calcutta Industrial club gave an at home to Sir Rabindranath Tagore at their club premises at 5, Dharamtolla street at 6.30 p. m. on Friday evening. Sir Rabindranath discoursed on Industrial matters on grounds of comparative development of industries in India and in foreign countries. After light refreshments the party seperated.

পৃঃ ৪৫। ভারতবর্ষের প্রার্থনা।

India's prayer

I

Thou hast given us to live

Let us uphold this honour with all our strength and will ;

For Thy glory rests upon the glory that we are.
Therefore in thy name we oppose the power
that would plant its banner upon our soul.
Let us know that Thy light grows dim
in the heart bears its insult of bondage,
That the life, when it becomes feeble,
timidly yields Thy throne to untruth.
For weakness is the traitor who betrays our soul.
Let this be our prayer to Thee—
Give us power to resist pleasure where it enslaves us,
To lift our sorrow up to Thee
as the summer holds its mid-day sun,
Make us strong that our worship may flower in love,
and bear fruit in work.
Make us strong that we may not insult
the weak and the fallen,
That we may hold our love high
where all things around us are wooing the dust.
They fight and kill for self-love giving it Thy name,
They fight for hunger that thrives on brother's flesh,
They fight against Thine anger and die.
But let us stand firm and suffer with strength.
For the True, for the Good, for the Eternal in man,
For thy kingdom which is in the union of hearts.
For the Freedom which is of the soul.

II

Our voyage is begun, Captain, we bow to Thee.
The storm howls and the waves are wicked and wild,
but we sail on.

The menace of danger waits in the way to yield
to Thee its offerings of pain,
And a voice in the heart of the Tempest cries : "Come
to conquer fear !"
Let us not linger to look back for the haggards, or benumb
The quickening hours with dread and doubt.
For Thy time is our time and Thy burden is our own
And life and death are but Thy breath playing upon
the eternal sea of Life.
Let us not wear our hearts away picking
small help and taking slow count of friends,
Let us know more than all else that Thou
art with us and we are Thine for ever.

পৃঃ ৪৭। শ্রীযুক্ত প্যাটেলের বিল সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর মত।

(The letter referred to, reprinted below, was in reply to an invitation from Mr. R. G. Pradhan, Editor of the Bharat Sevaka Magazine, Nasik, for an expression of opinion on Mr. Patel's Bill.)

Sir,

In answer to your letter dated the 8th December, I hasten to answer that Hon. Mr. Patel's Bill has my heartiest support.

It is humiliating to find that some of our countrymen are opposing this Bill under the notion that it will injure Hindu Society if it is passed. They do not seem to consider that those who are already willing to accept the social martyrdom should not have any further coercion, passive or active, from any governing power, to oblige them to observe against their will such conventions as are not based upon the foundation of moral laws. To say that Hindu Society cannot exist unless it

has victims who are forcibly compelled to live the life of falsehood and cowardice, is tantamount to saying that it should not exist at all. Moreover, such an implication is a libel against the spirit of Hinduism, which all through its history has been accommodating differences of creeds and customs, allowing mixture of castes and making new social adjustments from the time of the Mahabharat until now when an alien Government has nearly succeeded in petrifying our social body with its rigid laws, depriving it of life's flexibleness and thus hastening its fatal stage of senility. No doubt, society everywhere looks upon with suspicion and treats with hostility those men who choose to think and act for themselves, who have an invincible love for intellectual and moral freedom. But the community, which goes beyond all limits of endurance, which takes every step to make it impossible for such men to live within its pale, the men who have the courage and honesty of their conviction and are, therefore, best fitted to fight for truth and righteousness is doomed to breed in terminable generations of slaves. Where the society is terribly effective in its weapons of persecution it is shameful to appeal to a foreign Government to stiffen by its sanction a social tyranny, to rob people of their right to the freedom of conscience and in the next moment to ask from the same Government a wider political emancipation. Those who feel no compunction in invoking the organised power of the State to compel or help by its connivance a weak minority to submit to the worst form of social slavery, can certainly not be held as fit to claim a large share of such power.

Yours faithfully,

Santiniketan, Dec. 19th, 1918. Sd/-Rabindranath Tagore.

পৃঃ ৫০ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র ।

২৯শে মে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার তাঁর এই উপাধি ত্যাগকে স্বীকার করে নেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে নাইট উপাধি রাজা দিতে পারেন রাজাই কেড়ে নিতে পারেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এ উপাধি ত্যাগ করার কোনই অধিকার নেই। ১৯১৯ সালের ১৭শে সেপ্টেম্বর অমৃতবাজারে এই তথ্য প্রকাশিত হয়—

DR. TAGORE'S KNIGHTHOOD

The following appears in the "Times" dated August 2 received by the last mail: Mr. Montagu states in a written answer that the title conferred on Sir Rabindranath Tagore has not been revoked as he asked in his letter to Viceroy.

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে ভাইসরয় চেমসফোর্ড রবীন্দ্রনাথকে ঐ চিঠি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে জানান যে এমন কোন অনুরোধ তাঁর কাছে আসে নি।

পৃঃ ৫৭। জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা।

এণ্ডরুজকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :—

The German greeting and the gift that have come to me from Germany on the occasion of my 61st birthday are overwhelming in their significance for myself. I truly feel that I have had my second birth in the heart of the people of that country, who have accepted me as their own.

পৃঃ ৬০। দুটি পুস্তিকা।

বর্ষামঙ্গল গ্রন্থের গানগুলি ছিল—

১। দারুণ অগ্নিবাণে ২। এসো এসো হে তৃষ্ণার জল ৩। ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে ৪। হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় ৫। কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে ৬। আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে ৭। আজ আকাশের মনের কথা ৮। এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে ৯। পুব সাগরের পার হতে ১০। আজি বর্ষারাতের শেষে ১১। শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার

১২। বহ্নযুগের ওপার হতে ১৩। বাদল বাউল বাজায় ১৪। একী গভীর বাণী ১৫। আমার হৃদয় আজি যায় যে ভেসে ১৬। ভোর হল যেই ১৭। বৃষ্টি শেষের হাওয়া ১৮। বাদলধারা হল সারা

পৃঃ ৬১। বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন অগ্রহায়ণ ১৩২৮-এ মুদ্রিত হয়

শান্তিনিকেতন

ব্রহ্মচর্যাশ্রম

আগামী ১১ই পৌষ হইতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পূর্ব-বিভাগ (বিদ্যালয়) এবং উত্তর বিভাগের (বিশ্বভারতীর) নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। কতকগুলি ছাত্রীকেও নূতন বৎসর হইতে আশ্রমে রাখিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

২৯ শে পৌষ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী উভয় বিভাগে প্রবেশাধিকার পাইবেন।

অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী আগামী অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে "বিশ্বভারতীতে" অধ্যাপনা আরম্ভ করিবেন। যাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার নির্দেশানুসারে অধ্যয়ন ও তাঁহার পাঠাবলী শ্রবণ করিয়া গবেষণা করিতে চাহেন, তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন।

পৃঃ ৭৮। লর্ড লিটনের দ্বিতীয় চিঠি।

১৯২৪ সালে ঢাকায় পুলিশ বাহিনীর এক সভায় লর্ড লিটন একটি ভাষণ দেন। তার একাংশে ছিল,

The thing that has disturbed me more than anything else since I came to India is to find that mere hatred of authority can drive Indian men to induce Indian woman to invent offences against their own honour merely to bring discredit upon Indian Policeman. (The Statesman August 6, 1914).

স্বভাবতই এই ভাষণে রাজনৈতিক মহলে ক্ষোভ প্রবল হলো। ১৯শে অগস্টের স্বরাজ্য পার্টির সভায় চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু বক্তৃতা করলেন। সরোজিনী বললেন,

Take away your Reforms, treat them as scraps of paper, take away the concessions you gave us and make ashes of them in your hearthfire—take away all these things—all the privi-

leges that you have given to us, we care not a jot or trifle for your gifts and favour but not with impunity shall a man live who dares to lay his fingers upon the living traditions of India's honour.

লর্ড লিটন ব্যক্তিগতভাবে উন্নত রুচির মানুষ ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ভারতীয় নারীর প্রতি অপমানকর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে একথা বলেন নি। সেই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার জীবনীতে লিখছেন, "কি ভাবে তিনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করেন তাহা সমসাময়িক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করিয়াছিল। লর্ড লিটন তাঁহার প্রতি যে সব আক্রমণ হয় তাহার একটা জবাব লিখিয়া ২০ অগস্ট বাংলা সরকারের দপ্তরখানায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কি ভাবে তাহা প্রকাশ করা যায় তাহাই হয় সমস্যা। কারণ খবরের কাগজের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেওয়া তখন লাট মর্যাদায় বাধিত। কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র লোককে লিটনের জবাবটি দেখানো হয়, তাঁহারা উত্তরটা সমীচীন বলিয়া মনে করেন। প্রথমে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে মধ্যস্থ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজী হইলেন না। নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র তখন লাট সভার মেম্বার—তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম করেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে থাকিতে রাজী হন নাই। পরে ফজলুল হক সাহেবের সবিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ (২২ অগস্ট ১৯২৪) লাটপ্রাসাদে লিটনের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া কি ভাবে এই জটিল পরিস্থিতির সমাধান করা যায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে আদৌ লাট সাহেবের সংগে দেখা করেন নি সেই কথা বলেছেন রামানন্দ, পৌষ ১৩৩২-এর বিবিধ প্রসংগে। (পৃ ১০০-১০১ বর্তমান গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) ২২ শে অগস্ট ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লিটনকে যে চিঠি লেখেন তা ২৪শে অগস্টের স্টেটস্ম্যানে ছাপা হয়। সে চিঠিটি উদ্ধৃত হলঃ-

6 Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta
22 August 1924

Your Excellency;

I am being urged by my countrymen to assist them in giving expression to their sense of indignation at the remark

made by your Excellency in referring to the complaint regarding police outrages on Indian woman.

There can be no room for doubt that the great majority of my countrymen who have come across your Excellency's reported words have been profoundly hurt by what they have taken them to mean—a meaning so far as I am aware which has upto now have not been authoritatively stated to have been wrongly attributed to those words.

At the same time knowing what I do of your excellency personally and of the traditions of chivalry which are your inheritance, I find if extremely difficult to believe that it could have been your Excellency's intention to cast aspersions on the fair names of the women of our country or even to hurt the feelings of my countrymen.

So I feel that I owe it to your Excellency, no less than to myself, frankly to write and ask what your Excellency's real meaning was, before saying anything further about the matter.

Trusting your Excellency will excuse any liberty which I may have unknowingly taken.

(Sd) Rabindranath Tagore.

পৃঃ ৮০। রক্তকরবীর ইংরেজী সংস্করণ

Visva Bharati Quarterly September 1924 সংখ্যায় রক্তকরবীর ইংরাজী অনুবাদ Red Oleanders প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ৮৭। "সুন্দর দূত।"

বৈশাখ ১৩৩২-এ প্রবাসীতে কালিদাস নাগ মহাশয়ের 'সুন্দর দূত' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সে কবিতায় আছে—

মনে আছে, মনে রবে তব যাওয়া আসা,
অন্তহীন আশা ভালবাসা!

কৃতজ্ঞ হৃদয়
পেয়েছে তোমার পরিচয়,
জেগেছে মরণ ঘুম হতে
শান্তি প্রীতি প্রাণের আলোতে
তাই তব তরীখানি ঘিরে
ফিরে ফিরে
বেড়িতেছি স্নেহ ফাঁস—তৃণপাশ দিয়ে
কার সাধ্য ?—কে তোমারে যাক দেখি নিয়ে !
জানি ছিঁড়ে যাবে এই পেলব বাঁধন
মোদের একান্ত চাওয়া সহস্র কাঁদন
পারিবে না একঘাটে তোমারে রাখিতে ;
তোমার আঁখিতে
পড়েছে নূতন আলো নব পূর্বাচলের আহ্বান !

পৃঃ ৯৪। শান্তিনিকেতনে গান্ধীজী।

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনৈতিক সুবিধা হতে পারে এই কথা মনে করে গান্ধিজী, তিলক প্রভৃতি নেতারা ইংলণ্ডের জন্য সৈন্য সংগ্রহের কাজে উৎসাহী হয়েছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩৩২ আষাঢ়ের বিবিধ প্রসঙ্গে লেখেন, "নিজেদের দেশ রক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত বা স্বাধীনতা লাভের জন্য বিজেতা প্রভুর সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত নহে।" এই মতকেই 'শান্তি-নিকেতনে গান্ধিজী' রচনায় রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের 'উক্ত রূপ' মত বলে উল্লেখ করেছেন।

পৃঃ ১০১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত্যুদিনের যে কবিতার উল্লেখ প্রথম স্তবকে করা হয়েছে তা ফাল্গুনের প্রবাসীতে 'দ্বিজের দ্বিজত্ব' নামে (কী দেখচি এ! কী করুণা! কী প্রেম! কী স্নেহ!) প্রকাশিত হয়। ঐ সঙ্গেই 'ত্রিপথগা আনন্দলহরী' নামে আর একটি কবিতাও মুদ্রিত হয়।

পৃঃ ১১৮-১২০। রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রচিত যে কবিতাটির উল্লেখ আছে সেটি 'জন্মোৎসবের

দিনে' (বাঁশি যখন থামবে ঘরে) নামে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতেই ৩৭৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

পৃঃ ১৩৬। প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথ।

(সবুজ পত্র আশ্বিন, ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্র)

হঠাৎ দেখা গেল, পঞ্চাশবছরের ভারতী পঁচিশ বছরের প্রবাসীর সঙ্গে কলহ উপলক্ষ্যে শ্লেষনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সমব্যবসায়ীরা যখন নিজের মর্যাদা ভোলে, তখন এরকম অশোভন ব্যাপার ঘটে থাকে। তাই ভেবেছিলেম এ সম্বন্ধে সম্পাদিকাকে আড়ালে আমার মন্তব্য জানাব। কিন্তু আমার কথাটা তেমন করে চাপা দিলে আত্মীয়তা করা হবে, কর্তব্য করা হবেনা।

ভারতীর গৌরবের তালিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্পাদিকা বলেছেন :—

"আর একটি রীতিও ভারতীর সনাতনী। অনেক সম্পাদক পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু কেহই অর্থলিপ্সায় ভারতীর সেবা করেন নাই। ভারতীর সেবা জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।"

এর মধ্যে তিনটি কথা বলবার আছে। প্রথম, ভারতীর যতগুলি সম্পাদক আসরে নেমেছেন, লক্ষ্মীর কোনো না কোনো মহলে তাঁদের আশ্রয় ছিল। ক্ষুধিত পরিবারকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করে সরস্বতীর নৈবেদ্য তাঁদের রচনা করতে হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে নিস্পৃহতার বড়াই শুনে লোকে যে ভক্তি-বিহ্বল হয়ে উঠ্‌বে, এমন আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়, তৎসত্ত্বেও ভারতীর উপস্বত্ব থেকে যদি কিঞ্চিত আয় করতে পারতেন, তবে তাঁদের কেউ যে লজ্জিত হতেন—একথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। অক্ষমতার পিতলকে গিল্টি করে সোনার গহনা বলে চালানো ও প্রতিবেশীর উপরে টেক্কা দিতে যাওয়া গর্বের কথা, কিন্তু গৌরবের কথা নয়।

যদি প্রশ্ন ওঠে—আমার এ কথার প্রমাণ কি ? তাহলে আমি দেখাতে পারি যে, ভারতীর সম্পাদক-পরম্পরা সকলেই গ্রন্থকার। তাঁদের গ্রন্থ তাঁরা লক্ষ্মীর হাটেই বেচে থাকেন। তাঁদের কেউই সরস্বতীর পদ্মবনের ধারে দাঁড়িয়ে বিনা পয়সায় ভাবের হরির লুট দিতে চেষ্টা করেন নি। অন্তত আমি নিজের কথা বলতে পারি। বই ছাপিয়ে হয়ত কখনো যথেষ্ট লাভ হয়নি, বা লোকসানও

হয়ে থাকবে ; কিন্তু সেটা নিস্পৃহতার ফলে নয়, ভাগ্যের নিষ্করুণতারই ফলে। এখনো বলতে পারি আমার বই বিক্রির লাভের অংক যদি বহুগুণিত হবার লক্ষণ দেখায়, তবে হাত জোড় করে লক্ষ্মীকে টোড়ি রাগিনীতে বলব না—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়।"

তৃতীয় কথা হচ্চে এই, প্রাণধারণে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। যাঁরা পৈতৃক বা পরোপার্জিত সম্পত্তির অধিকারী নন, বাধ্য হয়ে তাঁদের উপার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। মানুষের পাকযন্ত্র আছে বলে যদি সেটা লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে লজ্জা সৃষ্টিকর্তার। এস্থলে মানুষকে কেবল এই কথাই ভাবতে হবে যে, উপজীবিকা যাতে অপজীবিকা না হয়। জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ, অন্যায়ের সমর্থন বা মানুষের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনার দ্বারা যদি আয়ের পথ প্রশস্ত করবার চেষ্টা কোনো সম্পাদকের মধ্যে দেখা যায়, তাহলেই বলতে পারব কর্তব্য বুদ্ধির চেয়ে বিষয়বুদ্ধিই তার প্রবল।

বারবার দেখেছি প্রবাসী-সম্পাদক সাধারণের অথবা কোনো কোনো ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের অপ্রিয়তা করে নিজের ক্ষতির কারণই ঘটিয়েছেন। সকল সময়ে তাঁর উত্তেজনা আমার ভালো লাগেনি, অনেক সময়ে মনে হয়েছে অক্ষুব্ধ বিচারবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা হচ্চে না, কিন্তু বরাবর দেখেছি, ঠিক করেই হোক্ ভুল করেই হোক্, সম্পাদক যা সত্য বলে মনে করেছেন, ভয়ে বা লোভে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

একটা কথা মনে রাখা উচিৎ। স্পৃহার কেবল একটি মাত্র রূপ নয়। ব্যক্তিগত খ্যাতি বা কীর্ত্তিগত প্রতিপত্তির স্পৃহাও, প্রবলতায় আর অনেক সময়ে আবিলতায়, অস্পৃহার চেয়ে কম নয়। সে ক্ষেত্রেও কর্তব্যের সীমা লঙ্ঘন করলে সেটাকে রিপু বলে ধিক্কার দিতে হবে। সেই সীমার মধ্যেও বাড়াবাড়ি করা চলে, তখন সেটা কখনো কৌতুকের, কখনো বিরক্তির বিষয় হয়।

প্রবাসী সম্পাদক মাঝে মাঝে কোনো কোনো লেখার পরে ঘোষণাবাক্যে বলে থাকেন যে, সেটা প্রবাসীরই জন্যে বিশেষভাবে লিখিত, সেটা সম্পূর্ণ অনুলিখিত নয়। লেখার এই নেপথ্যবিধানের ইতিহাসটুকু প্রবাসীর প্রতিপত্তি রক্ষার জন্যে করা হয়ে থাকে। লেখাটা ভালো হলে, বা তার অন্য কোনো উচ্চাঙ্গীন উপযোগিতা থাকলে, সেই প্রতিপত্তিই যথার্থ প্রতিপত্তি—তার কোনো বাহ্যম্বরূপের প্রতিপত্তি আমার নিজের কাছে উল্লেখযোগ্য বলে মনেই

হয় না। যখন আমরা কোনো ভদ্রসভায় যাই, তখন গায়ে একখানা চাদর আছে বা সেটা ময়লা নয়, এইটুকুই ভদ্রতারক্ষার পক্ষে দেখবার বিষয়। সেটা মুখে বলবার দরকার হয় না। কিন্তু লোকের পাশে বসে তাকে যদি বলি যে, এ চাদর আমি প্রতিবেশীর আলনা থেকে তুলে নিয়ে গায়ে দিয়ে আসিনি, তাহলে সেটা নিরতিশয় বাহুল্য কথা হয় সন্দেহ নেই। প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে! এইরূপ ব্যাপারে আমি অনেক সময়ে হেসেছি, সে কথা স্বীকার করি।

কিন্তু কৌতুকের সীমা অতিক্রম করবার হেতু কোথায় ঘটে, তার একটা উদাহরণ দিই।—

শ্রীমান প্রমথ "রায়তের কথা" বলে তাঁর একটি প্রবন্ধ সবুজপত্র থেকে উদ্ধৃত করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। সেই পুস্তিকা সম্বন্ধে আমার অভিমত তাঁকে সম্বোধন করে পত্র আকারে লিখেছিলেম। সম্পাদকীয় নির্বন্ধবশত সবুজপত্রে না দিয়ে সেটা ভারতীতে পাঠানো হয়। আজ সেটা পড়তে গিয়ে দেখলেম, ছাপার ভুলে আপাদমস্তক শরশয্যাগত সেই প্রবন্ধে প্রমথর নাম আছে বটে কিন্তু কোথাও সম্বন্ধকারকের কোনো সম্বন্ধই নেই।

এটা হল প্রতিপত্তির লোভ। অর্থাৎ এই অতি অকিঞ্চিৎকর গর্ব যে, ওটা প্রমথকে লেখা পত্র নয়, কিন্তু ভারতীর জন্যেই বিশেষ করে লেখা প্রবন্ধ। এটা হল সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া—একদিক থেকে অন্যদিকে প্রবন্ধের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া। লেখার উপলক্ষ্য পরিবর্তন করা কেবল নয়, নিজের হাতে তার কারক পরিবর্তন করার ন্যায্য অধিকার সম্পাদকের আছে বলে আমি মনে করিনে। এতে কেবল আমি নই, আমার প্রবন্ধও পীড়িত হয়েছে। তাই এই উপলক্ষ্যে, সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমার সনুনয় নিবেদন এই যে, সরবে বা নীরবে পত্রিকার প্রতিপত্তি ঘোষণাকে তাঁরা যেন অগৌরবের বিষয় বলেই মনে করবেন। এইরকম বাহ্য ঘোষণা থেকে ঘোষণার প্রতিযোগিতা প্রবল হয়ে ওঠে;—নিজের দিকে সেই অঙ্গুলি নির্দেশের উত্তেজনা সাহিত্যক্ষেত্রে কখনোই সুদৃশ্য নয়।

সব শেষে আমার নিজের একটা কৈফিয়ৎ আছে। ভারতী সম্পাদিকা টিপ্পনীর মধ্যে এক জায়গায় লিখছেন : "(প্রবাসী-সম্পাদক) বাল্মীকি প্রতিভার কবিকেও সরস্বতীর বিনা পণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্য-শালায় বন্দী করিয়াছেন।"

পূর্বেই বলেছি লক্ষ্মী আমার লেখনীর উপর স্বর্ণবৃষ্টি করলে দুঃখিত হব,

এত বড় উদাসীন কোনোকালেই আমি নই। এই ঔদাসীন্য যদিবা লেশমাত্রও আমার থাকত, স্বয়ং সরস্বতীই আজ তাকে দেশছাড়া করেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁর কবির হাতে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে লক্ষ্মীর দ্বারে অবমানিত করতে ত্রুটি করেন নি। অন্য অনেক হতভাগ্য ভিক্ষুর মত লক্ষ্মীমন্তের মুষ্টি আঘাত পাইনে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুষ্টিভিক্ষাও জোটে না। পাই প্রচুর পরিমাণে হাততালি; কারণ দানের হাতে তেমন তালি বাজে না, যেমন বাজে রিক্ত হাতে। এই ব্যাপারে যে পরিমাণে শরীরটাকে জীর্ণ করে ফেলেছি তার শিকি পরিমাণেও ঝুলিটা পূর্ণ করতে পারিনি। কত শত বুভুক্ষিত দিনে পরিশ্রান্ত চিত্তে মনে মনে মালব্যজীর পুণ্য নাম জপ করেচি। কিন্তু অভাগ্যের অদৃষ্টে সেই নামমন্ত্রগুণও ফলে নি। এমন অবস্থায় ভারতী-সম্পাদিকার সংগে প্রবাসী সম্পাদকের প্রভেদ এই যে, পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবী করলে বিনামূল্যেই পেতেন।

সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যানিকেতনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয়নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবী উত্তরোত্তর বেড়েই চলেচে।

এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিক পত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার। তার পরে এই ইতিহাসের ধারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

প্রবাসী সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে, এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক

সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্ত সম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশী। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈনিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

Hotel Bristol, Wien. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২১ শে জুলাই, ১৯২৬।

পৃঃ ১৫৪। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গল্প

'বলাই' গল্পটি ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ২০৬। নন্দলাল বসুর সম্বর্ধনা

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের লিখিত কবিতাটি 'আশীর্বাদ' নামে পৌষের প্রবাসীতে ছাপা হয়—শিরোনামের পরেই আছে, 'পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলালকে সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ।' কবিতাটি (নন্দন নিকুঞ্জতলে রঞ্জনারা ধারা) বিচিত্রিতার (রবীন্দ্ররচনাবলী ১৭) উৎসর্গ পত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

পৃঃ ২১২। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন।

কবির যে প্রবন্ধের উল্লেখ আছে সেটি হল 'পারস্যযাত্রা' (পৃঃ ৪১৩)

পৃঃ ২১৮। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপকতা।

১৯৩২ সালে দীনেশচন্দ্র সেন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের কয়েকজন সভ্য রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ

অধ্যাপক করে আনতে চান তাঁরা প্রস্তাব করেন রামতনু লাহিড়ী ফাণ্ড থেকে পাঁচহাজার টাকা রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হোক। ২৩শে জুলাই কবিকে বিশেষ অধ্যাপক নিয়োগের সভা হয়।

১১ই জুলাই নির্বাচকমণ্ডলী রবীন্দ্রনাথকে নিয়োগের আবশ্যকতা বুঝে যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন তা হলো এই,—

The Committee feels that in the interest of the University and of the promotion of the study of Bengali Language and Literature, if would be eminently desirable to associate Dr. Rabindranath Tagore with the University as Professor on special terms. The Committee understands that it would be possible to set apart out of the Ramtanu Lahiri Fund a sum of Rs. 5000 per year to be paid to Dr. Tagore as honorarium.

নির্বাচক মণ্ডলীতে ছিলেন—হাসান সুরাবর্দী, প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

পৃঃ ২১৯। বিশ্বভারতীর সংবাদ

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন পত্রিকার উল্লেখ আছে। বৈশাখ ১৩২৬ থেকে শ্রাবণ ১৩৩৩ পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'পত্রিকা প্রকাশ' শিরোনামে লিখেছেন—"আশ্রমে ছাপাখানা স্থাপিত হওয়াতে কর্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতন নামে একখানা কাগজ বাহির করিলেন। ইহা প্রধানত প্রাক্তন ও অধুনাতনদের মধ্যে যোগ রাখিবার জন্যই প্রকাশিত হয়। প্রথমে ইহাতে গুরুদেবের মন্দিরের উপদেশ ও আশ্রম সংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। তারপরে ক্রমে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি বদলাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে সম্পাদক ছিলেন জগদানন্দ রায়, তার পর শাস্ত্রীমশায়; ক্রমে সন্তোষ মজুমদার, বিভূতি গুপ্ত হইয়া কাগজের ভার আমার উপরে পড়িল। আমার হাতে কাগজখানা তিন বছর ছিল তাহার পরে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।"

পৃঃ ২২০। নিত্যেন্দ্রনাথ

মীরা দেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথ (নিত্যেন্দ্রনাথ নয়) জার্মানীতে মারা

গেলেন ৭ই অগস্ট ১৯৩২ (২২শে শ্রাবণ ১৩৩৯)। নীতিন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ জার্মানীতে পাঠিয়েছিলেন ছাপার কাজ শেখার জন্যে—সেখানে তিনি যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যান।

এণ্ডরুজ সাহেব শেষ সময়ে মীরা দেবীকে নিয়ে জার্মানীতে পৌঁছলেন। প্রতিদিন চিঠি লিখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ও আশ্রমের অন্য বন্ধুদের জানাতেন নীতিন্দ্রের খবর। আমরা কিছু কিছু পত্রাংশে এখানে তুলে দিচ্ছি :—

১। My dearest Gurudev,

The end came very rapidly indeed. The hope that had been raised by his marked difference of appearence and better appetite was fallacious and all the while the tubercle was advancing at an enormously rapid pace all over the lungs. It was galloping consumption and not the ordinary form.

The terrible rapidity was at once apparent when the last X-ray was taken about which I wrote to you only yesterday. Indeed you will get that letter along with this one. After I had written it Dr. Schinder saw me and said that the final stage had been reached and he might die any moment. The night before his death he was very restless and yet his spirit was marvellously free and he was not in any serious pain. Oxygen was administered all the night through but in the end the collapse came through heart and lungs both giving way together. Mira has been so brave, but her misery has been very great. The one thing that has given her happiness is to know that she was with him at the last. His love for her was very deep indeed and very touching and it has been a wonderful thing to witness. His last words were said to her when she tried to persuade him to take a little milk. He said 'I will take it in the morning'. Those were the last words he uttered.

...Mira wished the body to be laid to rest in the ground of

this village here rather than that it should be carried far away to be cremated. It is a beautiful village and it will be for her a memory in the years to come that will soften the sorrow. I left it entirely with her. She has taken her last look of the dead and that agony is over. (৭ই আগস্ট ১৯৩২)

২। We were able to complete everything in connexion with Nitu's last resting place in the village graveyard at Schomberg where his body rests among the village people who have been buried there. It would be difficult to find a more beautiful spot where nature sheds her beauty so lavishly on every hand. There is a pine forest always musically whispering as the wind passed through its branches. It is at the very edge of this that Nitu has been to rest as far as his earthly remains are concerned. The grave has been already coverd with beautiful growing flowers and a tree with its young slender stem waves its tender branches at the foot of the grave. It is a flowering tree in the summer and now the red berries on it are providing food for the birds which love the place. Far away to the distant horizon in front of the valley with its green fields and gardens stretches out while the village nestles below in a covert of the hill side and the church tower stands out against the sky. We are very anxious that Nandalal should make with his own hands a covered brass design which will contain a text from your own hand. Thus a memorial in this German land of love and friendship for India will bind the two peoples together. It would be quite impossible to describe the lavish affection which has come from these dear people and has turned sorrow almost with joy. (১৯৩২, সেপ্টেম্বর সংখ্যা বিশ্বভারতী নিউজ থেকে)

পৃঃ ২৩৫। মানুষের পাপ ও ভূমিকম্প।

বিহারের ভূমিকম্প সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন "The conviction is growing upon me that this calamity has come upon us on account of the atrocious sin of untouchability." রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিতে পারেন নি। তিনি এর প্রতিবাদে যা বলেছিলেন তা এখানে তুলে দেওয়া গেল :—

"It has caused me painful surprise to find Mahatma Gandhi accusing those who blindly follow their own social custom of untouchability for having got down God's vengeance upon certain parts of Bihar, evidently specially selected for His desolating displeasure! It is all the more unfortunate, because this unscientific and materialistic view of things is too readily accepted by large sections of our countrymen.

"I keenly feel indignity of it when I am compelled to utter the truism that physical catastrophies have their inevitable and exclusive origin in a certain combination of physical facts. Unless we belive in the inexorableness of universal laws, in the working of which God himself never interferes, imperilling thereby the integrity of His own creation we find it impossible to justify His ways on occasions like the one which has so sorely stricken us in an overwhelming manner and scale.

"If we associate the ethical principles with cosmic phenomena we shall have to admit that human nature is morally superior to a Providence that preaches lessons on good behaviour in orgies of the worst behaviour possible. For we can never imagine any civilised ruler of man making indiscriminate examples of casual victims, including children and members of the untouchable community themselves, in

order to impress others dwelling at a safe distance who possibly deserve severer condemnation.

"Though we cannot point to any period of human history that is free from iniquities of the darkest kind, we still find citadels of malevolence that remain unshaken ; factories that cruelly thrive upon the poverty and ignorance of famished cultivators. It only shows that the law of gravitation does not in the least respond to the stupendous load of callousness that accumulates till the moral foundations of our society begin to show dangerous cracks and civilisations are undermined.

"What is truly tragic is the fact that the argument Mahatma Gandhi used, by exploiting an event of cosmic disturbance, far better suits the psychology of his opponents than his own ; and it would not have surprised me if they had taken the opportunity of holding him and his followers responsible for the visitation of divine anger. As for us, we feel perfectly secure in the faith that our own sins and errors, however enormous, have not got enough force to drag down the structure of Creation to ruin.

"We who are immensely grateful to Mahatma Gandhi for inducing by his wonderful inspiration freedom from fear and feebleness in the minds of our countrymen, feel profoundly hurt when any words from his mouth may emphasize elements of unreason which is the fundamental source of all blind powers that drive us against freedom and self respect."

পৃঃ ২৩৭। 'বিশ্বভারতীর বর্ষা উৎসব'

'শ্রাবণধারা' অভিনীত হবার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অন্যমনস্কতার ত্রুটি ; যা অভিনীত হয়েছিল তা 'শ্রাবণধারা' নয় 'শ্রাবণগাথা'।

পৃঃ ২৪৬। "শেষ সপ্তক"।

"শেষ সপ্তক" শিরোনামা লেখাটিতে 'অসমাপ্ত' কবিতার উল্লেখ প্রসঙ্গে "এই মাসের প্রবাসীতে" মুদ্রিত হয়েছে। একটি পংক্তি বাদ পড়ে গেছে। শেষের অংশটি হবে—"অন্যরকম কবিতাও আছে। যেমন এই মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত 'শিখ' কবিতাটি। বৈশাখের প্রবাসীতে মুদ্রিত 'অসমাপ্ত' শীর্ষক কবিতাটিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।"

পৃঃ ২৪৮। শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব।

যে দুটি নূতন গানের উল্লেখ আছে সে দুটি হলো 'আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি', 'মনে হোলো যেন পেরিয়ে এলেম।'

পৃঃ ২৬৪। বিশ্বভারতীতে ষাট হাজার টাকা দান।

রামানন্দ 'কোন বা কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির' উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণ কৃপালনী ইংরাজী জীবনীতে লিখছেন—

Gandhiji, who happened to be in Delhi, was much perturbed that the aged poet in failing health should be obliged, for want of funds for his university, to undertake such arduous tours ; and immediately sent him a letter enclosing a bank draft for Rs. 60.C00 as an offering from 'your humble countrymen'. 'Now', wrote the Mahatma, 'you will relieve the public mind by announcing cancellation of the rest of the programme.'

পৃঃ ২৭৮। উইন্টারনিজ।

উইন্টারনিজ লিখিত কবি জীবনীর পরিচয় Rabindranath Tagore ; Religion und Weltanschaung des Dichters. Prag, Verlagder deutschen Gesellschaft fur Sittliche Erziehung, 1936. 50p.

পৃঃ ২৮৮। আন্দামানে বন্দীদের প্রায়োপবেশন।

রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে আন্দামান রাজবন্দীদের মুক্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় (২রা অগষ্ট ১৯৩৮) যে ভাষণ পড়েন তা দুষ্প্রাপ্য বলে এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো :—

তোমরা সবাই জানো যে আমি রাজনীতিক নই। তাই তোমরা মনে রেখো

যে আজ সন্ধ্যেবেলায় যা বলবো সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন দলীয় হতে বাধ্য। আমি যা বলবো সেটা হচ্ছে ন্যায় ও মানবতার আহ্বানে বলা। এই আহ্বান কেউই উপেক্ষা করতে পারে না।

দু'সপ্তাহের উপর হয়ে গেলো প্রায় দু'শো রাজনৈতিক বন্দী আন্দামানে অনশন সুরু করেছেন। এই অনশনের খবর দীর্ঘকাল আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। জনসাধারণের সেণ্টিমেণ্টকে এইভাবে যে হৃদয়হীন উপেক্ষা দেখানো হয়েছে তাতে আমাদের জাতীয় অসহায়তাই পরিস্ফুট। ইংলণ্ড কিংবা যে কোন ডেমোক্রাটিক দেশে গভর্ণমেণ্ট রাজবন্দীদের অনশনের মত এত গুরুতর ঘটনাকে এতোদিন ধরে গোপন রাখতে পারতো না।

রাজনৈতিক বন্দীরা আন্দামান থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের দাবী সংগত ও অতি সামান্য দাবী। রাজশক্তি যেখানে এদেশের লোকের অনুগত নয়, সেখানে এটা খুবই স্বাভাবিক যে যেসব রাজনৈতিক বন্দীদের ভারতবর্ষ থেকে হাজার মাইল দূরে একটি দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছে তাদের উপর কি রকম ব্যবহার করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে দেশের লোক সন্দিহান থাকবে উৎকণ্ঠিত থাকবে। এটাও অতি স্বাভাবিক যে দেশের লোক রাজবন্দীদের ভারতে ফিরিয়ে আনবার দাবী করবে কেন না ভারতের কারাগারে অমানুষিক কঠোরতা জনমতের চাপে কিছুটা কম করা সম্ভব।

দেখা যাচ্ছে রাজবন্দীদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ভারত গভর্ণমেণ্ট বাংলার গভর্ণমেণ্টের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া ভারত গভর্ণমেণ্ট রাজবন্দীদের আর্জি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে সব বন্দীদের একসংগে সই করা আর্জি ভারত গভর্ণমেণ্ট বিচার করে দেখতে রাজী নন। গভর্ণমেণ্টের যন্ত্রের হৃদয়হীনতা আর একবার জয়লাভ করলো ন্যায়বুদ্ধি ও মানবতার উপর।

ভারতবর্ষের যে প্রদেশগুলিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা শাসনভার গ্রহণ করেছেন সেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যা কিছু বাধা ছিলো সব দূর করা হয়েছে।

শুধু বাংলা প্রদেশেই শত শত ছেলে বিনা বিচারে বন্দী রয়েছে। এখানে

রাজশক্তিকে যে দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না সেইটে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই তখন প্রেসের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। বাংলার লোকেরা যে ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করে তা মরুভূমির মরীচিকার মতই অবাস্তব।

অতীতে এর আগে আন্দামানের রাজবন্দীদের মধ্যে অনশনের সময় আমরা তিনটি তরুণ জীবনকে খুইয়েছি। তাদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু ঘটে জোর করে খাওয়ানোর যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা আছে তার ফলে। বাংলার গভর্ণমেণ্ট কি সেই ট্রাজেডী আরো বেশি সংখ্যায় ঘটতে দেবেন এইবার? আমরাও কি সেটা ঘটতে দেবো?

বাংলার গভর্ণমেণ্টের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা বম্বে, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের মতন উদার সহানুভূতি ও মানবতার সংগে রাজনৈতিক বন্দী ও বিনা বিচারে আটক রয়েছেন যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করুন।

শাস্তি দেবার যে নির্মম ব্যবস্থা পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে প্রচলিত আছে, মানুষের সভ্যতাকে ধিক্কার দেবার পক্ষে সেই সব নিষ্ঠুর ব্যবস্থা যথেষ্ট। কিছু-কাল থেকে রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তির বৃদ্ধি হয়েছে কতকগুলি পাশ্চাত্যদেশে। ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট এই ফ্যাসিস্ট সংক্রামতার ছোঁয়াচ ও অভিব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায়নি। এই ফ্যাসিস্ট সংক্রামতা আইনকেও পরোয়া করে না, মানবীয় স্বাধীনতার উপর সে অশ্রদ্ধাবান।

বাংলার শত শত তরুণ তরুণী অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিনা বিচারে আটক থেকে দৈহিক ও মানসিক দণ্ডভোগ করেছে। তার ফলে এই হতভাগ্য প্রদেশে নিরাশার অন্ধকার ছেয়ে গেছে ঘরে ঘরে।

আইন ও বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন করবার যে জরুরী প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে আমাদের শাসকদের কাছে দাবী জানাবার জন্যে আমার দেশবাসীরা আমাকে অনুরোধ করেন নি, তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন আইনের প্রয়োগে যে হৃদয়হীন কঠোরতা আছে সেই কঠোরতাকে কমাবার জন্যে তাঁদের যে দাবী তার সমর্থন করতে।

ইউরোপের ভূখণ্ডে 'ডেভিলস আইল্যাণ্ড' 'লিপারী' 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' ও আরো অন্যান্য বিশেষ তৈরী করা নরক তারা মানুষকে দণ্ড দেবার প্রদর্শনী

হিসাবে সৃষ্টি করেছে। ইংলণ্ডে কিন্তু বন্দীদের তাদের মাতৃভূমি থেকে উপড়ে নিয়ে তাদের কষ্ট বাড়ানোর জন্যে এই ধরণের অভিশপ্ত কোন জায়গা নেই।

যখন দেখি শুধু পরাধীন জাতির জন্যে তারা তাদের নিজেদের নিয়ম লঙ্ঘন করছে তখন এই ব্যবহারের পার্থক্যের অপমান আমাদের সকলকে লাঞ্ছিত করে।

আমার দেশের হয়ে আমি তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

(সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ইংরেজী থেকে অনূদিত)

পৃঃ ২৯০। রবীন্দ্রনাথের আরোগ্যলাভ।

১০ই সেপ্টেম্বর কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুদিন চেতনা ছিল না। ১৩৪৫ সালের নববর্ষের ভাষণে 'মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে' ফিরে আসার কাহিনী বলেছেন। এই সময়ে তাঁর চিকিৎসা ঘটিত ব্যবস্থায় বহু মানুষের বিচিত্র চেষ্টার কাহিনী রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়ে ইস্টার্ণ রেলওয়ে প্রকাশিত Rabindranath the Traveller গ্রন্থে 'স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে প্রকাশ করেন নির্মলকুমারী মহলানবিশ।

কৃষ্ণ কৃপালিনী তাঁর Rabindranath Tagore : A Biography গ্রন্থে এই অসুস্থতা সম্বন্ধে লিখছেন "...the poet suddenly fell ill on 10 September, with total loss of consciousness, the comatose state lasting for nearly forty-eight hours. The cause of illness was later diagnosed as erysipelas, a virulent infection located behind one of the ears. ...On the morning of the fifth day when he had recovered his conscioususs and was propped up on pillows in his bed, almost the first thing he did was to ask for colours and brush..."

পৃঃ ২৯০। "বন্দেমাতরম্‌" গান সম্বন্ধে আন্দোলন

'বন্দেমাতরম' সম্বন্ধে জহরলাল নেহেরুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ১৯৩৭ সালে ২রা নভেম্বর Amrita Bazar Patrika-তে প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ডে (১৩৬৩) ১০১-২ পৃষ্ঠায় সেই চিঠিটি উদ্ধৃত আছে।

পৃঃ ৩০৭। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার চিঠি।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ২৫৮ পৃষ্ঠায় 'জন্মদিন' ("আজ মম জন্মদিন") কবিতাটি ছাপা হয়—কবিতাটির শেষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একটি টীকা দিয়েছেন—"এই কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত ২৫ শে বৈশাখ তাঁহার জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে রেডিয়োতে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তাহার কিছুদিন পূর্বে প্রবাসীতে মুদ্রণের জন্য কবিতাটি তাঁহার নিকট পাইয়াছি। রেডিয়োতে পঠিত হইবার পর কবিতাটি অসম্পূর্ণভাবে কোন কোন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে কবিকর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়া সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রবাসীতে মুদ্রিত হইল।"

পৃঃ ৩১৫।

শান্তিনিকেতনের মৌলনা জিয়াউদ্দীন সম্পর্কে কবিতাটি 'নবজাতক' কাব্য-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

পৃঃ ৩১৬।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীকে যোনে নোগুচির চিঠি এবং রবীন্দ্র-নোগুচি পত্রাবলী Tagore Studies 1970 সংখ্যায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ৩২৮। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব।

শ্রীনিকেতনের জন্মকাহিনী নিপুণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন এলম্‌হার্স্ট—তাঁর The Foundation of Sriniketan প্রবন্ধে। ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি সঙ্গীসাথীদের নিয়ে পৌঁছলেন সুরুলে। সেখানে কাজ সুরু হলো। ৩১শে মার্চ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

..."I wish I were young enough to be able to join you and perform the meanest work that can be done in your place, thus getting rid of that filmy web of respectability that shuts me off from intimate touch with Mother Dust."

শুধু হাতে কলমে চাষ আর পশুপালনই নয়—দেশের সামাজিক অবস্থার হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর কথাটাই যে শেষ কথা একথাও রবীন্দ্রনাথ এলম্‌হার্স্টকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :—

"In India, the real cause of the weakness that cripples our spirit of freedom arises from the impregnable social walls we raise between the defficient castes. These check the natural flow of fellow-feeling among the people who live in our country. The law of love and of mutual respect has been ignored for the sake of retaining an artifical order. This only serves to promote a sense of degeneracy and of defeat. The people of India in this way have built their own cage ; but by trying to secure their freedom from one another, they only succeed in keeping themselves eternally captive."

শ্রীনিকেতনের কাজকর্ম চলার ব্যয় যুগিয়েছিলেন ডরোথী হুইটনী স্ট্রেট ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

এক সময়ে গান্ধীজি শ্রীনিকেতন দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সর্ব-ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য শিক্ষাসত্র থেকে একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তা চেয়েছিলেন। তাঁর সেই শিক্ষা পদ্ধতির নাম হল 'বেসিক এডুকেশন।' এ সম্পর্কে এলমহার্স্টের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—

But Basic draws only in part upon the ideas of Tagore, and has had grafted on to it other ideas for which Tagore would not have given his approval.

এ বিষয়ে এলমহার্স্ট সাহেবের **Rabindranath Tagore : Pioneer in Education (1961)** দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৪৩১। মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি।

মিস্ ইলিনর রাথবোন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। যুদ্ধের আয়োজনে ভারতীয়দের সহায়তা ছাড়াই ইংলণ্ড অগ্রসর হতে পারবে—এই মর্মে তিনি খোলা চিঠি লেখেন ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে। সেই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথের খোলা চিঠি ১৯৪১ সালের ৫ই জুন প্রকাশিত হয়। এই চিঠির বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দেন কৃষ্ণ কৃপালনীকে ; কৃপালনী চিঠিটি রচনা করেন। ১৯৭৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাদের কাছে লেখা এক চিঠিতে শ্রীকৃপালনী এ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন—

Yes, gurudev's reply to Miss Rathbone's letter was drafted by me. He was very excited when he read her 'open letter' but was too weak to write a reply himself. So he sent for me and told me what he thought of it and asked me to draft a reply for him. I read out what I drafted and he accepted it without changing anything, as far as I recollect. I should not be surprised if the original draft in my hand is found lying among Rabindra Bhavana archives.

রাথবোনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি এইখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো—

I have been deeply pained at Miss Rathbone's open letter to Indians. I do not know who Miss Rathbone is but I take it that she represents the mentality of the average 'well-intentioned' Britisher. Her letter is mainly addressed to Jawaharlal and I have no doubt that if that noble fighter of freedom's battle had not been gagged behind prison bars by Miss Rathbone's countrymen, he would have made a fitting and spirited reply to her gratuitous sermon. His enforced silence makes it necessary for me to voice my protest even from my sick bed. The lady has ill served the cause of her people by addressing so indiscreet, indeed impertinent, a challenge to our conscience. She is scandalised at our ingratitude,—that having 'drunk deeply at the wells of English thought' we should still have some thought left for our poor country's interests.

English thought, in so far as it is representative of the best traditions of western enlightenment, has indeed taught us much, but let me add, that those of our countrymen who have profited by it have done so despite the official British attempts to ill educate us. We might have achieved introduction to

Western learning through any other European language. Have all the other peoples in the world waited for the British to bring them enlightenment ? It is sheer insolent self-complacence on the part of our so called English friends to assume that had they not 'taught' us we would stiil have remained in the dark ages. Through the official British channels of education in India have flowed to our children in schools not the best of English thought but its refuse, which has only deprived them of a wholesome repast at the table of their own culture.

Assuming, however, that English language is the only channel left to us for 'enlightenment', all that 'drinking deeply at its wells has come to us in 1931, even after a couple of centuries of British administration, only about one percent of the population was found to be literate in English,—while in the U. S. S. R. in 1932, after only fiften years of Soviet administration, 98 percent of the children were educated. (These figures are taken from Statesman's Year-Book, an English publication, not likely to err of the Russian side). But even more necessary than the so called culture are the bare elementary needs of existence, on which alone can any superstructure of enlightenment rest.

And what have the British, who held tight the purse strings of our nation for more then two centuries and exploited its resources, done for our poor people ? I look around and see famished bodies crying for bread. I have seen women in villages dig up mud for a few drops of drinking water, for wells are even more scarce in Indian villages than schools.

I know that the population of England itself is to-day in danger of starvation and I sympathise with them, but when I

see how the whole might of the British navy is engaged in convoying food vessels to the English shores and when I recollect that I have seen our people perish of hunger and not even a cartload of rice brought to their door from the neighbouring district, I cannot help contrasting the British at home with the British in India.

Shall we be then grateful to the British, if not for keeping fed, at least for preserving law and order ?

I look around and see riots raging all over the country. When scores of Indian lives are lost, our property looted, our women dishonoured, the mighty British arm stir in no action, only the British voice is raised from overseas to chide us for unfitness to put our house in order.

Examples are not wanting in history when even fully armed warriors have shrunk before superior might, and contingencies have arisen in the present war when even the bravest among the British, French and Greek soldiers have had to evacuate the battlefield in Europe because they were overwhelmed by superior armaments,—but when our poor, . armed and helpless peasants, encumbered with crying babes, flee from homes unable to protect them from armed goondas, the British officials, parhaps smile in contempt at our cowardice !

Every British civilian in England is armed to-day for protecting his hearth and home against the enemy, but in India even lathi-training was forbidden by decree. Our people have been deliberately disarmed and emasculated in order to keep them perpetually cowed and at the mercy of their armed masters.

The British hate the Nazis for merely challenging their

world-mastery and Miss Rathbone expects us to kiss the hand of her people in servility for having riveted chains on ours. A Government must be judged not by pretensions of its spokesman but by its actual and effective contribution to the well-being of the people.

It is not so much because the British are foreigners that they are unwelcome to us and have found no place in our hearts, as because, while pretending to be trustees of our welfare, they have betrayed the great trust and have sacrificed the happiness of millions in India to bloat the pockets of a few capitalists at home.

I should have thought that the decent Britisher would at least keep silent at these wrongs and be grateful to us for our inaction, but that he should add insult to injury and pour salt over our wounds, passes all bounds of decency.

প্রবাসী ১৩৫০ পর্যন্ত

রবীন্দ্র আলোচনার সূচী

চিত্রা দেব

১৩১২ বৈশাখ । বাংলা সাহিত্যে প্রেম ও পূর্বরাগ—অমৃতলাল গুপ্ত

১৩১৩ কার্তিক । কাব্যের অভিব্যক্তি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অগ্রহায়ণ । 'সোনার তরী'র অর্থাভাব—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রহায়ণ । 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা—যদুনাথ সরকার

১৩১৪ ভাদ্র । দুইরকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—যদুনাথ সরকার

১৩১৫ পৌষ । ঔপন্যাসিক সাহিত্যে নব্যরীতি—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ । কবি রবীন্দ্রনাথ—বিজয়রত্ন মজুমদার

১৩১৭ শ্রাবণ । রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৩১৮ আষাঢ় । রবীন্দ্রনাথ—অজিতকুমার চক্রবর্তী

শ্রাবণ । রবীন্দ্রনাথ—অজিতকুমার চক্রবর্তী

১৩১৯ আষাঢ় । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন—অজিতকুমার চক্রবর্তী

ভাদ্র । ইংলণ্ডে সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা— ’মানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিন । রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'—অজিতকুমার চক্রবর্তী

পৌষ । রবীন্দ্রনাথের দুখানি পুস্তক—অজিতকুমার চক্রবর্তী (জীবনস্মৃতি ও ছিন্নপত্রের আলোচনা)

১৩২০ অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রনাথের "নোবেল" পুরস্কার প্রাপ্তি—অমলচন্দ্র হোম

১৩২১ আশ্বিন । 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য'—অজিতকুমার চক্রবর্তী

কার্তিক । 'গীতিমাল্য'—অজিতকুমার চক্রবর্তী

১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ । 'রাজা'—অজিতকুমার চক্র.বর্তী

পৌষ । কবি ও ঋষি—কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

১৩২৪ ভাদ্র । পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

১৩২৫ আশ্বিন। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
১৩২৬ আষাঢ়। "রাজা"—ঐ
আশ্বিন। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার উন্মেষ—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
১৩২৭ কার্তিক। ফরাসী রবীন্দ্রপ্রশস্তি—জে. ডি. এণ্ডারসন
পৌষ। অলোকপন্থায় পোয়ে ও রবীন্দ্রনাথ—সুখরঞ্জন রায়
মাঘ। গীতাঞ্জলির ভাবধারা—কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
১৩২৮ আষাঢ়। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ—সীতা দেবী
[The Venture পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার—সীতা দেবীর অনুবাদ]
। রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি—বিধুশেখর ভট্টাচার্য
শ্রাবণ। স্ট্রাসবুর্গে রবীন্দ্রনাথ—কালিদাস নাগ ও জীবনলাল গৌবা
অগ্রহায়ণ। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও খুলনা দুর্ভিক্ষের সাহায্য (আলোচনা)—প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত
পৌষ। অধ্যাপক টমসনের "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" (সমালোচনা)—"ক খ গ"
মাঘ। আশুবাবুর রবীন্দ্রগুণগ্রাহিতা (আলোচনা)—রামকিশোর রায়
মাঘ। রবীন্দ্র পরিচয়—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
ফাল্গুন। রবীন্দ্র পরিচয়—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
চৈত্র। রবীন্দ্র পরিচয়—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
জ্যৈষ্ঠ। রবীন্দ্র পরিচয়—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
আষাঢ়। রবীন্দ্র পরিচয়—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
আষাঢ়। পথ মোচন—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (মুক্তধারা আলোচনা)
আষাঢ়। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাটক—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
শ্রাবণ। রবীন্দ্র পরিচয়—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
১৩৩০ পৌষ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।
১৩৩১ আশ্বিন। চীন জাপানের চিঠি—নন্দলাল বসু
১৩৩২ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের বাণী—হেমলতা দেবী
কার্তিক। রবীন্দ্রনাথ ও রমাঁ ও রলাঁ—সজনীকান্ত দাস

১৩৩২ অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ—কাজী আবদুল ওদুদ
ফাল্গুন । রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা—কাজী আবদুল ওদুদ
চৈত্র । রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা—কাজী আবদুল ওদুদ
১৩৩৩ বৈশাখ । 'উর্বশী'—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যৈষ্ঠ । 'উর্বশী'—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাদ্র । গীতাঞ্জলি ও অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব—শিবকৃষ্ণ দত্ত
অগ্রহায়ণ । নৌকাডুবির প্লট—গিরিজাপতি ভট্টাচার্য
১৩৩৪ শ্রাবণ । রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেভারেণ্ড টমসনের বহি—বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাদ্র । রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন—নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত
১৩৩৫ আষাঢ় । রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ—অনিলকুমার বসু
পৌষ । শান্তিনিকেতনে চৈনিক সুধী সু-সীমোর অভ্যর্থনা—অনাথনাথ বসু
পৌষ । শান্তিনিকেতনের স্মৃতি—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩৩৬ পৌষ । 'বিসর্জন' নাটকের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়
মাঘ । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৩৭ কার্তিক । ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ—অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ—নলিনীকান্ত গুপ্ত
। শ্রীরবীন্দ্র জয়ন্তী (ক্রোড়পত্র) [৭০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে]
আষাঢ় । বকসা দুর্গে রবীন্দ্র জয়ন্তী
আষাঢ় । শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ তর্কভূষণ
মাঘ । রবীন্দ্রজয়ন্তী
১৩৩৯ বৈশাখ । রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতা—রঙ্গীন হালদার
আষাঢ় । বৈষ্ণব সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ—খগেন্দ্রনাথ মিত্র
আষাঢ় । শেষের কবিতা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাদ্র । রবীন্দ্রনাথের সুর—মণিলাল সেনশর্মা
১৩৪১ ভাদ্র । গীতা ও গীতাঞ্জলি—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
আশ্বিন । শেষের কবিতার লাবণ্য—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১৩৪১ অগ্রহায়ণ । সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু—সীতা দেবী
(গোরা উপন্যাসের আলোচনা)

অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলার পল্লীচিত্র—রাধামোহন ভট্টাচার্য

১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথের ভাষা—নলিনীকান্ত গুপ্ত

ভাদ্র । রবীন্দ্রকাব্যে দুঃখের রূপ—উষা বিশ্বাস

কার্তিক । শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল'—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত 'লেখন'—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

পৌষ । নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

চৈত্র । 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য—প্রতিমা দেবী

চৈত্র । শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ—কিরণবালা সেন

১৩৪৪ বৈশাখ । প্রভাত রবি—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

বৈশাখ । রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ—কিরণবালা সেন

জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

অগ্রহায়ণ । পতিসরে রবীন্দ্রনাথ—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ফাল্গুন । 'গীতাঞ্জলি'র জন্মকথা—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ফাল্গুন । রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংগঠনের আদর্শ—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ । কবি রবীন্দ্রনাথ—চারু বন্দোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব পরিচয়'—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্র । কবি রবীন্দ্রনাথের "মুক্তি" (আলোচনা)—ধ্রুব গুপ্ত

আশ্বিন । 'চণ্ডালিকা'—প্রতিমা ঠাকুর

ফাল্গুন । রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যু ও জীবনের রূপ—পঞ্চানন মণ্ডল

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ । মানুষ রবীন্দ্রনাথ—তেজেশচন্দ্র সেন

জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথের জন্ম তারিখ—কিশোরীমোহন সাঁতরা

জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম—ক্ষিতিমোহন সেন

অগ্রহায়ণ । কাব্যে ঋতুমঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথ—জয়দেব রায়

পৌষ । সংসারী রবীন্দ্রনাথ—হেমলতা দেবী

মাঘ । বিশ্বভারতীর অঙ্কুর—যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৭ ভাদ্র । শান্তিনিকেতনের স্মৃতি—অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৭ কার্তিক । রবীন্দ্র সংলাপ কণিকা (১)—বিধুশেখর ভট্টাচার্য

পৌষ । রবীন্দ্রনাথ ও তাই-চী-তাও সংবাদ—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

পৌষ । রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৌষ । রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

মাঘ । রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

মাঘ । রবীন্দ্রচিত্তের ভূমিকা—বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

ফাল্গুন । রবীন্দ্রনাথের "তিনসঙ্গী"—পরিমল গোস্বামী

ফাল্গুন । রবীন্দ্র দৈনিকী—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

চৈত্র । গুরুদেবের ওখানে—সত্যনারায়ণ

১৩৪৮ বৈশাখ । মানসপটে রবীন্দ্রনাথ—সীতা দেবী

জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

জ্যৈষ্ঠ । "সবলা"—যুগলকিশোর সরকার

আষাঢ় । মণিপুরী নৃত্য ও রবীন্দ্রনাথ—নলিনীকুমার ভদ্র

আষাঢ় । "জন্মদিনে"—সুধীরচন্দ্র কর

আষাঢ় । রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা—নলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রাবণ । "আরোগ্য"—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ । বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্র । "জন্মদিনে"—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভাদ্র । রবীন্দ্রনাথ—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভাদ্র । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্র । বিশ্বকবির মহানির্বাণ—জয়ন্তনাথ রায়

আশ্বিন । রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ—শামসুন নাহার

আশ্বিন । রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে চন্দনগরের স্থান—হরিহর শেঠ

আশ্বিন । নৃত্যনাট্যের পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ—মণিবর্ধন

আশ্বিন । রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়দিন—'সেবিকা'

আশ্বিন । রবীন্দ্রনাথের আশ্রম—বিধুশেখর শাস্ত্রী

আশ্বিন । নবযুগের রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিন । রবি-জিজ্ঞাসা—রাধারাণী দেবী

আশ্বিন । রবি বকুল—অপূর্বমণি দত্ত

১৩৪৮ আশ্বিন । আমাদের গুরুদেব—সাধনা কর

আশ্বিন । "পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়"—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রপ্রয়াণে রামানন্দকে পত্র)

কার্তিক । পুণ্যস্মৃতি—সীতা দেবী (কার্তিক-চৈত্র ১৩৪৮ এবং বৈশাখ ১৩৪৯ সংখ্যায়ও অনুসৃত হয়)

কার্তিক । রবীন্দ্রায়ণ—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

কার্তিক । নির্ভীকতার কবি রবীন্দ্রনাথ—অনুরূপা দেবী

কার্তিক । রবীন্দ্রস্মৃতিপূজা—হেমবালা সেন

কার্তিক । "ছড়া"—অমিয় চক্রবর্তী

কার্তিক । "শেষ লেখা"—অমিয় চক্রবর্তী

কার্তিক । রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন

কার্তিক । রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র ও অপ্রকাশিত রচনা—কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্তিক । কবি প্রয়াণ—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অগ্রহায়ণ । "শেষ লেখা"—অমিয় চক্রবর্তী

অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যু—শান্তা দেবী

অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রনাথের কথা—আমার পরিচয়

অগ্রহায়ণ । শেষ অধ্যায়—সাধনা কর ও সুধীরচন্দ্র কর

অগ্রহায়ণ । ত্রিপুরার রাজবংশ ও রবীন্দ্রনাথ—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পৌষ । রবীন্দ্রস্মৃতি—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

পৌষ । রবীন্দ্রনাথের আশ্রম উৎসবের সূচনা—সাধনা কর ও সুধীরচন্দ্র কর

পৌষ । মাধুরীলতা—অনুরূপা দেবী (কবির জ্যেষ্ঠ কন্যাপ্রসঙ্গ)

মাঘ । রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের অভিব্যক্তি—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মাঘ । শান্তিনিকেতনের চিত্র, নৃত্য, ও: সঙ্গীত ও অভিনয়ের সূচনা —সাধনা কর ও সুধীরচন্দ্র কর

মাঘ । শেষ অর্ঘ—অবনীনাথ রায়

ফাল্গুন । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

চৈত্র । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

১৩৪৯ বৈশাখ । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

বৈশাখ । বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক ও রবীন্দ্রনাথ—নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রস্তাবান্তর—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

আষাঢ় । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

আষাঢ় । দরিদ্রের কবি রবীন্দ্রনাথ—সুলতা কর

আষাঢ় । "এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়"—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। (কবিপত্নীকে লেখা কবির পত্র সমালোচনা)

আষাঢ় । যৌবনে রবীন্দ্রনাথ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রাবণ । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

শ্রাবণ । কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রাবণ । জমিদার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার দুইখানি চিঠি—নরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রাবণ । রবীন্দ্রসাহিত্যে জাতীয়তা—সুধীন্দ্রনাথ সান্যাল

ভাদ্র । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

ভাদ্র । রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' দ্বিতীয় পুস্তক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিন । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

আশ্বিন । জমিদার রবীন্দ্রনাথের আরও দুইখানি চিঠি—নরেন্দ্রনাথ বসু

কার্তিক । মংপুতে—মৈত্রেয়ী দেবী

কার্তিক । রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকৃতি—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কার্তিক । পুণ্যস্মৃতি—অবনীনাথ রায়
(সীতা দেবীর পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থের আলোচনা)

অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রস্মৃতি—জীবনময় রায়
(পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থের আলোচনা)

অগ্রহায়ণ । রবীন্দ্রনাথের গান—কমলে রায়

মাঘ । শান্তিনিকেতন—দেবজ্যোতি বর্মণ

মাঘ । 'বাল্মীকি প্রতিভায়' বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৯ ফাল্গুন । সুরের যাদুকর রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়
ফাল্গুন । রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব—কালিদাস নাগ
১৩৫০ বৈশাখ । রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত
[বীথিকার 'নিঃস্ব' কবিতার আলোচনা]
বৈশাখ । রবীন্দ্রনাথের বংশলতায় অসংগতিমূলক ভ্রম—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈশাখ । "রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা" (আলোচনা)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
['ভারতভূমি' কবিতা সম্পর্কে কালিদাস নাগের মন্তব্য বিচার]
বৈশাখ । বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ—হেমলতা ঠাকুর
জ্যৈষ্ঠ । "রবীন্দ্রনাথের বংশলতিকা"—অমল হোম
আষাঢ় । উপমা রবীন্দ্রনাথস্য—সুধীরকুমার ঘোষ
শ্রাবণ । রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মপ্রচার—ক্ষিতিমোহন সেন
শ্রাবণ । রবীন্দ্রসংলাপ কণিকা (২)—বিধুশেখর ভট্টাচার্য
ভাদ্র । রবীন্দ্রনাথের কথা—গুণস্মৃতি—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
আশ্বিন । রবীন্দ্রসংলাপ কণিকা (৩)—বিধুশেখর ভট্টাচার্য
পৌষ । রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত—দুলালচন্দ্র মিত্র
মাঘ । রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু—ক্ষিতিমোহন সেন
মাঘ । বাংলার বাহিরে রবীন্দ্রনিন্দা—সরোজেন্দ্রনাথ রায়
ফাল্গুন । রবীন্দ্ররচনায় অতিপ্রাকৃত—মনীন্দ্রচন্দ্র রায়
চৈত্র । "এবার ফিরাও মোরে"—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নির্দেশিকা